রাজমোহনের সুখদুঃখ

বিমল কর

শ্রীপিনাকী চক্রবর্তী
কল্যাণীয়েষু

রাজমোহনের সুখদুঃখ

"দাদা!"

"বলো।"

"বৃষ্টি আসছে। জানলাগুলো বন্ধ করতে পারবে? না, আমি যাব?"

"আসুক বৃষ্টি। আমি পারব।...তা তোমার যেন আজ একটু দেরিই হল!"

"চরতে বেরিয়েছিলাম গো! কাল থেকে ছুটি পড়ে যাচ্ছে; আজ পাঁচ-ছ'জন বন্ধু মিলে খানিকটা চরে এলাম।"

"ভাল! বর্ষার পর মাঠে ঘাস বেড়েছে; বেশ সবুজ হয়েছে না!"

"ধুত! আজকাল মাঠের ঘাসও হাইব্রিড, খেলেই গা-হাত চুলকোবে। ও ঘাস কেউ খায়!" নাতনি হাসল। "আমরা একটা পুরনো ফিল্ম দেখতে গিয়েছিলাম। 'ডায়াল এম্ ফর মার্ডার।' দারুণ।"

"ও!"

রমু, আমার নাতনি, একটু চুপ করে থেকেই খিলখিল করে হেসে উঠল।

আমাদের কথা হচ্ছিল ফোনে। রমু দোতলায়, তেতলায় আমি। আমার বড় নাতির মাথায় ব্যবসা কিলবিল করে। পাঁচ দিকে হাত বাড়ায়। কোনওটা মাস চার-পাঁচের মধ্যে গুটিয়ে যায়, কোনওটা বা টিকে থাকে টিমটিম করে। আপাতত সে মোটামুটি চালিয়ে যাচ্ছে। তার একটা ছোট কারখানা চালু রয়েছে 'ইন্টারকম'-এর, অন্যটায় 'রট আয়রনের' বাহারি ফার্নিচার থেকে আয়নার ফ্রেম, হালকা চেয়ার, টেবল ল্যাম্প, স্ট্যান্ড তৈরি করে। চলে যাচ্ছে মন্দ নয়।

ঘরে ঘরে না হোক বাড়িতে গোটা তিনেক ইন্টারকম বসিয়ে সে আমাদের উপকার করেছে অনেক। হাঁকডাক করে ডাকাডাকি করতে হয় না আর, দোতলার গলা তেতলায় অনায়াসেই পৌঁছে যায়। বাড়ির ফোন দোতলায়। একটা কর্ডলেসও আছে।

রমু হঠাৎ হাসতে হাসতে যেন বিষম খেল।

কানে ইন্টারকম। বললাম, "কী হল? অত হিহি কেন, দিদি?"

হাসতে হাসতে রমু বলল, "দাদা, আজ একটা কাণ্ড যা করেছি।"

"কাণ্ড! কী কাণ্ড?"

"একটা ছেলের মাথায় চাঁটি মেরেছি।" রমু হিহি করে হাসছে।

"মাথায় চাঁটি! চেনা ছেলে?"

"না না, চেনা নয়; অচেনা।"

"তা হলে চাঁটি কেন, চটিও হতে পারত।"

"যাঃ, ভদ্রলোকের ছেলেকে শুধু শুধু চটি মারা যায়! তুমি যে কী!"

"চাঁটিটাই বা কেন তবে!"

"শোনো না কী হয়েছিল। আমরা পাঁচ-ছ'জন বন্ধু মিলে যাচ্ছি। আমাদের সামনে দুটো ছেলে যাচ্ছিল। একটা ছেলে বদ্‌খত রং আর ছাপ্পা মারা একটা জামা পরে ব্যাঙের মতন থপ থপ করে যাচ্ছে। মোটা হাঁদা গাবলু টাইপের। তা ঝিমলি আমায় বলল, রমু ওর মাথায় একটা চাঁটি মারতে পারিস? দেখি তোর সাহস।...আমি বললাম, পারি। কী খাওয়াবি? ঝিমলি বলল, আইসক্রিম।"

"ব্যাস, তাতেই..."

"আ, শোনো না। আমি দু পা এগিয়ে পেছন থেকে ছেলেটার মাথায় মারলাম চাঁটি। জোরে নয় তেমন।"

"সর্বনাশ। তারপর—?"

"ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল।...আর আমি কী করলাম জান? যেই না সে দাঁড়িয়ে পড়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, আমি একেবারে মা কালী। এক হাত জিভ বার করে লজ্জায় মরি মরি হয়ে বললাম, এ মা, ছি ছি, আমি ভেবেছিলাম আমার মাসতুতো ভাই হরি। ইস, কী ভুল। প্লিজ কিছু মনে করবেন না।"

"বা, তোর এত বুদ্ধি! তবে তোর তো মাসিটাসি নেই।"

"চুলোয় যাক মাসি! কেমন দিলাম বলো!...কিন্তু ছেলেটাও কম যায় না। আমায় দেখল। তারপর ঠোঁট টিপে হেসে বলল, আমি কিছু মনে করব না, তবে 'মাসতুতো ভাইটা' বাদ দিতে হবে।" রমু হাসতে লাগল।

আমি মজার গলায় বললাম, "কী নাম ছেলেটার?"

"জানি না।"

"তোর নাম জানতে চায়নি?"

"না।"

"সুতো ছিঁড়ে গেল রে!"

"যাক।...শোনো, আমি গা ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে আসছি। দুটো মুখে দেব। এর মধ্যে বৃষ্টি আসবেই। তুমি কিন্তু জানলা বন্ধ করে দিয়ো।"

রমুর কথা ফুরোল।

জানলা থেকে হাত কয়েক তফাতে আমি বসে আছি। এ-ঘরে চারটে জানলা। দুটো দক্ষিণে। একটা পুবে। অন্যটা উত্তরে। পশ্চিমে জানলা নেই। দরজা পুবমুখো হওয়ায় আলোর অভাব নেই ঘরে। তারপর খোলা দক্ষিণ। জানলাগুলো মাঝারি মাপের। তাতে ক্ষতি কী! অসুবিধে আমি বুঝি না। তেতলার ঘর। চারআনাও সেভাবে বন্ধ নয়। বাকিটা ছাদ। আমার ঘরের লাগোয়া স্নানাদির ব্যবস্থা। পাশে একটা কুঠরিও আছে। রাত্রে নিবারণ থাকে। ওটা তার ঘর। আপদে বিপদে রাত্রে আমায় দেখাশোনার দায় তার। এ-বাড়িতে নিবারণের বছর পনেরো কেটে গেল।

তেতলার এই ঘরটিতে আমারও অনেক দিন হল। বিজলী চলে গিয়েছে আজ সাত বছর। সে যত দিন ছিল, দোতলার একপাশে জায়গা ছিল বুড়ো-বুড়ির। পরে খানিকটা অদলবদল হল। সংসারে এটা স্বাভাবিক। তেতলার এই ঘর তখন ছিল না। ছিল চিলেকোঠা। আমার কথাতেই চিলেকোঠার গা ধরে এই ঘরটা করা হল। উদ্যোগ আমারই। ছেলেদের কোনও দোষ নেই। বরং তাদের আপত্তিই ছিল

প্রথমটায়, আমার জেদ বা ইচ্ছেতে অবশ্য তাদের আপত্তি শেষ পর্যন্ত টেকেনি।

তেতলায় ঠাঁই নিয়ে আমার খুব একটা অসুবিধে হয়নি। গরমের সময় দুপুরটা যতটা তেতে ওঠে, বিকেলের পর খোলা ছাদ আর বাতাস সেই তাত শরীর থেকে মুছে দেয়। পুরোপুরি আরাম কি পাওয়া যায় কোথাও!

ঘরের বাইরে পাঁচ-ছ'ফুট মতন টালির বারান্দা। টানা। ঢাকা। গড়ানো। ছাদের দিকে ঢালু হয়ে গিয়েছে। বৃষ্টির সময় জল গড়িয়ে ছাদে পড়ে। শীতকালে মাথা বাঁচিয়ে সারাবেলা রোদ পোয়ানো যায়।

আমার অনেকটা সময় এই বারান্দায় ডেকচেয়ারে বসে কেটে যায়। ছাদে কয়েকটা মামুলি ফুলের গাছ। টবগুলো ফাঁকা থাকলে ভাল দেখায় না বলে নিবারণ সাজিয়ে রেখেছে। এখন ওই টবে মোতি বেলফুলের একজোড়া গাছ নজরে পড়ে। আর একটামাত্র নীল অপরাজিতার লতানো গাছ।

ঘরে আমার প্রয়োজন মতন সবই আছে। ছোট খাট, টেবিল, একজোড়া চেয়ার, একটা দেওয়াল-আয়না, অল্প কিছু বইপত্র রাখার র‍্যাক, রেডিয়ো, জামাকাপড় রাখার আলনা। এর বেশি আর কী চাই আমার!

বিজলী এই ঘরে থাকেনি। তখন তেতলার এই নিরিবিলি, সংসার থেকে খানিকটা বিচ্ছিন্ন ঘরটা তৈরিই হয়নি। পরে আমার ইচ্ছেয় হল। অবশ্য বরাবরই মনে হয়েছে, এই ইচ্ছের মূল্য কী? আজ বা কাল, যে কোনও দিনই আমি বিজলীর মতন চলে যেতে পারি। বয়েসটা যে শেষবেলায় হেলে পড়েছে। সেদিক থেকে হিসেব করলে আমারই যাবার কথা আগে, অথচ বিজলীই আগে চলে গেল। কে যে কখন যায়!

বৃষ্টি এসে গেল। তবে নরম বৃষ্টি। শরৎকাল ফুরিয়ে আসার পালা এখন। আকাশে এ-বেলা ও-বেলা হালকা মেঘ; কখনও সাদা কখনও ঈষৎ ধূসর রঙের বর্ণ নিয়ে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ভেসে বেড়ায়। বর্ষার ভিজে হাওয়া শুকিয়ে গিয়েছে প্রায়।

মরা বিকেলে, সামান্য আঁধার হয়ে আসা আলোয় ওই যে বৃষ্টি এল—তার যেন চঞ্চল হবার গা নেই। দমক বা ঝাপটানিও দেখা যাচ্ছে না। অত্যন্ত মিহি, সাদাটে পরদার মতন এলোমেলো হয়ে দুলছে, কোথাও মেঘ ডাকছে না, এমনকী বৃষ্টির শব্দও নেই।

গতকাল মহালয়া গিয়েছে। আজ প্রতিপদ। পুজোর গন্ধ ভেসে ওঠার কথা। কিন্তু আমি অন্য কথা ভাবছিলাম। মনে পড়েছিল সকালেই। সারাদিন এলোমেলো খাপছাড়াভাবে মনে পড়লেও ঠিক সেভাবে গভীরভাবে ভাবিনি। এখন ভাবছিলাম। আমার ঠাকুমার কথা। হিসেব মতন আজ—মহালয়ার পরের দিন প্রতিপদে ঠাকুমা মারা যায়নি। গিয়েছিল আরও দু-একদিন পরে। এই সময়টায় আমার বরাবরই ঠাকুমার কথা মনে পড়ে। কতকাল হয়ে গেল, কত বছর, আমার বয়েস যখন পনেরো-যোলোর মতন—আমার ঠাকুমা চলে গিয়েছে। আজ আমার বয়েস আশির কাছাকাছি। তবু কেন যে মনে পড়ে!

এইসময় আমার নাতনি রমু ফোন করেছিল।

ওর সঙ্গে কথা শেষ করার পর, খানিকটা পরে বৃষ্টি নামল। ছাদ ভিজছে। অপরাজিতার লতা দুলছে বাতাসে। আমি দেখছিলাম। জানলা বন্ধ করার কোনও কারণ নেই, এই মোলায়েম, বিন্দু বিন্দু, সাবুদানার মতন ফোঁটা ফোঁটা শুভ্র বৃষ্টি ঘরে ঢুকছে না। ছাট নেই। বাতাসও মৃদু।

রমুর সঙ্গে আমার ঠাকুমার মুখের আদলে কোনও মিল নেই। বাহ্যত নয়। তবু ওকে দেখলে কেন যেন ঠাকুমার কথা মনে পড়ে। আমার ঠাকুমার বাঁ চোখের মণির নীচে, সাদা জমিতে একটা ছোট্ট তিল পরিমাণ কালচে-নীল ফোঁটা ছিল। বড় সুন্দর দেখাত। মনে হত চোখের মণি থেকে ছিটকে পড়েছে দাগটা। রমুরও তাই। আশ্চর্য না! আর ঠাকুমার থুতনির তলায় যেমন বড় একটা তিল ছিল—রমুরও সেইরকম, তবে ছোট তিল। চোখে মুখে আর কোনও মিল আমি দেখতে পাই না। তবে স্বভাবে খানিকটা পাই। মুখ টিপে থাকা স্বভাব ছিল না ঠাকুমার, কথা বলত অনর্গল; যাকে তাকে আহ্লাদ করতেও যেমন বাধত না, মুখের ওপর দু-কথা শুনিয়ে দিতেও আটকাত না। সাহসী, জেদি। আবার রাগলে কার সাধ্য ঠাকুমাকে সামলায়। রমুকেও দেখেছি অনেকটা সেই স্বভাবেই পেয়েছে।

আমি ভাবি, এটা কি তার ক'পুরুষের রক্ত থেকে পাওয়া? তাই কি হয়! রক্ত কি এতটা গড়িয়ে আসতে পারে?

ছাদের ওপর সাদা গুঁড়োর মতন বৃষ্টি এবার ঝাপসা হয়ে এল। সন্ধে নামছে। একবার সুর তুলল জলের ফোঁটা। আবার মিলিয়ে গেল। বেলফুলের টবে মোতি বেল দুলছিল। একটা কাক ডাকল কোথাও, ভাঙা ভাঙা গলা, বোধ হয় সঙ্গীকে ডাকছে। হাজরাদের বাড়ির পেছন দিকের সাবু গাছটার মাথা দুলছে মাঝে মাঝে।

রমু এল। "এ কী?"

"কী?"

"জানলা বন্ধ করনি?"

"বৃষ্টির ছাট আসছে না; বন্ধ করব কেন?"

"এই নাও, ধরো," বলে আমার হাতে একটা মগ ধরিয়ে দিয়ে সে জানলার কাছে গিয়ে দেখল জলের ছাটে কোথাও ভিজেছে কি না।

"এটা কী?" আমি বললাম।

"জিন্‌জার টি, উইথ্ দুটো লবঙ্গ। নো মিল্ক। চিনি আধ-চামচ। গরম আছে। ধীরে ধীরে চুমুক দাও।"

"হঠাৎ এই পদার্থ?"

"সকালে বলছিলে গলা খুসখুস করছে। ঠান্ডা লেগেছে তোমার। সিজন্ চেঞ্জ হচ্ছে বোঝ না?"

"ও!"

রমু বসল পাশে। পরনে ম্যাক্সি। একরঙা। মাথার চুল খোলা, আঁচড়ানো। গন্ধ উঠছিল পাউডারের।

"আমার ঠাকুমা হলে চায়ের বদলে চারটে তুলসীপাতা, এক কুচো বচ, এক টুকরো তালমিছরি দিত...।"

"ন্যাস্টি। তুলসীপাতা তালমিছরি...!" রমু নাক কুঁচকে বলল, "তুমি কি খোকা?"

"ঠাকুমা হয়ত ভাবত।"

"তোমার ওই ঠাকুমা ঠাকুমা আর গেল না। সামনে পেলে বুড়ির নাক কেটে দিতাম।"

চায়ে চুমুক দিয়ে আমি হাসলাম। "আমার ঠাকুমাকে তুই হিংসে করছিস?"

"বয়ে গেছে। কোন এক বুড়ি, চোখে দেখা তো দূরের কথা একটা ফোটো যা দেখেছি তাতে একেবারে মা শীতলা হয়ে আছে।"

"সে পুরনো ফোটোর দোষ! তা বলে তুই আমার ঠাকুমার নাক কাটবি?"

"দেখো দাদা, অত ঠাকুমা-ভজুয়া হোয়ো না। নাক কাটব বলেছি তো কী হয়েছে! তোমার ওই আহ্লাদি ঠাকুমা তার বরের গোঁফ কেটে দেয়নি শয়তানি করে! কী সাহস! আবগারি দারোগা, দস্যুর মতন চেহারা, অসুরের মতন গোঁফ, বেচারা শ্বশুরবাড়িতে এসেছিল জামাইষষ্ঠী করতে। খেয়েদেয়ে ঘুমোচ্ছে মানুষটা অঘোরে, আর তোমার ঠাকুমা তার বরের গোঁফে কাঁচি চালিয়ে দিল। আমি হলে অমন বউয়ের আর মুখ দেখতাম না। একেবারে গেট আউট করে দিতাম।"

হো হো করে হেসে উঠলাম আমি। রমু আমায় জিভ ভেঙাল। উঠে গিয়ে আলো জ্বেলে দিল ঘরের। বাইরে বৃষ্টি থেমে গিয়েছে।

গল্পটা আমিই রমুকে বলেছিলাম। অবশ্য এ-গল্প এই বাড়ির সকলেই শুনেছে। বড় বউমা, ছোট বউমা, ছেলেরা, নাতি নাতনিরা। বিজলীও জানত। সেই বা ঠাকুমা শাশুড়ির কীর্তিকাহিনী বলতে বাকি রাখত নাকি!

আমার ঠাকুরদা ছিলেন আবগারি দারোগা। তখন লোকে তাই বলত। মানুষটির চেহারা ছিল পাকাপোক্ত, কুস্তিগির ধরনের। লোকে তাই বলত। আমি ঠাকুরদাকে দেখিনি। গিরিডির কাছাকাছি কোথাও তিনি খুন হয়েছিলেন।

এই ঠাকুরদার বিশাল গোঁফ ঠাকুমার পছন্দ হত না। কিন্তু বলা বৃথা। একবার জামাইষষ্ঠীর সময়ে ঠাকুরদা শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলেন, যা তিনি সচরাচর যেতেন না। এমনিতে খাইয়ে মানুষ, তার ওপর শ্বশুরবাড়িতে ষষ্ঠী করতে গিয়ে খেয়েছিলেনও প্রচুর। দোষের মধ্যে ভদ্রলোকের গোঁফও একটু বেশি ক্ষীর খেয়ে ফেলেছিল—মানে দাগ লেগে গিয়েছিল গোঁফে ঘন ক্ষীরের। তাই নিয়ে শালা-শালিরা হাসাহাসি করেছিল খুব।

ঠাকুমার আঁতে লেগেছিল বোধ হয়। রাত্রে ঠাকুরদা যখন অঘোর ঘুমে নাক ডাকছেন—ঠাকুমা তার সেলাইবাক্স থেকে কাঁচি বার করে দিল গোঁফের একটা পাশ কেটে, যাচ্ছেতাই ভাবে।

ঠাকুরদা যে রেগে গিয়েছিলেন খুব তা তো আন্দাজ করাই যায়। তবে পরে আর তিনি গোঁফ রাখেননি।

রমু আমার গা ঘেঁষে হেলে পড়ে দুষ্টুমি করে বলল, "আর তোমার ঠাকুমার সেই সাবান মাখানো..., সেই গল্পটা বলো?"

"শুনেছিস তো।"

"আবার বলো। আহা, দশ-বিশ বার শোনার পরও ওই গল্প কি বাসী হয়!" গায়ে

চিমটি কাটল নাতনি। আমার সঙ্গে এইরকমই করে ও। মজা করে, জ্বালায়, খোঁচা মারে কথায়।

বলতে হল। গরম আদা-চায়ে যেন গলা পরিষ্কার হয়ে আসছিল সামান্য।

আমার ঠাকুমা গোঁসাইবাড়ির মেয়ে ছিল না। কিন্তু বাড়ির ধরনধারণ আচারবিচারটা ছিল বোষ্টমদের মতন অনেকটা। হেঁসেলে পিঁয়াজ রসুন ঢুকত না। মাছটা চলত, মাংস ডিম নয়। খেতে হলে বাইরে ডুমুরতলার মেঠো হেঁসেলে গিয়ে রান্না করো। পুরুষেরা কেউ কেউ তাতেই অভ্যস্ত ছিল।

সেই ঠাকুমার বিয়ে হল ঘোরতর শাক্ত বাড়িতে। পনেরো-ষোলো বছরের বাচ্চা বউ শ্বশুরবাড়িতে এসে দেখল, ডিম মাংস পিঁয়াজ রসুনের ছড়াছড়ি। মায় মুরগি পর্যন্ত। নামেই একটা আমিষ হেঁসেল, মাছের বঁটি আছে। নয়তো সব একাকার।

ঠাকুমা বলত, 'তোর ঠাকুরদা গায়ের কাছে এলে আঁচলে নাকচাপা দিতে হত। কী পিঁয়াজ রসুনের গন্ধ রে। মাংস পেটে গেলে তো কথা নেই, পাঁঠার দুর্গন্ধ।'

'তো ঠাকুরদার সঙ্গে শুতে কেমন করে?'

'বকামি করবি না।...শুতে হত বলে শুতাম। বমি বমি লাগত। একটু যখন অভ্যেস হয়ে উঠল তখন একদিন দিলাম শিক্ষা!'

'শুনি!'

'বাবু সন্ধেবেলায় এসে চান করতে কলঘরে ঢুকেছেন। এক কোণে ছোট লণ্ঠন। ভাল করে কিছুই দেখা যায় না। হাতের কাছে নতুন সাবান। হড়হড় করে জল ঢেলে সাবান মেখে চান তো করল। তারপর বাইরে এসে চিৎকার। বলি, ওটা কী সাবান, কে এনেছে, রাখল কে? ও তো কার্বলিক সাবান—কুকুরে মাখে। রাম রাম, কী গন্ধ! আমি কি ঘেয়ো কুকুর!'

ঠাকুমা খুব নিরীহ মুখ করে বলল, 'দেখেছ শিবুর কাণ্ড। বলেছিলাম গরমে ঘামাচিতে মরছি। যা তো বাজার থেকে একটা লাল লাল সাবান নিয়ে আয়। ওর যা বুদ্ধি।...তুমি বরং এক কাজ করো, আমি বাক্স থেকে ভিনোলিয়া সাবান বার করে দিচ্ছি। আবার একবার চান করে এসো।"

ঠাকুরদা রেগেমেগে চিৎকার করে উঠল, 'চুপ রাহো। তামাশা লাগাতি হো!' একেবারে আবগারি পুলিশের হুংকার।

রমু হেসে গড়িয়ে পড়ল আমার গায়ে। তার মাথার চুল আমার কোলে লুটোপুটি খেতে লাগল যেন।

একসময় নিজেকে সামলে নিয়ে রমু বলল, "দাদা, তোমার ঠাকুমা কী মজার মানুষ ছিল! হাউ ফানি..."

বৃষ্টি থেমেছে। অন্ধকার নেমেছে ছাদে। বৃষ্টির গন্ধ যেন শরৎ শেষের সন্ধের বাতাসের সঙ্গে মিশে আমার ঘরটিকে ঘন করে তুলেছিল।

আমি বুঝি কী ভাবছিলাম। বললাম, "রমু, মজার ওই মানুষের জীবনটা কেমনভাবে কেটেছে জানিস না! শুনেছিস তো।...কত দুঃখ, কত যন্ত্রণা তার কপালে লেখা ছিল। স্বামী খুন হল। গুন্ডা বদমাশদের হাতে। গাঁজা আফিং নিয়ে যারা কারবার করে তারা ছেড়ে দেবার লোক নয়। ঠাকুরদার বিক্রম তারা ভোজালি চালিয়ে বন্ধ

করে দিল। ঠাকুমা তখনও পূর্ণ যুবতী। দুটি ছেলের মা, আর কোলে একটি অবোধ মেয়ে।"

রমু আমার কোলের ওপর মাথা হেলিয়ে শুয়ে থাকল। চায়ের মগ নামিয়ে রেখে নাতনির মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললাম, "আমার জেঠামশাই তখন দশ বছরের ছেলে, বাবা আট, আর পিসি দেড় বছরের খুকি। ওই তিনটি সন্তান নিয়ে ঠাকুমার লড়াই শুরু হল জীবনের সঙ্গে। বাপের বাড়ি থেকে ডাকাডাকি করেছিল। ভাইরা কমবেশি সাহায্যও না করেছে এমন নয়। কিন্তু ঠাকুমা নিজে? পুঁটুলি নিজে সামলাবে জেদ করে ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে লাগল। কেমন করে জানিস? তখন হাত-পাউরুটি, বিস্কুটেরই চলন। ঠাকুমা বাড়ির একপাশে বেকারি করে রুটি বিস্কুট তৈরি করে। গোরুর গাড়ির মতন একটা কাঠের গাড়িতে বসে মিশনারি এক মেমবুড়ি এসে সেগুলো নিয়ে যেত। মোরোব্বা করে ভরে রাখত শিশিতে। সেগুলোও নিয়ে যেত বুড়ি। মামাদের তরফ থেকেও সাহায্য ছিল কমবেশি।...তা জেঠামশাই বাবাকে মনের মতন করে লেখাপড়া শেখাতে পারেনি ঠাকুমা। স্কুল শেষ করে জেঠামশাই ঢুকে পড়ল রেলের ওয়ার্কশপে। অ্যাপ্রেন্টিস। তখন ধরাকাটা কম, চাকরির বাজারেও এত কাঁটা বিছোনো নয়। জেঠামশাই হাতেকলমে কাজ শিখে চাকরি পেল রেলে। মাইনে পঁচিশ না সাতাশ টাকা।"

রমু হেসে ফেলল। বিশ্বাসই করতে চায় না। বলল, "যাঃ, সাতাশ আবার মাইনে হয় নাকি! গপ্প ছাড়ছ!"

বললাম, "সে কী আজকের কথা নাকি রে! তখন চার-পাঁচ টাকা মণ চাল, সাত-আট টাকা মণ মাছ। তাও লোকে বলত বাজারে আগুন ধরেছে।"

"আরব্যরজনী নাকি?"

"এখন তাই মনে হয়। আমারও হয়।"

"তোমার বাবার কী হল?"

"স্কুল শেষ করে বাঁকড়ো কলেজে পড়তে গেল বাবা। কলেজ শেষ করার আগেই জেঠামশাইয়ের বিয়ে হয়ে গেল। জেঠা তখন চাকরি করতে করতে বিলাসপুরটুর সরে গিয়েছে। বাবার কপালে জুটল কোলিয়ারিতে অফিসের চাকরি।"

"মাইনে কত?"

"পঞ্চাশ।"

"বাঃ, তবু পঞ্চাশ। বড় ভাইকে টপকে গেল?"

"টপকাবে কেন! জেঠা তো তখন দূর থেকে আরও দূরে চলে যাচ্ছে। মাইনেও বেড়েছে। বছরে একবার করে আসত বাড়িতে।" বলে আমি একটু থামলাম। নিশ্বাস পড়ল বড় করে। বললাম, "জেঠার কী হল কে জানে! জেঠাইমার ছেলেপুলে হচ্ছে না, পাঁচটা বছর কেটে গেল। জেঠা কার পাল্লায় পড়ে গর্হিত কাজ করে ফেলল একটা। জেঠাইমাকে লোক দিয়ে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে আর-একটা বিয়ে করে ফেলল সেখানে। ঠাকুমাকে চিঠি লিখে জানাল অবশ্য।"

"তখন বেশ ফটাফট এ-বেলা ও-বেলা বিয়ে করা যেত। কেয়া মজা!"

"সে এখনও যায়, ভাই। শুধু একবার উকিল ধরা আর কোর্টে যাওয়া। তবে

জেঠামশাইয়ের বেলায় মজাটা বড় দুঃখের হল। ঠাকুমা সাফসুফ লিখে দিল, আমি মারা যাবার আগে পর্যন্ত তুমি আর এখানে আসবে না। তোমার বা তোমার নতুন বউয়ের মুখ আমি দেখতে চাই না।"

"বিচার হইয়া গেল...! দারুণ।"

"ঠাকুমা মারা যাবার পর শ্রাদ্ধের সময় জেঠামশাই এসেছিল একলা।"

"তারপর?"

"জানি না। ওরা কোথা থেকে কোথায় চলে গেল। মারা গেল জেঠামশাই। নতুন জেঠাইমাকে কোনও দিন দেখিনি। তাদের ছেলেমেয়েদের খবরও রাখিনি। কানাঘুষোয় যা শুনেছি সেটাও ঠিক না বেঠিক জানি না।"

রমু যে এসব কথা একেবারেই জানে না তা নয়। সাংসারিক গল্পগাছার মধ্যে শুনেছে কিছু কিছু।

কী ভেবে রমু বলল, "আচ্ছা দাদা, তোমার সেই প্রথম জেঠাইমা তো তখন বেঁচে ছিল, জেঠামশাই যখন মায়ের শ্রাদ্ধ করতে এল?"

"ছিল বই কি!"

"দু'জনের দেখাটা কেমন হল?"

আমি বললাম, "দেখা বোধ হয় হয়নি। শ্রাদ্ধের বাড়িতে মুখ দেখাদেখি নিশ্চয় হয়েছে। কিন্তু যতদূর জানি কেউ কারুর সামনে যায়নি।"

"আশ্চর্য! তোমার জেঠাইমার তেজ ছিল। আগেকার মেয়েদের মতন স্বামীর পা ধুয়ে জল খেতে পারল না!"

"আগের বউরা বুঝি সবাই স্বামীর পা ধুয়ে জল খেত! আর এখনকার বউরা কী খায়!"

"মাথা!" বলে হাসতে হাসতে রমু উঠে পড়ল। তারপর আমার গালে গাল ঠেকিয়ে ছোট্ট করে চুমু খেল। "অ্যান্ড দিস্ সুইট কিসিং-মিসিং!" খিলখিল করে হাসি। "চলি গো বুড়ো দাদা। কাল আমার অনেক কাজ। কত আইটেম জান? লিস্ট শুনলে ভিরমি খাবে।...আমি চলি। তুমি বসে বসে ঠাকুমা জেঠিমা করো।" চায়ের মগ তুলে নিয়ে চলে গেল রমু।

দুই

সন্ধে হয়ে গিয়েছে। বৃষ্টি আর পড়ছে না। শরতের বাতাসে এখন মিহি ঠান্ডা, তার সঙ্গে বর্ষার ভিজে ভাব মিশে শিরশিরে ভাব লাগছিল। পুজো এবার দেরি করে শুরু, বাংলা মাসের হিসেবে কার্তিক ছুঁতে চলেছে। সময়টা আমার মতন আশির গায়ে হেলে দাঁড়ানো বুড়োর পক্ষে ভাল নয়। রমু ঠিকই বলেছে। তা ছাড়া এবার বর্ষায় জ্বরে সর্দিকাশিতে ভুগেছি খানিকটা। সাবধান হওয়া উচিত।

দুটো জানলা ভেজিয়ে দিলাম। একটা খোলা থাকল। দরজা তো খোলাই।

বিছানায় সারাদিন শুয়ে থাকা আমার পোষায় না। সন্ধেবেলাতে তো নয়ই। হাত কয়েক ভেতরের দিকে ডেকচেয়ারটাকে সরিয়ে বসেই থাকলাম। সিগারেট খাবার

জন্যে উঠতে আর ইচ্ছে হল না। এখনও দিনে পাঁচ-ছ'টা সিগারেট খাওয়া হয়ে যায়। বারণ করে সকলেই। আমার ডাক্তার হরিপদ, ছেলেরা, বউমারা, মায় রমু পর্যন্ত ধমক দিয়ে বলে, তোমার মতন দু কান কাটা মানুষ আমি আর দেখিনি। সবাই বারণ করছে আর তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে ধোঁয়া ফুঁকছ! মরবে নাকি!

'মরার জন্যেই তো দিন গুনছি।'

'আবদার! মরো তো দেখি! পায়ে দড়ি বেঁধে আটকে রেখে দেব।'

হাসি। ওরে বোকা, যতই লাফঝাঁপ করিস—ক'টা জিনিস যে আটকানো যায় না সংসারে। শোক, জরা, মৃত্যু...। বুদ্ধদেব জীবনের সারমর্ম সঠিক বুঝেছিলেন।

রমু চলে গিয়েছে। ডেকচেয়ারেই বসে ছিলাম। আলোর পাশে বর্ষার পোকা উড়তে শুরু করেছে। টিকটিকি ছুটে গিয়েছে দেওয়ালে। দরজার কাছে জোনাকি নেচে গেল একজোড়া।

আমার ঠাকুমা জেঠাইমাকে নিয়ে একটু রগড় করে গেল রমু। তা তো করবেই। কতবার কতভাবে সে ওদের কথা টুকরো টুকরো ভাবে শুনেছে। মজা পায়, ভালও বাসে। তার কাছে এ সবই তো গল্প।

ওর কাছে গল্প হলেও আমার কাছে যে বড় সত্যি।

জেঠামশাই জেঠাইমাকে ঠেলে দিয়ে দূর থেকে দূরান্তরে চলে গেল।

ঠাকুমা বলল, যাক—ও ছেলে চুলোয় যাক, বাঁচুক মরুক আমি গ্রাহ্য করি না। তুই আমার বউ। আমার কাছে থাকবি। তোর গায়ে আমি আঁচড় পড়তে দেব না যতদিন বেঁচে আছি। আমি তোকে এনেছিলাম, আমার মরার আগে তোর বিসর্জন নেই।

ঠাকুমা ওইভাবেই কথা বলত ছেলের বউয়ের সঙ্গে। কখনও তুই, কখনও তুমি।

সেকালের মেয়ে, কপাল চাপড়ে, পিঠ নুইয়ে, চোখের জলে বুক ভাসিয়ে জীবন কাটাবার কথাই ভাবত না ঠাকুমা। হাত পুড়িয়ে পাউরুটি বিস্কুট মোরোব্বা—এটা ওটা করার জন্যে নামমাত্র সাহায্য নিত অন্যদের। জেঠাইমাকে নিজের সঙ্গে জুড়ে নিল।

আমার ঠাকুমা সেকালের হিসেবে একেবারে অশিক্ষিত ছিল না। বাংলা পড়তে পারত ভালই। রামায়ণ মহাভারত ছাড়াও দু-চারখানা বই দিব্যি পড়া ছিল।

জেঠাইমা বেচারির লেখাপড়া বলতে অক্ষরজ্ঞান আর শিশুবোধ।

ঠাকুমা ধরল এক হাত জেঠাইমার, আর বাবাকে বলল, বউদিকে তুই পড়াবি, বীরু। বাবার নাম ছিল বীরেন।

বাবা আর বউদি কাছাকাছি বয়সের। কিন্তু বিয়ের পর ক'বছর বাইরে জেঠামশাইয়ের কাছে থাকায় বাবার সঙ্গে জেঠাইমার মাখামাখি ছিল নামমাত্র। জেঠাইমা পরিত্যক্ত হয়ে এ-বাড়িতে পাকাপাকি এসে পড়ার পর দুজনের মধ্যে ধীরে ধীরে খুব টান ধরে গেল।

বাবা তার বউদিকে বাংলা গদ্য পদ্য থেকে নাটক নভেল পর্যন্ত পড়িয়ে সড়গড় করে দিল। সেই সঙ্গে ইংরিজির দু-এক ধাপ। অংক কমসম।

জেঠাইমা বলত, আমি কি মাস্টারনি হব নাকি ঠাকুরপো, এত সব শেখাচ্ছ!

বাবা তার বউদিকে বড় ভালবেসেছিল। বলল, আমি বাড়ির বাইরে ওই চালাঘরে

তোমায় একটা স্কুল করে দেব। গাঁয়ের ছেলেদের পড়াবে। তোমার মাইনে পুজোর সময় দুটো গন্ধ সাবান, এক শিশি অগুরু আর বিষ্টুপুরি একটা শাড়ি।

জেঠাইমা হাসত। তাই দিয়ো।

ঠাকুমা তখনও বেঁচে। তবে শরীর ভাঙছে। জেঠাইমার কাজ বাড়ছে অনেক। বাবার কথা মতন খড়ের চালায় স্কুল হল। গ্রামের দশ-বারোটা বাচ্চা ছেলে কুমোর কামার চাষি পাড়ার জুটিয়ে এনে বসিয়ে দেওয়া হল ছেঁড়া মাদুরে। দুপুরে তারা গলা তুলে বিদ্যাসাগরের বর্ণ পরিচয়ের প্রথম ভাগ চটকাত; নামতা ধরত একে-কে এক, দুইয়ে-কে দুই। আর শেষে হাতাহাতি, আমগাছে ঢিল ছোড়া, কুলের গাছ ধরে প্রাণপণে ঝাঁকানো।

জেঠাইমা বলল বাবাকে, আমায় একটা লিকলিকে বেত এনে দাও তো। আর একজোড়া চশমা। পাজিগুলো মানতে চায় না।

সে কী, বেত মারবে?

ওদের মারব না, চৌকির ওপর পিটব। শব্দতেই ওরা চুপ করে যাবে।

জেঠাইমার বেত এল। তারে জড়ানো চশমা। দুটো কাচ ছাড়া কিছু নেই। জেঠাইমা সেই চশমা চোখে দিয়ে বলল, এবার বেশ দেখতে পাচ্ছি।

বাবা খুব হাসল। বলল, তোমার ছাত্র তো একে একে সব পালাচ্ছে, এরপর কী করবে?

আবার ধরে আনব; কত পেয়ারা ধরেছে গাছে, শীত পড়লেই পাটালির টুকরো, যাবে কোথায় পাজিগুলো।

স্কুল অবশ্য চলেনি। বাবার বাঁকুড়া কলেজও শেষ হল না। চাকরি জুটল কোলিয়ারিতে।

আমাদের জায়গা বদল হল। সালানপুর থেকে মধুবাগলা। ঠাকুমা তখন চোখে ভাল দেখছে না, মাথা ঘোরে, ঘুম হয় না। হাঁটু ফুলে ওঠে প্রায়ই। কী মনে করে বিয়ে দিল ছেলের। বাবার একটু কম বয়েসেই বিয়ে হয়েছিল। তবে সেকালে পঁচিশ-ছাব্বিশটা কমও নয়।

মা আমার না সুন্দরী, না স্বাস্থ্যবতী। তবে অমন কোমল শান্ত ছোট্ট মুখ সচরাচর চোখে পড়ে না। কী যে মমতা মাখানো শ্যামলা মুখ, আর ঠোঁটজোড়া মধুর হাসি। নাম ছিল শ্যামশ্রী।

জেঠাইমার নাম হাসিরাশি, মায়ের নাম শ্যামশ্রী। জেঠাইমার বেলায় নামটা ভুল হয়েছিল। মায়ের বেলায় অন্তত নয়।

মাকে ডাকা হত শ্যামা বলে।

জায়ে-জায়ে ভাব ভালবাসা ভালই ছিল। মা বেচারি তেমন খাটিয়ে ছিল না, অক্ষরজ্ঞান সামান্যমাত্র, তবে সুরেলা গলায় গান গাইতে পারত, ভজন, কীর্তন, হাতের কাজকর্মও চমৎকার জানত, সেলাই এমব্রয়ডারি আলপনা আঁকা।

আমার জন্ম মায়ের কম বয়েসেই। সতেরো ধরছে তখন।

ঠাকুমা নাতির মুখ দেখল বটে, তবে সে তখন পাখির ছানা যেন। বাঁচে না মরে ঠিক নেই। তাতেও কি ঠাকুমা দমে! নাম রাখল, রাজা। বড় হয়ে সেই নাম হল

রাজমোহন।

দেব-দেবতায় ঠাকুমার ভক্তি আর বিশ্বাস ছিল অন্য পাঁচজনের মতন। নিজেই বলত, দুধেজলে মেশামেশি। মানে কিছু পরিমাণ খাঁটি বাকিটা ভেজাল। তার ওপর সেই মিশনারি বুড়ি, কাঠের গাড়ি চেপে যে রুটি বিস্কুট নিতে আসত সে ঠাকুমাকে মথি লুক যোহনের সুসমাচার শুনিয়ে বিগড়ে দিয়েছিল খানিকটা।

বলতে লজ্জা নেই, ভুলেও যাইনি যে আমার পিসি ঠাকুমার 'বেকারি ঘরের' একটা ছেলের সঙ্গে গলাগলি করতে করতে একদিন পালিয়ে গিয়েছিল। ছেলেটা যেন বন থেকে বেরিয়ে আসা বাঘের বাচ্চা। গায়ের রং অবশ্য কালো। কিন্তু সমস্ত শরীর তেজে আর শক্তিতে অদ্ভুত নেশা ছড়িয়ে দিচ্ছে। তিন বেলা তার কাজ, সকালে ঠাকুমার কাছে আসে, দুপুরে সাইকেলের দোকানে কাজ করে, বিকেলে ঘুমোয়, আর রাত্রে কারখানার স্ল্যাগ ঢালার গনগনে গলিত লৌহ আবর্জনা ঢালার টব গাড়িগুলোর গুনতি করে। অদ্ভুত মানুষ। নাম হিরা। হিরালালের রাঁচির দিকে কোথাও বাড়ি। মা তার পাগলা হাসপাতালে। হিরার গলায় রুপোর ক্রস ঝোলে, ডান হাতে লোহার বালা। ওরা চলে গেল কোথায়! কেরল থেকে চিঠি এসেছিল কয়েকটা। তারপর বোধ হয় বর্মায় চলে গিয়েছিল।

ওদের কথা আর জানি না।

ঠাকুমা তখন বড় ছেলে, মেয়ে—কারও কথা বলত না।

আমি তখন স্কুল শেষ করতে চলেছি— পনেরো-ষোলো বয়েস, ঠাকুমা চলে গেল। শেষের ছ' সাত দিন—একেবারেই জ্ঞান ছিল না। চোখের পাতা প্রায় জুড়ে আছে, হাত পা নড়ে না। মাঝে মাঝে পায়ের বুড়ো আঙুল কেঁপে ওঠে সামান্য।

কোলিয়ারির ডাক্তারবাবু বললেন, সন্ন্যাস। তখন আজকের মতন রোগের বড় বড় নাম জানত না মানুষ। কোলিয়ারির ডাক্তারই বা কতটা জানবে! পরে বুঝেছি সেরিব্রাল হেমারেজ হয়েছিল ঠাকুমার।

ওইসময়ে হঠাৎ এক ভদ্রলোক আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। বয়স্ক মানুষ। একমাথা সাদা চুল, দাড়ির অর্ধেকটাই সাদা। গায়ের রং তামাটে। হাড়-হাড় চেহারা। মুখটি শান্ত ধরনের, চোখদুটি তীক্ষ্ণ। পরনে খদ্দরের খাটো পাঞ্জাবি, ধুতিও খদ্দরের, গায়ে একটা চাদর। পায়ে মোটা চটি। উনি নিতান্ত একটা লোহার সুটকেস নিয়ে এসেছিলেন। তাতে দু-তিনটি জামাকাপড়, গামছা, এক কৌটো হরীতকীর টুকরো, দুটি-তিনটি বই : গীতা, বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্র আর মহাত্মা গান্ধীর লেখা একটা বই।

কে ইনি? হঠাৎ কোত্থেকে এসে জুড়ে বসলেন?

বাবার কাছে শুনলাম আমাদের জ্ঞাতি। একই দেশের মানুষ।

আমাদের কোনও দেশ ছিল না। কবে কোন কালে মুর্শিদাবাদের এক গ্রামে একটা বসবাস ছিল। তারপর শরিকি ঝগড়ায়, চালাকিতে, ম্যালেরিয়া আর ন্যাবা রোগে আমাদের পূর্বপুরুষকে পালিয়ে আসতে হয় দেশ ছেড়ে। খাওয়া-পরার সঙ্গতিও ছিল না।

অত কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ নেই। সহজ কথা একদিন আমরা ভাসতে ভাসতে মধুপুর গিরিডির দিকে এসে ঠাঁই পাই। ওরই মধ্যে আমার পূর্বপুরুষ সালানপুরে সামান্য

জমিজায়গা নিয়ে, মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করে স্থায়ী হয়ে বসেন। ওটা এই বাংলাদেশেই, তবে বিহারের গা-ছোঁয়া।

সেটাও অবশ্য থাকল না। ঠাকুমার অত কষ্ট অনেকটাই ঘুচে গেল বাবা যখন কোলিয়ারির চাকরি নিয়ে মধুবাগলায় এসে হাজির হল।

বলতে গেলে, আমাদের ভাগ্যে সেই যেন বাদলা কেটে রোদের মুখ উঁকি দিল। বাবা কোলিয়ারির অফিসে ঢোকার পর দু-চার বছরের মধ্যে একেবারে খাজাঞ্চিবাবু—মানে ক্যাশবাবু। আমাদের কোয়ার্টার হল, অর্ধেক পাকা বাকিটা খড়ের ছাউনি দেওয়া। চারপাশে পলাশ, বুনো তুলসী, অর্জুন গাছ। কুলগাছও যত্র তত্র।

কোলিয়ারিতে সাহেবসুবোদের দাপাদাপি তখন। মানে তারা মাথায় চড়ে আছে। কোম্পানির এজেন্ট, জেনারেল ম্যানেজার, ম্যানেজার। বাকি তলার দিকে আমাদের মতন কালা আদমি। তবু গণ্ডগোল বিশেষ ছিল না। ওরা তো এক বা দুজন, বাকিরা যে আমরা। তা ছাড়া তখন খাঁটি সাদা চামড়া যাদের দেখা যেত তারা একটু নরম। কাজ বুঝত, করিয়ে নিতে পারত। থাকত অবশ্য রাজার হালে। বেলিসাহেবের বাংলোয় দুটো মালি, চারটে চাকর, বাঁধা ঝাড়ুদার। বাংলোর মধ্যেই বাঁধানো টেনিস কোর্ট। আমরা শুনতাম, বর্ষাকালে কখনও কখনও বেলিসাহেবও দেড়-দু দিন পিটের মধ্যে ভূতের মতন খেটেছে।

মিথ্যে কথা বলে লাভ নেই। বেলিসাহেবের কৃপায় বাবার ভালই চলছিল। মাইনে ছাড়াও বাবার যে কোথ্থেকে কেমন করে উপরি জুটত, আমি সঠিক জানি না; অনুমান করতে পারি।

ওই প্রবীণ ভদ্রলোকের নাম ছিল বেণীমাধব নিয়োগী। উনি আমাদের বাইরের দিকের খড়-ছাওয়া একটা ঘরে থাকতেন। মাছমাংস খেতেন না। আহার ছিল যৎসামান্য। অল্প ডাল ভাত কুমড়ো ঝিঙের তরকারি, দু-তিনটি রুটি, একটু গুড়, অন্য সময় একবাটি মুড়ি।

সকালে কুয়োর জলে স্নান, একমনে গীতা পাঠ, লাঠি হাতে ঘুরতে ঘুরতে সাঁওতাল পল্লি ছাড়িয়ে প্রায় পঞ্চকোট পাহাড় পর্যন্ত বেড়াতে যাওয়া। দুপুরে কী যেন লিখতেন, আর সন্ধেবেলায় লণ্ঠন জ্বালিয়ে বই পড়া। এক একদিন গানও গাইতেন : 'মন চল মোর নিজ নিকেতনে' বা 'ধরিয়া যে রাখিতে পারে তোমায়—সে বড় ধন্য গো!'

বাবার হুকুমমতো আমরা তাঁকে বেণীদাদা বলতাম।

বাড়ির অন্দরমহলে বেণীদাদাকে দেখা যেত না— শুধু দু বেলা খাবার সময় নিজের জায়গাটিতে এসে বসতেন। কাঠের পিঁড়িতে পিঠ সোজা করে বসে আস্তে আস্তে খাওয়াই ছিল অভ্যাস। জেঠাইমাই বেশির ভাগ সময় বসে থাকত কাছে। মা মাঝে মাঝে। বেণীদাদার কাছে মা-জেঠাইমা শুধুই বউমা। বড় বউমা ছোট বউমা। খেতে বসে দু-চারটি কথা, বেশির ভাগই নিজেদের দেশের। কোন সবজিকে কী বলে ওখানে গ্রাম দেশে আর এখানে। ওখানে যাকে বলত 'রাম পটল' তোমরা এখানে বল 'ঢেঁড়স'। আমাদের শিঙাড়া কড়াইয়ে ভাজা হয় না বউমা, সেটা থাকে পুকুরের জলে, তোমরা বল 'পানিফল'। আমাদের দেশে ভাত আর পরমান্ন ছাড়া সব রান্নার পদেই

জিরে মশলা।

অন্য কথাও যা হয়, সামান্য। নিজের পরিচয় ব্যাখ্যা করেন না কোনও দিনই বেণীদাদা।

আমি তাঁর সঙ্গী হতে পারিনি। মনে মনেও চাইনি হয়তো। ওই চুপচাপ গম্ভীর শ্বেতশুভ্র মানুষটিকে কাছের মানুষ বলে মনে হত না। তবু কখনওসখনও দাদার মুখে শ্রীঅরবিন্দ, গান্ধী, বিপিনচন্দ্র পাল, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তর নাম শুনতাম। আর মাঝে মাঝে একটি শ্লোক : সর্বকর্মফল ত্যাগ; ততঃ কুরু যতাত্মবান্। এর মানে কী জান রাজুবাবা! সত্যিকারের অর্থ হল কর্মফল ত্যাগ করা বড় কথা নয়, তোমার নিজের স্বার্থ ত্যাগ করতে পারলেই তবে সেটা 'সৎকর্ম' বা সৎকর্ম হবে। এই হল ত্যাগ এবং শান্তির মন্ত্র!...ক'জন পারে, লাখে একজনও কি নিঃস্বার্থ কর্ম করতে পারে! ডিমের খোলার মতন সবসময় আমার আমি আমিত্ব অহংকার আমায় ঢেকে রেখেছে। গান্ধীজি বিরাট মানুষ, তবু বাইরের খোলা ভাঙতে পারেননি।

এসব বড় বড় কথা আমার বোঝার কথা নয়। বুঝতেও পারিনি। তবে অসহযোগ, পিকেটিং, বোমার যুগের কথা একেবারে না শুনেছি তাও নয়।

তা হঠাৎ একদিন বাবা এসে বেণীদাদার ঘরে গিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত কী সব কথাবার্তা বললেন। কেউ জানল না।

দু দিন পরেই বেণীদাদাকে আর বাড়িতে দেখতে পেলাম না।

পরে একদিন মায়ের মুখে শুনলাম, বেলিসাহেব বাবাকে সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, তোমার বাড়িতে যে বয়স্ক ভদ্রলোকটি আছেন—তিনি ফেরারি রাজদ্রোহী। গভর্নমেন্ট সাসপেকটেড পলিটিক্যাল পার্সনদের খুঁজে খুঁজে অ্যারেস্ট করছে। তুমি জানো, মেদিনীপুরে তিন বছরে পর পর কতগুলো ম্যাজিস্ট্রেটসাহেব রিভলবারের গুলিতে মারা গিয়েছে! ওকে বলো, অন্য কোথাও চলে যেতে।

বেণীদাদা মেদিনীপুরের লোক নয়, মুর্শিদাবাদের লোক। তবু বাঙালি। রাজদ্রোহী। দাদা চলে গেলেন। এসেছিলেন হঠাৎ, চলেও গেলেন হঠাৎ।

আমি তারপর বাঁকুড়া কলেজে গিয়ে পাত পাড়লাম, মানে পড়তে ঢুকলাম।

বাবার ইচ্ছে, আমাকে বি এসসি পাস করিয়ে মাইনিং এনজিনিয়ারিং বা ওইরকম কিছুতে পড়তে ঢোকাবেন।

তার তো দেরি অনেক। এরই মধ্যে সংসারে অন্য কান্ড ঘটে গেল। জেঠাইমা একদিন চলে গেল।

না, চিরশান্তির কোলে গিয়ে চোখ বুজল না। চলে গেল এক আশ্রমে: সদাসংঘ আশ্রমে। সেখানে মেয়েরা সমাজের সেবাকর্ম নিয়ে দিন কাটায়। চরকা কাটে, সুতো বোনে, গাছগাছড়া বেটে ওষুধ তৈরি করে, অন্যের বাড়ি গিয়ে অসুখেবিসুখে সেবা করে, আর সকাল সন্ধে স্তোত্র পাঠ করে।

ব্যাপারটা বড় আচমকা ঘটে গিয়েছিল। নাটকীয় বলা যায়। কেন ঘটেছিল আমি জানি না। মায়ের সঙ্গে জেঠাইমার রেষারেষি কোনওদিন দেখিনি। একই সংসারে থাকতে হলে রাগ অভিমান পছন্দ অপছন্দ নিয়ে মুখভার কোথায় না হয়! সেটা একেবারেই ধর্তব্য বলে আমার মনে হয় না। তা ছাড়া আমার মা বরাবরই শান্ত ধীর

নরম স্বভাবের মানুষ। ভিতু ধরনের। ব্যক্তিত্ব নিয়ে মাথা ঘামায়নি। বড়জাকে দিদির মতনই দেখেছে। মান্য করেছে।...তা হলে এমন হল কেন?

বাবা নিজের বউদিকে একদিকে বন্ধু অন্যদিকে অগ্রজার সম্মান দিয়ে মাথায় করে রেখেছেন বরাবর। কলুষ, কলংক, আঘাত—কিছুই ছিল না। তবু জেঠাইমা চলে গেল।

যাবার আগে বাবাকে বলেই গিয়েছিল।

জেঠাইমা তো আজ আর নেই। কবেই চলে গিয়েছে, বাইরের মাটিই তাকে টেনে নিল।

কিন্তু কী জানি কেন, জেঠাইমার এই পরিণতির জন্যে আমি বেণীদাদাকে দোষ দিই।

তিন

তখনও আলো ফোটে না, শেষ রাতের আঁধার জড়ানো, অস্পষ্ট প্রত্যুষে ঘুম ভেঙে যায়। গাছগাছালির পাখিরাও তখন ডাকে না, শুধু একটা মৃদু সাড়া, প্রায় গুঞ্জনের মতন শোনা যেতে পারে কান পেতে থাকলে। আমার মোটামুটি একটা হিসেব-জ্ঞান হয়েছে এই সময়টার। চার কি সওয়া চার, ঘড়ি দেখার দরকার হয় না।

বুড়ো মানুষের ঘুম। চার-পাঁচ ঘণ্টার বেশি হবার কথা নয় সাধারণত। তাও গভীর ঘুম কতটুকুই বা হয়!

শুয়ে থাকতে থাকতে আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করি। ফরসা হয়েছে বুঝলে উঠে পড়ি। একটিমাত্র জানলা খোলা ; বাকিগুলো বন্ধ। দরজাও খোলা থাকার কথা নয়।

বিছানা ছেড়ে উঠতে উঠতে মনে হয়, ছেলেবেলায় এই সদ্য-ভোর ছিল যেন শত্রু। চোখ খুলতে ইচ্ছে করত না, ঘুম জড়ানো থাকত, মনে হত সকাল যেন আরও দেরি করে আসে, বালিশ আঁকড়ে পড়ে থাকি আরও অনেক— অনেকক্ষণ।

এখন ঠিক উলটো। ভোরের ফরসা চোখে পড়লেই মনে হয়, আরেকটা দিন তবে শুরু হল। ঠিক জানি না, কেমন একটা নিশ্চিন্ত ভাব আসে। রাত্রে কিছু ঘটেনি ; বাড়ির লোককে উতলা উদ্‌ভ্রান্ত করিনি, কোনও ব্যস্ততা বিভ্রান্তি ঘটাইনি তাদের।

দিনের শুরুটা তাই সাহস যোগায় যেন। হার্টের বড় একটা গোলমাল না থাকলেও দুর্বলতা তো থাকবেই সামান্য। এই বয়েসে কার না থাকে! তার ওপর আমার দু দফা ব্রংকো নিউমোনিয়া গোছের হয়েছিল। গত বছরেই একবার। ডাক্তাররা আজকাল বলে, শ্লেষ্মা জমতে দেবেন না বুকে, সামান্য থেকে বিপত্তি হবে। আর আপনার তো কন্‌জেসান ট্রাবল আছেই। নো স্মোকিং, প্লিজ!

ডাক্তাররা বলে অনেক কিছুই, অত মানামানি করলে বেঁচে থাকাই দায়। বয়েসটা দেখবে না, ভাদুড়ি! লোহার স্ট্রাকচারও মরচে ধরে ক্ষয়ে যায় যে। প্রেসারের ওষুধ খেয়ে, ঘুমের বড়ি গলায় ঢেলে কতকাল বাঁচা যায়! ওই বিজলী, আমার স্ত্রী, নয় নয় করেও আট বছরের ছোট আমার বয়েসের চেয়ে, শরীর-স্বাস্থ্য খারাপ কোথায় ছিল!

বসে বসে দিনও কাটাত না। তবু ব্লাড সুগারের আদরে পড়ে শরীর গেল, চোখ গেল বারোআনা, শেষে কিডনি, তারপর তোমাদের ভাষায় হার্ট বরবাদ, ডাইলেটেড্ হার্ট। বিজলী চলে গেল।

আমায় আর কত সাবধান করবে! জীবনটা ফ্রিজ নয় যে গ্যারান্টি পিরিয়ড পার হবে, বা হলেও তোমরা তাকে সবসময় মেরামত করতে পার! আন্‌নোউন ফ্যাক্টর থেকে যাবেই। অন্তত আমার তাই মনে হয়।

ঘরের দরজা খুললাম। জানলাও। ফরসা ছড়িয়ে গিয়েছে। কাল কতক্ষণ বৃষ্টি হয়েছিল, মাঝরাতেও বারিবিন্দু ছাদ ভিজিয়েছিল কি না জানি না, তবে এখন সব শুকনো। বাতাস যেন ধুয়েমুছে নির্মল, সামান্য ঠান্ডা, শিরশির করে গা, ছাদের আর্দ্রতা রাত-শিশিরের। পাখি ডাকছে।

ছেলেবেলায় সারা বছর চাইতাম সকালের চাকাটা যেন মন্থর হয়ে যায়, রোদ ওঠে বেলায়। তবে কয়েকটা দিন সেই চাওয়া পালটে যেত। সেটা এই পুজোর সময়, আর সরস্বতী পুজোর দিন।

এখন তো সেই পুজোই এসে গেল।

আকাশের কোথাও মালিন্য নেই। এক টুকরো মেঘও নয়। একেবারে সাদা পরিষ্কার আকাশ।

আমার ঘরে ইলেকট্রিক হিটার আছে। চায়ের জল চড়িয়ে দিলাম। এটা আমার বরাবরের অভ্যাস। পাশের কোঠায় নিবারণ আছে। ডাকলেই উঠে এসে চা করে দেবে। কিন্তু কেন ডাকব বেচারিকে। ঘুমোক যতটা পারে।

গায়ে পাতলা একটা চাদর জড়িয়ে মুখ ধুতে ঘরের লাগোয়া কলঘরে গেলাম। ছোট কিন্তু শুকনো। নিজের মনের মতন করে এই বাথরুম আমি তৈরি করিয়েছিলাম। বিজলী থাকলে তার অসুবিধে হত না।

চোখমুখ ধুতে গিয়ে বিজলীর কথা মনে পড়ল। সে চোখে এত কম দেখত যে তার টুথব্রাশে আমাকে পেস্ট লাগিয়ে দিতে হত। না দিলে তার হাতের আর দৃষ্টির গোলমাল হত, গায়ে শাড়িতে পেস্ট পড়ে যেত।

মুখ ধুয়ে নিজের চা তৈরি করে নিতে যতটুকু সময়— তার মধ্যেই পুবের আকাশে রং ধরেছে।

এই রং কিন্তু এখনও জবাকুসুম সংকাশং নয়, অনেকটা ফিকে, লাল আভার সঙ্গে সামান্য সোনালি ভাব। কাঁচা টাটকা রং।

সকালের চায়ে আমি দুধ দিই না। চিনি থাকে সামান্য। পরিমাণটাও বেশি। আসলে উষ্ণতা দিয়ে উদরকে জাগিয়ে তোলা। বুড়ো বয়েসে যা হয়, ডাক্তাররা বলে, পেটের মাংসপেশিগুলো ঢিলেঢালা অশক্ত হয়ে যায়। হাঁটাচলা কাজকর্মের নড়াচড়া না থাকায় স্বাভাবিক শক্তি পায় না যন্ত্রগুলো। যেটা দরকার। ... ত্রিফলা আমি খাই না। সহ্য হয় না। ওইসব শিশির ওষুধও নয়। আমার ঠাকুমা শিশির ওষুধ দেখলেই বলত, তোর ঠাকুরদা কাশির ওষুধ হজমের আরক খাচ্ছি বলে মাঝে মাঝে লুকিয়ে গন্ধ-ওষুধ খেত। আমি ঠিক ধরে ফেলতাম।

অন্য সময় খেত না!

আবগারির পুলিশ। খেত মাঝে মধ্যে। টং হয়ে আসত বাবু।

তুমি তখন কী করতে?

ঘরের বাইরে উঠোনে বারান্দায় কাঠের টুলে বসিয়ে গায়ে গোবরজল ঢেলে দিতাম হড়হড় করে।

আমি হেসে গড়িয়ে পড়তাম। গোবরজলে শুদ্ধি করতে?

হ্যাঁ। গোবরের গন্ধে টং বাবুর নেশা ছুটে যেত।

সূর্য উঠে গেল।

শরতের নীলচে আকাশ রোদে রোদে সোনার জল ছড়িয়ে দিচ্ছে। কাকের ডাক, শালিখ চড়ুইয়ের নাচন, বক উড়ে গেল আকাশে।

ততক্ষণে আমি তৈরি। ধুতি জামা, কোনওদিন পাঞ্জাবির বদলে বুশ শার্ট, গায়ে পাতলা চাদর জড়িয়ে ছড়ি হাতে নীচে নেমে এলাম।

সকালের ঘণ্টাখানেক নীচেই কেটে যায়। বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে ঘুরি, বা বাইরে এসে দাঁড়াই ফটক খুলে। দু-দশ পা হাঁটি। এর ওর মুখ দেখি ; দুটো কথা।

আজ নীচে নামতেই ছেলেবেলার পড়া সেই পদ্য মনে পড়ল। 'কাঁপিয়ে পাখা নীল পতাকা জুটল অলিকুল ...। এ বাড়িতে বাগান নেই, জমি পড়ে আছে সামান্য এক-দেড় কাঠার মতন। সেখানেই দু-চারটে গাছ, জবা, কামিনী, টগর। ফটকের সামনে শিউলি গাছের পুরো মাথাই যেন মাটিতে ঝুঁকে পড়েছে। অজস্র ফুল ছড়িয়ে আছে মাটিতে, গাছের পাতায় কালকের সন্ধেবেলার বৃষ্টিতে ভেজা ফুল, রাতের শিশিরে আর্দ্র ফুলের গুচ্ছ আর পাতা। বাতাস সুবাসময়। দোপাটির ক'টা গাছ হেলে গিয়েছে। ফড়িং উড়ছিল, আর কয়েকটা প্রজাপতি। একজোড়া ভ্রমর।

ফটক খুলে পলু এল। আমার বড় নাতি উৎপল।

পরনে সাদা হাফ প্যান্ট, গায়ে নীল কলার-তোলা সুতির গেঞ্জি, পায়ে হাল ফ্যাশানের স্পোর্টস শু, সাদা মোজা, গলার সামনে হলুদ রঙের টার্কিশ তোয়ালে। ওর মাথার চুল ঝাঁকড়া মতন, বড় বড়, কপালে টেনিস-খেলোয়াড়দের মতন স্ট্র্যাপ।

পলু রোজ ভোর ভোর দেড়-দু মাইল চক্কর মারতে বেরোয়। দৌড়োয়, জগিং করে।

বগলে তার গোটা তিনেক খবরের কাগজের বান্ডিল।

"হ্যালো ওল্ড ম্যান...! তবিয়াত ঠিক হ্যায় না! ... এই নাও আজকের কাগজ। রাখালের সঙ্গে দেখা, সাইকেলে বসেই ডেলিভারি দিয়ে দিল।"

"আজ কতটা?"

"দুর্গাপুর ব্রিজ।"

"অ-নেকটা।" বলতে বলতে আমি ওর কাঁধ গলায় জড়ানো তোয়ালেটা টেনে নিয়ে নাতির মুখ গলার ঘাম মুছোতে লাগলাম।

"দাও, আমি মুছে নিচ্ছি। সোয়েটিং ভাল ...!"

"ও! তুই তো আবার হেলথ্-টেলথ্ ভাল বুঝিস!"

"দাদা, হেলথ্ ইজ ওয়েলথ্। ছেলেবেলায় পড়েছ, কিন্তু পাত্তা দাওনি। নয়তো

আশি না পড়তেই ঝুঁকে পড়ছ!" পলু মজা করে হাসল।

"আশি কম?"

"হুত, আশি থেকেই তো গাড়ির টপ্ গিয়ার। কত আশিবাবু মাঠে-ময়দানে ভাষণ ঝাড়ে, তপসে মাছের বাটার ফ্রাই খায়। তোমায় আমি একটা চার্ট করে দিয়েছিলাম না। ডেলি তোমার কত ক্যালরি দরকার। ফ্যাট আর মিষ্টিফিস্টি কম, বাকি সব চালিয়ে যাবে।..." বলতে বলতে পলু তোয়ালেটা মাথার ওপর নাচাতে নাচাতে বারান্দার দিকে ছুটল। "এখন আমার তিন গ্লাস জল, দশ মিনিট রেস্ট, তারপর ভেজানো ছোলা আর দশটা বাদাম, উইথ্ আদার কুচি।"

পলু চলে গেল।

কাগজ হাতে নিয়ে আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম। তিনটে কাগজ আসে বাড়িতে, দুটো বাংলা একটা ইংরিজি। পাঁচ হাতে ঘোরার পর বিকেলে এগুলো চটকে ছিঁড়ে কোথায় যে পড়ে থাকে কে জানে!

চারপাশে তাকালাম। গাছের পাতা জমেছে কোথাও, দু-চার জায়গায় কাদা, কচি নিমগাছের মাথায় রোদ ঘন হয়ে আসছে। চোখে পড়ল বাড়ির চারপাশের পাঁচিল বেশ বিবর্ণ। অবশ্য পেছনের দিকের পাঁচিল আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না।

এই বাড়ি আমার হাতে পুরোপুরি তৈরি হয়নি। বাবা আমার মায়ের সূত্রে পাঁচ-ছ কাঠা জমি পেয়ে গিয়েছিলেন। তখন এখানে লোক বসতি প্রায় ছিলই না। মাঠ, জলাজমি, পুকুর, হোগলা বন আর শেয়ালের রাজত্ব। বাইরের লোক আমরা। কলকাতার কাছাকাছি থাকার বাসনাও ছিল না। শহুরে ধাতই আমাদের নয়। অথচ একসময় বাবার প্রায় বুড়ো বয়েসে, মানে পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর নাগাদ, কলকাতার হেড অফিসে আসতে হল বাবাকে। তিন-চারটে কোলিয়ারি ঘেঁটেঘুটে বাবা সেসময় মার্টিনস-এ। কয়লাখনি তখনও সরকারি হাতে যায়নি।

কলকাতার ভাড়া বাড়িতেই থাকতাম আমরা। আরও পরে কত কিছু বদলে গেল। বাড়ি বাড়ি করে মা কেমন উসখুস করত। বাবা যেন ভবিষ্যৎ বুঝে এই বাড়ির ভিত দিলেন।

হোগলা আর বাঁশঝোপ সাফ করে, বাবলা গাছের জঙ্গল মাটিতে মিশিয়ে একটি-দুটি করে বাড়ি হচ্ছে তখন এখানে। পুকুরে শাপলা ফুল দেখা যেত। সাপখোপও ছিল। আবার কাশফুল। বর্ষা ফুরোতে ফুরোতে কত সাদা এপাশ ওপাশ।

মাথা গোঁজার মতন ব্যবস্থা করে আমরা চলে এলাম এখানে। সময় বয়ে যাচ্ছে হুহু করে। কত কিছু ঘটে যাচ্ছে চারপাশে।

আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, একটা বড় জাহাজ যেন কোনও পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ভেঙেচুরে ডুবে গেল সমুদ্রে। আমরা শুধুই যাত্রী। জাহাজটা কোথায় যাচ্ছে, তার দিশা কী, সামনে কত গভীর কুয়াশা, কী আছে শেষে— ভাল করে বুঝে ওঠাও যায়নি। ধাক্কা খেয়ে জাহাজ ভাঙল, ডুবল, আমরাও জলে তলিয়ে গেলাম। এরপর যা হয়, মরিয়া হয়ে বাঁচার চেষ্টা। কারা ডুবে গেল, বেঁচে গেল কারা ভাগ্যবশে সে ইতিহাস জেনে লাভ নেই এখানে।

বাবার তৈরি করা মাথা গোঁজার আশ্রয়কে একদিন আমি দোতলা করতে

পেরেছিলাম। আমারও তখন বয়েস হয়ে গিয়েছে। পিতৃসাধ আমি মেটাতে পারিনি। না হয়েছি এনজিনিয়ার, না মাইনিং ম্যানেজার। আসলে আমার মাথাই ছিল না, উদ্যমও নয়। টেক্সটাইল পড়েও লাভ হল কোথায়! শেষে আমাকে এক গুজরাটি মালিকের জাহাজি কারবারের অফিসে ঢুকতে হল।

মালিক যত না, তার মেজো ছেলে তার চেয়েও বেশি প্রশ্রয় দিল আমাকে। কয়েক ধাপ সিঁড়ি অনায়াসেই উঠে গেলাম। বরাত যাকে বলে। শেষমেশ যেখানে গিয়ে থামলাম, নিম্নবিত্ত ছেলের পক্ষে সেটা কম নয়। খাতির আর প্রতিপত্তি নিয়েই অবসর নিতে হল একদিন।

এই বাড়ির গোড়ায় বাবা, আর শেষে আমি। বছর পঞ্চাশ মোটামুটি হয়ে গেল, বাড়ি পুরনো তো হবেই। কোথাও কোথাও যোগ-বিয়োগও হয়েছে বাড়িতে, আর মিস্ত্রিমজুরও ডাকতে হয়েছে কতবার। আজও হয়।

"তুমি কি আকাশের চিল ওড়া দেখছ? না শুনছ?"

হুঁশ হল। চোখ তুলে দেখি, আমার ছোট নাতি মৃদুল।

"কাগজগুলো দাও। এখন তো দেখছ না। আমি বারান্দায় আছি।"

হাত থেকে সকালের খবরের কাগজগুলো নিয়ে নিল মৃদুল। ওকে বাড়িতে আমরা ছোট খোকা বা শুধুই 'ছট্টু' বলে ডাকি। মাঝে মাঝে 'ছোট খোকা'। আমার ছোট ছেলের ছেলে। রমুর চেয়ে এক-দেড় বছরের বড়। প্রায় পিঠোপিঠি দু জনে।

উৎপল, মানে পলু আর ছোট খোকা একেবারে উলটো। স্বভাবে, চেহারায়, চলনেবলনে। পলু যেমন ফরসা, প্রাণময়, চঞ্চল, শরীর স্বাস্থ্য ঝকমকে, কথায়বার্তায় খই ফোটায়, মৃদুল বা ছোট তা নয়। ছোটর চেহারা রোগাটে, তবে একেবারে ক্ষীণ নয়। তার গায়ের রং শ্যামলা। অথচ মোলায়েম। পলুর মুখ গোল ধরনের, গালের হাড় চোখে পড়ে না, নাক ছোট, চাপা, দাঁত ধবধব করছে, কাঠবাদাম চিবিয়ে ফেলতে পারে এক কামড়ে। চোখ তার বড়, উজ্জ্বল। মুখে গোঁফ দাড়ি রাখে না। মৃদুল বা ছোটর মুখের গড়ন লম্বাটে ধরনের। নাক লম্বা, সরু। ওর চোখদুটি লম্বা টানা, নীল মণি, জোড়া ভুরু, কী যে এক মায়া-জড়ানো চোখ। এক একসময় আমার মনে হয়, ও আমার মায়ের একটা ছোঁয়া পেয়েছে চোখে।

ছেলেবেলায় ছট্টুর কান আর গলার কাছে একটা টিউমার দেখা দিয়েছিল। গ্ল্যান্ড ফুলে উঠছে, না কী হচ্ছে ভেবে অপারেশান করিয়ে ফেলা হয়। কিন্তু তার দাগ মেলায়নি। সাবালক বলা যাবে না, তবে আঠারো-উনিশ থেকেই ও একটু দাড়ি জমাতে লাগল। সেই দাড়ি এখন পাতলা হলেও বেশ কালো। দাগটা চট করে নজরে পড়ে না।

ছেলেটা নির্জীব নয়, আবার তার জেঠতুতো দাদার মতন ভরপুর নয় প্রাণপ্রাচুর্যে। কিংবা অত চঞ্চল, উচ্ছল, সরব নয়। পলুর গলা সব সময় উঁচু পরদায় বাঁধা। ছট্টুর তা নয়। অথচ তার গলার স্বর ভরাট। পরিষ্কার। ও যখন নিজের মনে খালি গলায় গান গায় অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া, বা আকাশ ভরা সূর্যতারা ... বেশ শুনতে লাগে। রমু বলে, ছোড়দা তুই গানের লাইনে এনট্রি নিয়ে নে এবেলা,

তোর হবে। অন্তত দু-চারটে ক্যাসেট লেগে যেতে পারে বাজারে। পাবলিক নিয়ে নেবে।

ছট্টু বা ছোট বলে, 'পাকামি করিস না। আমি ক্যাসেট সিংগার নই।'

পলু আর রমু— আমার বড় ছেলের ছেলেমেয়ে। পলু আমাদের এই বংশলতিকার, না ভুল হল, হাল আমলের, চলতি বংশধরদের মধ্যে সবার বড়, প্রথম। সোজা কথায় আমার বড় নাতি। তারপর ছোট, ছট্টু। রমু এসেছে তারও পরে। পলুর ছাব্বিশ চলছে। ছট্টুর একুশ মতন। রমু উনিশ পেরিয়ে গিয়েছে। এই বয়েসের হিসেবটা আমার ঠিক মনে থাকে না। ভীষণ কাঁচা হয়ে যায় অংকটা। বিজলী হলে একেবারে নিখুঁত হিসেব বলে দিতে পারত।

আজকাল আমার মাথায় কেমন একটা ঢেউ আসে আর যায়। এই এক ভাবছি কিছু, ভাবতে ভাবতে দেখি সেটা মিলিয়ে গিয়েছে, অন্য একটা ঢেউ এসে গিয়েছে। এলোমেলো হয়ে যায় ভাবনাগুলো।

সেদিন বড় ছেলেকে কী একটা বলতে গিয়ে বলছিলাম, 'তোমার শ্বশুরবাড়ি ওই চুঁচড়োর গণেনবাবু ...।'

কথা শেষ হবার আগে বড় ছেলে হেসে বলল, 'বাবা, তুমি শিরীষের শ্বশুরবাড়ির কথা বলছ। আমার বিয়ে বেহালায় হয়েছিল। গণেনবাবু শিরীষের মামাশ্বশুর।'

আমি খানিকটা অপ্রস্তুত ; কী বলতে অন্য কথা মুখে এসে গিয়েছে। এ বড় অদ্ভুত। কোথায় যেন পড়েছিলাম, সাধারণত বেশি বয়েসে মাথার ভাবনা আর মুখের কথার মধ্যে একটা উলটোপালটা ব্যাপার হয়ে যায়। ডিরেলমেন্ট আর কি, লাইন থেকে বেলাইন।

ঠিক। ছোট ছেলে শিরীষের শ্বশুরবাড়ি চুঁচড়ো। আর বড় ছেলে সতীশের শ্বশুরবাড়ি বেহালায়।

'আমার মাথা আজকাল ...' আমি হাসলাম।

'ও কিছু নয়। আসলে অন্যমনস্ক থাকলে আমাদেরও এমন ভুল হয়।'

"দাদা! ও, দাদা—!" রমু বারান্দা থেকে ডাকছে।

এগিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই ডান হাঁটু আটকে গেল যেন। দু মুহূর্ত এক তীব্র যন্ত্রণা। অস্ফুট কাতরোক্তি। নিজের থেকেই ধীরে ধীরে মিলিয়ে এল ব্যথা। বছর দুই আগে সিঁড়ি নামতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। হাঁটু ভাঙেনি, তবে চোট পেয়েছিলেন জোর। কিছুদিন খোঁড়াতেও হয়েছে। সেই ব্যথা হঠাৎ হঠাৎ, পায়ের ওপর চাপের গোলমাল হলেই যেন ঠোকা মেরে যায়।

বাড়ির বারান্দার কাছাকাছি আসতেই ছোট ছেলের সঙ্গে দেখা। শিরীষ বেরিয়ে পড়েছে। পরনে প্যান্ট শার্ট। হাতে একটা ডাক্তারি ব্যাগ, অন্য হাতে হেলমেট।

"বেরিয়ে পড়েছ? আজ আউটডোর?" আমি মুখ তুলে ছেলেকে দেখছিলাম।

"হ্যাঁ, আজ বুধবার। হাসপাতালে আউটডোর। তুমি কি খোঁড়াচ্ছ নাকি?"

"না। ওই হাঁটুতে খট করে উঠল। টান ...!"

"সকালে উঠে একটু ম্যাসেজ করে নেবে। ড্রাই। বার কয়েক কনট্রাকশান

এক্সারসাইজ। অবশ ভাবটা কেটে গেলে আর কষ্ট হবে না।"

"আচ্ছা! এসো তুমি।"

শিরীষ পা বাড়াতে যাবে বারান্দা থেকে রমু বলল, "কাকামণি, আমার সেই চোয়ালের ব্যথা ..."

"আক্কেল উঠছে। শক্ত শক্ত জিনিস চিবিয়ে খা— ছোলা ভাজা, কাঁচা পেয়ারা, ভুট্টা ..." ভাইঝির কথায় কান না দিয়ে হাসতে হাসতে এগিয়ে গেল। "বাবা, আমি চলি! ... তুমি বাড়ির মধ্যে লাঠিটা ছেড়ে দাও। আন্‌নেসেসারি!"

ছেলেরা আমায় তুমি বলে। আমাদের সময়ে বাবা জেঠা কাকা মামাদের আমরা আপনি বলতাম। জেঠাইমা, মা, কাকিমাদের নয়। বাড়ির গুরুজন পুরুষদের আপনি বলার চল ছিল। মেয়েদের বেলায় নয়। হয়তো তাতে সম্ভ্রম থাকত বাবা জেঠার, কিন্তু সামান্য দূরত্বের ভাবও। আমি তো নিজেই বাবাকে আপনি বলতাম। এখন আপনির পাট চুকে গিয়েছে। ভালই হয়েছে।

শিরীষ চলে গেল। সে ডাক্তার। দাঁতের। ডেন্টাল সার্জন। সপ্তাহে তিন দিন তার আউটডোর থাকে হাসপাতালে। হাসপাতাল বলতে বেসরকারি দাতব্যখানা। বারো কি একটা নাগাদ হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যায় ক্লিনিকে। পাঁচ শরিকের কারবার। সেটা বিবেকানন্দ রোডে। বিকেলের পর ওর নিজের চেম্বার শ্যামবাজার। বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত আটটা-ন'টা। দুপুরের খাওয়া, মানে ওদের ভাষায় 'লাঞ্চ' ক্লিনিকে। নিজেদের ব্যবস্থা আছে।

এই যে এখন বেরিয়ে গেল ছেলে, ও সারাদিন নিজের স্কুটারেই টোটো করবে। দু-তিন হাতফেরতা গাড়ি একটা কিনতেই পারে। কিন্তু কিনবে না। কৃপণ বলে নয় ; গাড়িটা সে এক্ষেত্রে অপব্যয় বলেও মনে করে না। আসলে তার দাদা সতীশ— আমার বড় ছেলে দুটো কোম্পানির ল' অ্যাডভাইসার এবং নিজে ব্যক্তিগতভাবে ওকালতি করেও এখন পর্যন্ত বাস ট্যাক্সি করে বেড়ায়, আর ও গাড়ি কিনে খাতির বাড়াবে— তা হয় না। দাদা যদি ভাবে, ভাই টেক্কা মারছে!

শিরীষ বরাবরই খানিকটা লাজুক, দাদার অনুগত। পরিশ্রম অবশ্যই তাকে অর্থ দেয়। কিন্তু অর্থ আসে বলেই সেটা চোখে আঙুল দিয়ে অন্যকে দেখানো অনুচিত। ঔদ্ধত্য বলে মনে হয়।

শিরীষ চলে গেল।

এই বাড়ির নীচের তলার সামনের দুটি ঘর, আমার বড় ছেলে সতীশের দখলে। তার অফিস। আইনের বই, গাদা গাদা কাগজপত্র, টাইপ রাইটার মেশিন, কেরানি ছোকরার টেবিল চেয়ার নিয়ে ভরে গিয়েছে। পাশের ঘরে সতীশ মক্কেল নিয়ে বসে। একেবারে শেষের ঘরটা আমাদের বারোয়ারি বৈঠকখানা। যার যখন প্রয়োজন হয় বন্ধুবান্ধব নিয়ে বসে পড়ে। নাতিরা বসে, বউমারা পাড়ার দিদি বউদি নিয়ে গল্প করে দুপুর কি বিকেলে।

আমিও একসময় সকালের দিকে বসতাম খানিকক্ষণ। আজকাল আর বড় একটা বসি না।

সতীশের অফিস ঘরের দরজা খুলছে নিবারণ।

"ও, দাদা! তুমি একেবারে কচ্ছপের মতন হাঁটছ! দশ পা হাঁটতেই ঘণ্টা।" রমু অধৈর্য।

"এই তো এসে গেলাম।"

"চলো, চা জলখাবার জুড়িয়ে ঠান্ডা হয়ে গেল।"

"তুই আছিস কেন, ঠান্ডা হয়ে গেলে গরম করে দিবি।"

"বয়ে গেছে। আজ আমার কত কাজ। বললাম না তোমায়! বুড়ো নিয়ে বসে থাকলে চলবে!" রমু চোখ পাকিয়ে বলল। তারপর হাসি।

চার

এই বাড়ির গোড়ার দিকে অন্দরমহল বলতে পিছন দিকের দু-তিনটি ঘর, ঘেরা বারান্দা, চাতাল। বাবার আমলে বাড়িটা যখন একতলা ছিল— তখন আমাদের শোওয়া বসা রান্নাবান্না খাওয়া সবই হত নীচের ঘরগুলোতে। দোতলা, যেটা পরে আমি ধীরে-সুস্থে তৈরি করেছি, এখন সেটাই আমাদের আর এক অন্দরমহল, মানে শোওয়া এবং পারিবারিক বসার জায়গা। ছেলে বউরা থাকে, নাতি নাতনি। তেতলায় অল্প যা ব্যবস্থা— সে আমি অনেক পরে করেছি। বিজলী বেঁচে থাকতেই মাথায় এসেছিল। জানত সে। কিন্তু হয়ে ওঠেনি। বুড়োবুড়ি থাকতে পারতাম। এখন আমি একলা।

নীচের তলার ব্যবস্থাটা পালটে গিয়েছে অনেকদিন। ভেতর দিকে একটা ঘরে রান্না, পাশের ছোট ফালি ঘরে ভাঁড়ার। গা-লাগানো চৌকো ঘরটা খাবার। বাড়ির কাজের মেয়েটি, রাধারানি, বয়স্কা। অনেকদিন আছে। রান্নার ঝঞ্ঝাট সে সামলায়, অবশ্য বড় বউমা তার হাতের পাশেই থাকে। নীচেই তার থাকার ব্যবস্থা। আর নিবারণ তো আমার তেতলার সাথি, পাহারাদার। বয়েস তারও হচ্ছে। তবে অশক্ত নয়। এই বাড়ির সে কী যে নয় বুঝে উঠতে পারি না। বাজার সরকারি থেকে পোস্ট অফিস যাওয়া, কলের মিস্ত্রি ডাকা থেকে ইলেকট্রিক সাপ্লাই অফিসে বিল জমা দিতে ছোটা— সবই তার ঘাড়ে চাপানো আছে। আমায় বলে বুড়োবাবু; আমার ছেলেদের বড়দা ছোড়দা, নাতি-নাতনিদের ডাকে নাম ধরে। বউমারা তার মুখে বউদি।

খাবার ঘরের গা-লাগানো ঘেরা বারান্দাটাকে গ্রিল দিয়ে ঘরবন্দি করে আমাদের চা-জলখাবার খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। রোদ আসে সামান্য বেলা করে। হাওয়া আছে। বৃষ্টির জন্যে ক্যানভাস ঝোলানোর ব্যবস্থা। সিঁড়ির দিকে দুটো পাতাবাহারের টব।

এসব আমার ছোট বউমার মতলবে হয়েছে।

ছোট বউমার নাম বাসনা। এসেছিল যখন— তখন ছিপছিপে ছিল। এখন বয়েসের ভার লেগেছে খানিকটা। গায়ের রং ফরসাই বলা যায়। মুখটি সুশ্রী। বাঁ চোখ সামান্য টেরা। চশমা তার চোখ থেকে নামে না। মাথার চুল পিঠ পর্যন্ত, কোঁকড়ানো। বাপের বাড়ি চুঁচুড়ো।

" আসুন, বাবা।"
চায়ের টেবিলে ছোট নাতি ছট্টু, মানে মৃদুল বসে আছে।
রমু আমার বসার জায়গায় চেয়ারটা এগিয়ে দিল।
পুজোর মুখ বলে সকালে চায়ের ব্যবস্থায় দু-একটা বাড়তি খাবার। টোস্ট, কলা, আলু ভাজার সঙ্গে জিলিপি, সুজি, গজা।
"আপনাকে একটু সুজি দিই আজ?"
ছোট বউমা বলল।
আমার চা-জলখাবার প্রায় বাঁধা। পাউরুটির বড় একটা টুকরো, কড়া করে সেঁকা নয়, সামান্য ছানা, বিনস্ কুচি কুচি করে সিদ্ধ খানিকটা— নুন গোলমরিচ ছড়ানো। আর চা, দুধ চিনি সমেত।
"সুজি! না না, অম্বল হতে পারে," আমি ভরসা করতে পারলাম না।
রমু বলল, "তা হতে পারে, ঘিয়ে ভাজা—" বলে পাশ ঘেঁষে বসতে বসতে হাসল। "জিলিপি খাবে! একেবারে জিবে-গরম, জিব পুড়ে যাবে। বেচুরামের জিলিপি, বনস্পতিতে ভাজা...! কাকি, আমায় প্রথমে চারটে। আহা কী রং, দেখেই জিবে জল পড়ছে।"
"খান না একটু সুজি! কিছু হবে না।"
"কাকি তুমি ওই টিনের কৌটোর ঘি খাওয়াবে, দাদাকে? অম্বলের..."
"আঃ, তুই বড় বাজে বকিস।" ছোট বউমা ধমক দেবার গলা করে বলল, "না বাবা, এক ছিটে ঘি আছে। কিছু হবে না।"
"খাও! আমার কী—!" রমু হাত বাড়িয়ে জিলিপি তুলে নিল একটা। তার যেন তর সইছে না।
ছট্টু বলল, "খাও দাদা। এটা মাড়োয়ারি হালুয়া নয়। ঘি পাবে না, গন্ধই পাবে। ঠাকমা তোমার জন্যে যেমনটি করত, একেবারে তার ফর্মুলা। খেয়ে নাও।"
ছোট বউমা লজ্জা পেয়ে গেল।
আমি কোনওদিন চাইনি, পছন্দও করি না, আমার ছেলের বউরা কেউ আমার সামনে মাথায় কাপড় দিয়ে ঘোরে। ছোট বউমা দেয় না। তবে কাঁধের দিকের শাড়িটা সামান্য তুলে রাখে। বড় বউমারও সেই অভ্যেস। তবে সে মাঝে মাঝে কানের ওপর পর্যন্ত শাড়ি তুলে নেয়।
"দাও। তবে বেশি নয়।"
আমার খাবার গুছিয়ে দিতে লাগল ছোট বউমা।
"দারুণ।... কাকি, কাল থেকে রোজ জিলিপি আনাবে। একে কি জিলিপি বলে! আহা...!"
ছট্টু বলল, "না একে রসচক্র বলে।"
"কী? কী বললে?"
'রসচক্র।"
"মানে!"
"সোজা! যে চক্র রসে ডুবানো থাকে। যেমন, রসগোল্লা..."

রমু যেন হাসির আচমকা দমকে ছিটকে উঠল। মুখ থেকে জিলিপির কয়েকটা টুকরো ছররার মতন বেরিয়ে ছট্টুর গায়ে।
আমরা সকলেই হেসে ফেলেছি।
ছট্টু জামা ঝেড়ে নিতে নিতে বলল, "দাদা, এ একেবারে টোটাল মুখ্যু। সোজা বাংলাও বোঝে না।... তোমার কি সেই গানটা মনে আছে? কাল রাত্তিরে রেডিয়োতে পুরনো বাংলা হিট গান শোনাচ্ছিল। বলল, বিদ্যাপতি ফিল্মের গান। তোমাদের কাননবালা গেয়েছিল।"
"কী গান?"
"তব রথচক্রতলে প্রাণ দিব বলে...! কীর্তনের ঢঙে গান।"
তাকিয়ে থাকলাম ছট্টুর দিকে। বুকের কোথাও ঘা লাগল! হ্যাঁ, মনে আছে। আরও মনে আছে, এই গান যে বিজলীও একসময় গুন গুন করে গাইত। তব রথচক্রতলে প্রাণ দিব বলে...! কে কার রথের তলায় প্রাণ দিল?
"বাবা! কেমন হয়েছে?"
"কী!...সুজি! ভাল হয়েছে।"
পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। পলু আসছে। ওর সিঁড়ি ওঠা-নামার ধরনই আলাদা। যেন লাফ মেরে মেরে ওঠা-নামা করে।
ছোট বউমা ডাকল, "দুধটা দিয়ে যাও, রাধা।
পলু এসে গেল।
স্নান সেরেই এসেছে। পরনে জিনসের প্যান্ট, গায়ে হাফ হাতা শার্ট, নীল রঙের। হাতে একটা প্লাস্টিক ফাইল।
বসবার আগে একবার কোমর নুইয়ে চায়ের টেবিলের খাদ্যবস্তুগুলো দেখে নিল। "বাঃ! এ তো কালসর্প যোগ।"
"কালসর্প?" আমি ওর দিকে তাকালাম।
"জিলিপি আর গজা।" বলে চেয়ার টেনে বসে পড়ল। "কাকি, এটা কার চয়েস! রমুর?"
বাসনা হাসল। "আমি আনিয়েছি।"
রাধারানি চিনেমাটির বাটিতে দুধ রেখে গেল। ছোট বউমা অন্য একটা আলাদা পাত্র থেকে ভেজানো চিড়ের মণ্ড বার করে দুধের বাটিতে মিশিয়ে দিল।
পলু হল এ বাড়িতে স্বাস্থ্য-বিশেষজ্ঞ। তার কাণ্ডই আলাদা। সকালে সে দুধের সঙ্গে চিড়ে খাবে। তবে সেই চিড়ে আগে উষ্ণ জলে, পরে ঠান্ডা জলে ধুয়ে নরম মণ্ড করে রাখা চাই। গরম জলে চিড়ে ধোওয়ার অর্থ জীবাণুমুক্ত করা, ময়লা ধুয়ে ফেলা। তারপর ঠান্ডা জল দিয়ে ধুলে একেবারে সাফ। গরম দুধে ঢেলে দাও চিড়ের মণ্ড। এ হল হাউস মেড্ ওটস। এবার চিনি মিশিয়ে খাও তোমার ওটস।
পলু অবশ্য বড় চামচ দিয়ে দুধের পাত্রটা ঘাঁটতে ঘাঁটতে বলল, "তুমি কালসর্প জান না? ওই জিলিপিটা হল কাল, আর গজা হল সর্প। পেটে গিয়ে দুই পদার্থ যা তৈরি করবে, গ্যাস্ট্রো এনটারো কমবিনেশান— তাতে তোমার গলার তলায় ভুজঙ্গ দংশন..."

"বড়দা তুমি খাবার সময় রোজ..." রমু নাক ফুলিয়ে কী বলতে গেল।
"খেয়ে যা, খেয়ে যা... পেট তোর, গলা তোর", বলতে বলতে পলু নিজেই গোটা চারেক জিলিপি আর দুটো গজা দুধের বাটিতে গুঁড়ো করে মিশিয়ে নিল। এরপর সে এক জোড়া কলা খাবে। রোজই খায়।
আমরা হেসে উঠলাম একসঙ্গে।
ছট্টু বলল, "তোর গ্যাসট্রো নেই?"
"আমি দেখলাম, তোদের সঙ্গে নীলকণ্ঠ হওয়াই ভাল।... ভাইবোন ফেলে কি যুধিষ্ঠির স্বর্গে যেতে চেয়েছিল...!"
"যুধিষ্ঠিরের বোন!"
"ওই হল।... দাদা, তুমি কিন্তু এদের কথায়— মানে ওই জিলিপি গজায় ভুলো না। বিষবৎ ত্যাজতে..., তোমার আশি চলছে।...নে তোরা চালিয়ে যা।"
চায়ের টেবিলে হাসির অট্টরোল উঠল। ছোট বউমাও হাসছে।
পলু সকালের এই খাওয়া সেরে বেরিয়ে যাবে। তারও একটা পুরনো স্কুটার আছে। বেলা একটা-দেড়টা পর্যন্ত ছোটাছুটি করবে, কারখানা দোকান এখানে ওখানে। দুপুরে বাড়ি আসবে ভাত খেতে, ঘণ্টা দুয়েক জিরিয়ে আবার বেরিয়ে যাবে। বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত আটটা।
পরিশ্রম করে ছেলেটা। ক্লান্তি নেই, হতাশা নেই। অঢেল জীবনীশক্তি ওর।
নিবারণ এল। আমি তখন চা খাচ্ছি। আমার কাছাকাছি এসে দাঁড়াল।
"কী?"
"ভূপতিবাবু এসেছেন!"
"ভূ-পতি! ওই বাজার পাড়ার..."
ছট্টু বলল, "ভূপতি হালদার।"
পলু বলল, "দাদা, ভূপতি এখন প্রমোশান পেয়ে দু নম্বর গ্রেডে উঠেছে। চার থেকে তিন, তিন থেকে নাম্বার টু গ্রেড নেতা। হেলাফেলার পাত্র নয়।"
"তা আমার কাছে কেন?"
"পুজোর চাঁদার জন্যে নয়। সেটা বাবার কাছ থেকে নিয়ে যায়। তা ছাড়া ভূপতিরা নিজের হাতে দুর্গাপুজো কালীপুজোর চাঁদা নেয় না। ওরা সামনাসামনি ঠাকুরফাকুর নিয়ে নাচে না। বলবে, বিশ্বাস করি না।...চাঁদার জন্যে আসেনি।"
"তবে?" বলে আমি নিবারণের দিকে তাকালাম। "বসার ঘরে বসা, আমি আসছি।"
"দেখো কেন এসেছে!"
"চা পাঠিয়ে দেব?" ছোট বউমা বলল।
"দাও!"
গ্রিলের ফাঁক দিয়ে একটা প্রজাপতি উড়ে এল। নীল সাদার ছিট। গ্রিলের ফটক অবশ্য খোলা। বাইরে সিঁড়ির ধারে লেবু গাছ, একটা রঙ্গন, লাল।
বড় বউমা নীচে নামেনি এখনও। স্নান সেরে, ঠাকুর ঘর পুজোপাট মিটিয়ে নামতে নামতে তার বেলা হয়। নীচে নামার পর আর তার ওপরে ওঠা সম্ভব হয় না দুপুর

পর্যন্ত।
ছোট বউমা আজ চায়ের পাট সাজিয়ে বসলেও অন্যদিন, রবিবার কি ছুটিছাটা বাদে এসময় থাকতে পারে না। সে একটা প্রিপেটারি স্কুলে, মাইলটাক দূরে, পড়াতে যায়। 'মর্নিং গ্লোরি'—এই ধরনের একটা নাম স্কুলটার। কে জি পড়ানো হয়। কাজেই রমু আর রাধা মিলে চায়ের পর্ব সামলায়। এখন যে ছোট বউমার স্কুলের ছুটি হয়ে গিয়েছে পুজোর।
আমি উঠে পড়লাম। "তোরা বোস।"

নীচের বসার ঘরের জানলা, দরজা খোলা। রোদ ঢুকতে শুরু করেছে জানলা দিয়ে।
ঘরে পা দিতে না দিতেই ভূপতি উঠে দাঁড়াল। প্রণাম করল এগিয়ে এসে।
"আরে তুমি! বসো বসো।"
"আপনি কেমন আছেন মেসোমশাই?"
"আছি। চলছে। এই বয়েসে যেমন থাকা যায়...। বোসো।"
"কতদিন ভাবি আসব", ভূপতি বলল, "মনে মনে ঠিক করে হয়তো এদিকেই আসছি, মাঝখানে আটকে গেলাম। কেউ না কেউ ধরল। এটা ওটা, ফেঁসে গেলাম। তা বলে ভাববেন না, খবর রাখি না। শিরীষের সঙ্গে দেখা হয় প্রায়ই। খোঁজখবর পাই।" নিজের জায়গায় গিয়ে বসল সে।
ভূপতি শিরীষের বন্ধু। সমবয়েসি। ছেলেবেলায় একসঙ্গে পড়াশোনা, খেলাধুলো করেছে। ভূপতি এখন স্কুলটিচার। দমদমের দিকে একটা স্কুলে পড়ায়। অংকের মাস্টারমশাই। তার এখনও নাকি নীচের দিকের ক্লাস নিয়েই থাকতে হয়। যদিও তার মাথা বেশ সাফ।
"তোমার বাড়ির খবর?" আমি বললাম।
"মোটামুটি। মায়ের ছানি অপারেশান করাতে হবে এই নভেম্বরে। আপনার বউমার তো যখন তখন গল ব্লাডারের ব্যথা।... আর বলবেন না, রোজই একটা না একটা লেগে আছে। সংসারের ঝামেলা নিত্য।"
"চা খেয়েছ?"
"হ্যাঁ, বেশ চা।"
"তারপর বলো?"
ভূপতি সামান্য ইতস্তত করে বলল, "আমি দুটো আরজি নিয়ে এসেছি মেসোমশাই।"
"আরজি! কী?"
"আমাদের পাড়ার পুজো প্যান্ডেলের পাশে আমরা একটা বড় স্টল করছি। পুজো নিয়ে মাতামাতি আমার— আমাদের নেই। পাড়ার পুজো, কম পুরনো হল না, হচ্ছে হোক, বাড়ির মেয়েরা, বুড়োবুড়ি, বাচ্চাকাচ্চা আছে— তারা তো আনন্দ পায়, পাক। উৎসবটা আলাদা জিনিস। তাতে বাদসাধা অনুচিত।"
"তোমাদের কীসের স্টল?"

"বঙ্গশ্রী!"

"বঙ্গশ্রী! মানে?"

"মানে আমরা বাংলা বাঙালি সংস্কৃতির একটা পরিচয়, ঐতিহ্য ধরে রাখার চেষ্টা করব স্টলে। বড় স্টল করব। গ্রামের কুঁড়েঘরের স্টাইলে সাজাচ্ছি ওটাকে। যেমন ধরুন, বাংলা পটচিত্র, পুতুল, মাটির কাজ, কাঁথা, ছবি, বাংলা বই, এমনকী পুরনো বাংলা গানের কিছু রেকর্ড...যা পারছি সাজিয়ে স্টলটা করছি।"

"ও!"

"বাঙালির আত্মচেতনা দিন দিন মিইয়ে যাচ্ছে, আমাদের উদ্দেশ্য সচেতনতা বাড়িয়ে তোলা। নিজেদের জীবনধারা, ভাবনা-চিন্তা, গৌরব হারিয়ে ফেলে পাঁচমেশালি হয়ে যাওয়ার একটা হাওয়া এসে গিয়েছে, মেসোমশাই। আমাদের সর্বনাশ হচ্ছে।"

ভূপতিকে আমি দেখছিলাম। মাথায় খাটো, আধময়লা গায়ের রং, পাড়ার অন্য পাঁচজন ছেলেদের সঙ্গে আলাদা করে চোখে পড়ার কারণ ছিল না। তবু শিরীষের বন্ধু বলে, এ-বাড়িতে আড্ডা জমাতে আসত বলে তাকে অনেক দিন ধরে দেখছি। এখন ভূপতির বয়েস হচ্ছে। তবে অতটা বয়েস নয় যে কানের পাশে চুলগুলো পাকিয়ে ফেলবে। অথচ ওর চুল পাকছে, একটু মোটা হয়েছে, মুখের ভাঁজে দাগ ধরেছে।

"তা আমায় কী করতে হবে?" আমি বললাম।

"কিছু নয়। শুধু প্রথম দিন আপনি কিছুক্ষণের জন্যে যাবেন। আমরা চাইছি, পাড়ার বৃদ্ধ প্রবীণ জ্ঞানীগুণী যাঁদের পারি প্রথম দিন আমাদের স্টলের সামনে নিয়ে গিয়ে, সসম্মানে, ঘণ্টাখানেক বসিয়ে রাখতে। তাতে আমাদের মর্যাদা বাড়বে, প্রতিবেশী সংযোগ..."

"ও!"

"আমি আপনাকে আমন্ত্রণ জানাতে এসেছি মেসোমশাই!"

"পারলে যাব।"

"না না, পারতেই হবে।... ভাল লাগবে আপনার। বলাইবাবু, ডাক্তার দত্ত, মুরারিসার, মিস্টার বিশ্বাস... অনেককেই দেখবেন। সেদিন আবার দীনু বাউলের গান আছে। অনেক কষ্টে ধরেছি। বীরভূম থেকে আসবে।... তারপর মানিকের গণসংগীত।"

"কীর্তনও হবে নাকি?"

"না না, ওসব ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গ— নয়। হরিসভার আখড়া ওটা নয়।"

"ও! তুমি কীর্তন শুনেছ কখনও!"

"ওই রেডিয়োফেডিয়ো টিভি-তে মাঝে মাঝে হয়, কানে গেছে। অশ্রাব্য!"

আমি মনে মনে হাসলাম। ভাবলাম বলি, ভূপতি—, তোমাদের স্টলের স্টাইল খড় ছাওয়া ডেকোরেটেড বললে না, গ্রামের কুঁড়েঘরের মতন করে সাজাবে, তা স্টলের সামনে একটা এঁড়ে বাছুর যদি বেঁধে রাখতে পার, এক আঁটি খড় মুখের কাছে

রেখে, বোধ হয় বঙ্গসংস্কৃতির শো মানানসই হবে।

কথাটা বললাম না। পরিহাসটা ওর ভাল লাগবে না।

"তোমার অন্য আরজিটা কী?" স্বাভাবিকভাবেই বললাম আমি।

"বলছি।"

ভূপতি ইতস্তত করল। শেষে বলল, "শিরীষ বলছিল, পুজোর পর শীত নাগাদ আপনাদের এই বাড়ির অনেকগুলো জায়গা মেরামতি হবে।"

আমি অবাক হলাম। বাড়ি মেরামতির কথা উঠেছে ঠিকই— তবে সেটা কথাসূত্রে; নির্দিষ্টভাবে ঠিক হয়নি কিছু। বাড়ি থাকলেই ভাঙাচোরা মেরামতি রং— এসব তো থাকেই।

"কেন বলো তো?"

"না, ইয়ে—, আপনি হয়তো জানেন না, আমার শ্যালকটিকে দাঁড় করাবার জন্যে আমায় খানিকটা চেষ্টা করতে হয়! কী করব মেসোমশাই, ওর দ্বারা অন্য কিছু হল না। আজকাল ও একটা বিল্ডিং মেটিরিয়াল সাপ্লাইয়ের দোকান করেছে। আমিই ব্যবস্থা করে দিয়েছি। তা ছাড়া ওর হাতে মিস্ত্রি-মজুরও আছে। শিরীষকে আমি বলেছিলাম। ও বলল, তুই বাবাকে বলে রাখ।"

আমি ভূপতিকে দেখছিলাম। ওর আসল আরজি কোনটা? 'বঙ্গশ্রী', না শালার বিল্ডিং মেটিরিয়াল সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা করে রাখা আগেভাগে! আশ্চর্য!

সামান্য চুপ করে থেকে বললাম, "আমার সঙ্গে তো ছেলেদের সঠিক কথা কিছু হয়নি, ভূপতি। পাকাপাকিভাবে ভাবিনি আমরা। পুরনো বাড়ি, মাঝেসাঝে এটাসেটা করতেই হয়।...তা ঠিক আছে, আগে কথা হোক, শীতেরও তো দেরি। তোমার কথা আমার মনে থাকবে।"

ভূপতি ঘাড় হেলিয়ে হাসিমুখ করল, যেন নিশ্চিন্ত হল আমার কথায়।

"মেসোমশাই?"

"বলো?"

"গৌরীপুরের কাছে মণীন্দ্র ল্যান্ড ডেভালাপমেন্ট অ্যান্ড হাউসিং হচ্ছে, কাগজে বিজ্ঞাপন বেরোয় দেখেছেন?"

ভূপতির শার্ট বাদামি রঙের। ঘন বাদামি। প্যান্ট কালচে। পায়ে চটি। আগে ধুতি শার্ট পরত। এখন প্যান্টের চলন। স্কুলের মাস্টারমশাইরাই বা দোষ করল কোথায়! ওর জামা দেখতে দেখতে আমি বললাম, "চোখে পড়ে থাকতে পারে, মনে পড়ছে না! কেন বলো তো?"

গোপন কথা বলার মতন গলা নামিয়ে ভূপতি বলল, "ওই কোম্পানির দু-একজনের সঙ্গে আমার জানাশোনা আছে খানিকটা। ওরা যে হাউসিং স্কিম করেছে— সেটা বেশ ভাল। গাদাগুচ্ছের বাড়ি নয়, মাত্র তিনটে ব্লক, এ বি সি। সি ব্লকে ফ্ল্যাট থাকবে। বাকি দুটোয় শুধু প্লট বিক্রি। বাড়ি নিজের মতন করে নাও। তবে দোতলার বেশি নয়। বাড়িগুলোর ডিজাইন..."

"তা আমি কী করব? হাউসিংয়ের ব্যবসায় মাথা ঘামিয়ে..."

"না; বলছি শিরীষের জন্যে। ওর জন্যে পাঁচ কাঠার একটা প্লট প্রায় ব্যবস্থা করে

ফেলেছি।”

অবাক হয়ে ভূপতিকে দেখছিলাম। বিশ্বাস হচ্ছিল না। অসম্ভব। শিরীষ আলাদা জমি কিনবে? কেন? কই কোনও দিন শুনিনি তো!

“কী করবে জমি?”

“নীচে ক্লিনিক। চেম্বার, রোগী বসার ঘর। দোতলায় নিজেদের থাকা—।”

“ও!”

“সতুদাকেও বলেছিলাম একটা ধরে রাখতে। রাজি নয়। বলল, না হে— আমার পুরনো সব মক্কেল, তাদের অসুবিধে হবে। অত দূরে কে যায়। আমি বরং সল্ট লেকের নতুন সেক্টারগুলো প্রেফার করি। বাড়ি ফ্ল্যাট যা হয় দেখা যাবে।”

আমি প্রায় উঠে পড়লাম। “আচ্ছা, এবার তা হলে...”

“আমিও আসি মেসোমশাই।”

“এসো।”

ভূপতি চলে যাবার পর ঘরের চারপাশে তাকালাম। হঠাৎ মনে হল, মাথার ছাদ যেন নিচু হয়ে এসেছে। তাই কি! বাড়ির ভিত বসে যাচ্ছে নাকি! সম্ভব নয়। তবু, মনে হচ্ছে কেন!

পাঁচ

সন্ধের মুখে বাড়িতে হইরই। দোতলায় যেন পাঁচটা গলা একসঙ্গে শোরগোল তুলে মাতিয়ে তুলেছে নীচেটা।

চোখে না দেখলেও বোঝা গেল সুখি এসেছে। তার গলা নিচু পরদায় থাকে না কোনও দিনই। ঠাট্টা করে বিজলী বলত, বাঘের গলা। আমিও বলি, তবে বাঘ নয়, বলি ষাঁড়ের গলা। এখন অবশ্য বলি না। অনেক আগে বলতাম।

সুখি আমার পুরনো বন্ধু। কৈশোর যৌবনের। বন্ধু হলেও সমবয়েসি নয়। বছর সাত-আটের ছোট। ওর আর বিজলীর বয়েসের মধ্যে এক-দেড়, কি দু বছরের তফাত হতে পারে। আবার ওরা দুজনে দূর সম্পর্কে ভাই-বোন, সে হিসেবে সুখি আমার শ্যালকও।

সুখির পুরো নাম সুখলাল। আমরা বলতাম, তোর নাম সুখেন, সুখরঞ্জন, সুখপ্রসন্ন— যা হোক হতে পারত, তা না হয়ে সুখলাল হল কেন? সুখ কি লাল হয়?

সুখি বলত, আরে এ লাল রং নয়, আদরের লাল। তোমরা বল না, ওরে আমার দুলাল, সোনা আমার, লাল আমার...? ও মেরি লাল রে!

সুখির মতন হাসিখুশি, প্রাণময়, চঞ্চল, মাতোয়ারা মানুষ খুব কমই দেখা যায়। কী গুণ যে ওর মধ্যে আছে কে জানে! আমার কিশোর বয়েসে ও তো বাচ্চামাত্র। যৌবনকালে দেখি সুখি কিশোর হয়ে গিয়েছে। তারপর ও একেবারে টপাটপ বয়েসের সিঁড়ি ভেঙে আমার ঘাড়গলা দু হাতে জাপটে ধরল যেন। নিজের অন্তরঙ্গতা ও বন্ধুত্ব দিয়ে জড়িয়ে ফেলল আমাকে। তা ছাড়া, পরে বিজলীর সম্পর্কটাও ওকে যতটা আশকারা দিল, আমাকে ততটাই স্নেহময় করে তুলল।

মানুষের বয়েস হয়। সুখিরও হয়েছে। কিন্তু ওর বাহাত্তুরে ধরা বয়েসটা এখনও দশ-বারো বছর পিছিয়ে রয়েছে বললে ভুল হয় না। মাথার চুল সব সাদা, ছোট ছোট, লতানো। কানের কাছে রেশমি জুলফি। ওকে দেখে যে আন্দাজ করা যাবে বয়েসটা চেহারায় বা চোখেমুখে তার ছাপ নেই। বয়েস ওর শরীরস্বাস্থ্যে স্বাভাবিক দাগ বসাতে পারেনি এখনও। মুখ বসেনি, গাল ভাঙেনি। চট করে চোখে পড়ার মতন নয়। মাথায় মাঝারি। চাপা চোখমুখ, গায়ের রং ফরসাই ছিল তবে এখন তামাটে ভাব এসেছে। হাত পা শক্ত। কথা বলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে।

অনেক দিন পরে সুখি এসেছে। গত বছর শীতের সময়, বছর শেষে, মানে ডিসেম্বরে এসেছিল, আর এই এল। মাঝে একবার উঁকি দিয়ে গিয়েছে একবেলার জন্যে। ওটা ধর্তব্য নয়। সচরাচর এত দেরি হয় না। চার-ছ' মাস অন্তরই হঠাৎ এসে পড়ে। দু-চার দিন থেকে আবার ফিরে যায়।

ওর চিঠি অবশ্য পাই। মাসে একটা তো বাঁধা। আমার চিঠি লেখার লোক এখন মাত্র দুজন। সুখি, আর হরিহর। হরিহর আমারই বয়েসি, ছেলেবেলার বন্ধু। দিল্লিতে মেয়ের কাছে থাকে। একসময় আর্কিটেক্ট-এর কাজ করত, ছেড়ে দিয়েছে অনেকদিন।

দোতলা মাতিয়ে তেতলায় আসতে সুখির প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগল। ততক্ষণে সন্ধে হয়ে গিয়েছে। বৃষ্টিবাদলার ছিটেফোঁটাও আজ নেই। সারাটা দিন শুকনো গিয়েছে। আকাশ, রোদ, বাতাস যেন আভাস দিচ্ছিল, পুজোর দিনগুলো ভালই কাটবে। বৃষ্টি হবে না ঝুপঝাপ। তবে শেষ পর্যন্ত কী হবে প্রকৃতিই জানে।

“কী, কেমন আছ রাজুদা?” সুখি এসে দাঁড়াল ঘরে।

“এসো। গলা পেয়েছি।”

“বউমাদের সঙ্গে দুটো কথা বলে এলাম। তারপর এসে জুটল নাতনি, ওদের ব্যবস্থা তো বোঝ, পায়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে, উঠতে দেয় না।”

“বসো।”

“বসছি। কেমন আছ বললে না?”

“ভাল।”

“তোমার সেই হাঁটুর ব্যথা?”

“সবসময় হয় না। মাঝে মাঝে...। আরে, বয়েস কি ছেড়ে কথা বলবে?”

সুখি বসে পড়েছে। ওর একটা বাজে অভ্যেস আছে খইনি খাওয়ার। পকেট থেকে নেশার বস্তু বার করতে করতে বলল, “কে কী ছাড়বে জানি না রাজুদা; আমি কিন্তু এবার তোমায় ছাড়ছি না। আমার সঙ্গে তোমায় যেতে হবে।”

আমি হাসলাম। “তুমি আমায় নিয়ে যেতে এসেছ?”

“এলাম না হয়!... তুমি যাব যাচ্ছি, এখন নয় তখন করে কাটিয়ে দিচ্ছ বার বার। এবার আর নয়।”

“পরে কথা হবে। এখন বলো তো সুখিবাবু— তুমি এবার এতদিন ডুব মেরে ছিলে কেন? কী করছিলে?”

“বাঃ, আমার চিঠি পেতে না?”

"সে বাপু ধাঁধার চিঠি। আমার চিঠিও তো পেতে তুমি!"

হাতের খইনি থেকে একটা টিপ তুলে নিয়ে সুখি ঠোঁটের তলায় রেখে দিল দিব্যি। ওকে কতবার বলেছি, তুই এই খোট্টা অভ্যেসটা ছাড়তে পারিস না! বড় বাজে নেশা।

সুখিকে আমি খুশি মতন, মুখে যখন যা আসে, 'তুমি' 'তুই'— দুইই বলি।

সুখি বলে, আরে আমি চাষাড়ে মানুষ, গরিব লোক, তোমাদের মতন দামি সিগারেট চুরুট কি পোষায় আমার। খইনির এখন স্ট্যাটাস বেড়েছে, দাদা, এ আর খোট্টা নয়, মিনিস্টাররা পর্যন্ত খায়।

খইনি ঠোঁটে রেখে সুখি বলল, "ধাঁধা নয় দাদা, নানান কাজে ফেঁসে গেলে যা হয়, আসতে পারছিলাম না। আমার নিজেরই কি ভাল লাগে চার-পাঁচ মাস অন্তর একবার তোমাদের না দেখে গেলে! এত কাছে থাকি, মেইল ট্রেনে মাত্র ক'ঘণ্টা, এবেলা এসে ওবেলা ফিরে যাওয়া যায়, তবু হয় না। বুঝতেই পারছ!"

"তোমার ঝামেলা মিটেছে?"

"এখনকার মতন একরকম।

"আমি কিন্তু ভায়া, ঝামেলার ব্যাপারটা ঠিক বুঝিনি।"

"পরে শুনবে। ...তুমি চলো না!"

"অনিলা আছে কেমন?" অনিলাকে আমি অবশ্য চোখে দেখিনি। সুখির মুখেই তার কথা শুনেছি।

"অনেকটা ভাল। বলতে পার, পঞ্চাশ ভাগ ভাল। ক'মাস আগে অবস্থা যা দাঁড়িয়েছিল, আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, মনে হত, ও বোধ হয় আত্মহত্যাই করে বসবে।"

নিবারণ এসে সুখির ব্যাগটা রেখে গেল। ক্যানভাসের সুটকেস ধরনের ব্যাগ। ছোট।

সুখি যখনই আসে, আমার ঘরে জায়গা করে নেয়। লোহার হালকা একটা ক্যাম্পখাট আর যৎসামান্য বিছানা— এতেই ওর চলে যায় দিব্যি। এ বাড়িতে ওর থাকার মতন ভাল ব্যবস্থা করা যায় নিশ্চয়, কিন্তু ও থাকবে না। আমার কাছে থাকবে, ঘরে; দুজনে হরেক রকম কথা বলব, গল্প করব, এমনকী অনেকটা রাত পর্যন্ত, পাশাপাশি পৃথক বিছানায় শুয়ে আমাদের গল্পগুজব চলে।

সুখি বলল, "দাঁড়াও, একটু হাতমুখ ধুয়ে আসি। হাওড়ায় নেমে জরুরি দুটো কাজ সেরে এখানে আসছি; ধুলোয় আর তোমাদের কলকাতার ডিজেলের কালো ধোঁয়ায় আমি ভূত হয়ে রয়েছি। দশ মিনিট সময় দাও...!"

"যা ধুয়ে আয়। চা-টা খেয়েছিস নীচে?"

"সে-পাট সেরে এসেছি।"

সুখি তার ব্যাগ খুলে ধোওয়া কাপড় চোপড় বার করল, করে বাথরুমে চলে গেল।

এখন ঠিক ক'টা বাজে জানি না। তবে বেলা মরে আসায় আজকাল অন্ধকার নামে তাড়াতাড়ি, সন্ধে হয়ে যায় ছটা বাজার মুখেই। অনুমানে মনে হল, ঘড়িতে হয়তো সাত-সওয়া সাত হল।

সুখিবাবু থাকে কলকাতার বাইরে। ঘাটশিলায়। আজ বেশ কয়েক বছর, আট-দশ হবে, সে ওখানেই থাকার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। ও যে পাকাপাকি ওখানে থাকবে আমি আগে ভাবিনি। বিজলীও নয়। বিজলী তখন বেঁচে। সুখির কথায় কান দিত না, বলত, রাখো তো, ও চিরটাকাল ভবঘুরে হয়ে কাটাল, আজ এখানে কাল ওখানে। কোথায় কাশী, তারপরই পাটনা, হুট করে চলে গেল চা-বাগানে, তার পরের বছর পুরুলিয়া...; ওর মাথায় ভূত আছে, নাচে। বোলো না ওর কথা। পাগল!

সুখি পাগল নয়, মাথায় ভূত চাপুক বা না চাপুক, ওর স্বভাবে যে ভবঘুরে ভাব আছে, অস্বীকার করা যাবে না। একসময়ে এরকম খেপাটে মানুষ দু-চার জন দেখা যেত। কেন যেত বলতে পারব না, তবে ননীকাকাকে দেখেছি।

ননীকাকার চালচুলো ছিল না। শতরঞ্জি জড়ানো একটা বিছানা, আর টিনের ছোট এক সুটকেস নিয়ে ঘুরে বেড়াত সর্বত্র। ধর্মশালা, আশ্রম, স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম, বনজঙ্গলের বিট বাংলোর বারান্দা যে কোনও জায়গায় পড়ে থাকতে পারত। খাওয়া জুটুক না জুটুক এক বান্ডিল বিড়ি হলেই ননীকাকার চলে যেত। বিড়িও সবটা একসঙ্গে খেত না, ফুরিয়ে গেলে চট করে পাবে কোথায়? গয়ার কাছে কোন এক জায়গায় গিয়ে ননীকাকা এক খেপা সাধুর পাল্লায় পড়েছিল। সেই সাধু তাকে অগ্নিশুদ্ধি না কী যেন শেখাতে গিয়ে আধপোড়া করে ফেলে। তারপর ননীকাকা কোথায় যে চলে গেল কেউ জানতে পারেনি। বছর দুয়েক পরে শোনা গেল, রেল লাইনে কাটা পড়ে মারা গিয়েছে ননীকাকা।

সুখি ননীকাকা নয়। দ্বিতীয় জন যে পাগল ছিল, মাথায় গোলমাল ছিল তা বোঝা যায়। সুখি মোটেই তা নয়। পড়াশোনা শেষ করে সুখি কলকাতার কাছে একটা ভাল কারখানায় চাকরিতে ঢুকেছিল। স্টোরস সেকশান থেকে পাকাপোক্ত হয়ে সে বদলি হল সিকিউরিটিতে। কোম্পানির অবস্থা তখন ভাল। সুখির জন্যে বরাদ্দ কোয়ার্টার পেল। তার গায়ে থাকত খাকি রঙের উর্দি। হাতে একটা এক-দেড় হাতের সরু বেটন। বাঘের মতন একটা কুকুরও পুষেছিল তখন।

তা হঠাৎ, রাতারাতিই বলা যায়, সুখি ঘাড় ধাক্কা খেল। কেউ বলে লাথি খেল মালিকের। কেউ বা বলে মেজাজি চালে ঝগড়া করে সুখি নিজেই চাকরি ছেড়ে দিল। কোম্পানিও তখন হাত বদল হচ্ছে, অবস্থা ডুবুডুবু।

এরপর সুখির যেন ডানা ছড়িয়ে শূন্যে ঝাঁপ দেবার পালা। বা মুক্তি। ওর মতন চতুর কি সবাই হয়! নচ্ছার মানুষটা বিয়েথা ঘর সংসার করেনি। ছেলেমেয়ে নেই যে বাবা বলে কাছা ধরে টানবে। মা ছিল সংসারে। তবে তিনি এল-আই-সি-র অফিসে ভাল কাজ করতেন। তাঁর জন্যে ছেলেকে মাথা ঘামাতে হয়নি। বরং একটি ফ্ল্যাট এবং যাবতীয় সঞ্চয় ছেলের জন্যে রেখে চোখ বুজলেন।

সাধে কি সুখি সুখলাল! এমন সুখের ভাগ্য ক'জনের হয়! ও যে মুক্ত কচ্ছ হয়ে 'যেথা মন ধায়'— করে ঘুরে বেড়াবে এতে আশ্চর্য হবার কী আছে।

বিজলী ওকে কম বকাঝকা গালমন্দ করত না দেখা হলেই। যদিও সম্পর্কে সুখি বিজলীর দাদার মতন। যে মানুষ কোনও কথাতেই কান দেয় না, বরং হাসি হাসি মুখে পাশ কাটিয়ে যায় অন্যের বিরক্তি, তাকে অকারণ গালমন্দ করে লাভ কী!

আমি বিজলীকে বলতাম, যার যা স্বভাব; ওকে ওর মতন থাকতে দেওয়াই ভাল। তুমি কি ওই বাউন্ডুলেটাকে মানুষ করতে পারবে!...বলে আমি হাসতাম। হাসতাম এই জন্যে যে বিজলী বা আমরা যাকে মানুষ বলি, সংসারের সঙ্গে গিট বেঁধে থাকা— তেমন মানুষ সুখি নয়।

অথচ ওর যে সবটাই আলগা তাও তো নয়। আমাদের মতন বাঁধা নৌকোয় বসে থাকল না সংসারের তাতে কি ওর জাত গেল!

সুখি ফিরে এল। হাতমুখের ময়লা ধুয়ে জামাকাপড় পালটে নিয়েছে। পরনে সাদা লুঙ্গি, গায়ে সাদা ফতুয়া। লুঙ্গি, ফতুয়া— সবই খদ্দরের। ওর চোখের চশমাটাও সাদাটে ফ্রেমের, বাহারি নয়, সাধারণ।

"আমি তোমায় কবে নিয়ে যাব, বলো?" সুখি বলল, মুখ মুছতে মুছতে।

"ক-বে! আমি কি যাব বলেছি?" ঠাট্টা করে বললাম আমি।

"তোমার বলাবলি বাদ দাও। আমি অনেকবার বলেছি...!"

"তুমি কি আমায় নিয়ে যেতে এসেছ?"

"অনেক বাহানা করেছ! আর নয়..."

"এখন পুজো। আর মাত্র ক'দিন। ছেলে নাতিনাতনি বউমাদের ফেলে এ সময় যাওয়া যায়?"

"শোনো, আমি সব বুঝি। তোমাকে পুজোর আগে নিয়ে যাচ্ছি না। লক্ষ্মী পূর্ণিমার পরে নিয়ে যাব। আমি আসব, নিজেই তোমায় নিয়ে যাব। বউমাদেরও বলে রেখেছি। ওরাও বলল, বাবা তো কোথাও যান না, কবে সেই একবার আমরা সবাই মিলে মধুপুর গিয়েছিলাম, আপনি বাবাকে নিয়ে যান। ক'দিন জায়গা বদল হবে। বাবারও দিনগুলো একঘেয়ে হয়ে উঠেছে। ভাল লাগবে বাবার।"

আমি শুনছিলাম কথাগুলো। চুপচাপ।

সুখি বলল, "তুমি তা হলে যাচ্ছ! ফাইনাল।"

"ফাইনাল যাওয়া?" আমি আলগাভাবে হাসলাম।

"কী বলছ! তোমার ঠাট্টায় মজা পেলাম না।"

"আমার বয়েস হয়েছে, সুখি।"

"আমারও হয়েছে।...অছিলা বাদ দাও। তোমায় নিয়ে যাওয়া, আরামে রাখা, দেখাশোনার দায়িত্ব আমার। তুমি ভালই আছ, ভালই থাকবে। আট-দশ দিন বাইরে ঘুরে এলে ভালই লাগবে তোমার। কলকাতার হাওয়ার চেয়ে ওদিককার আলো বাতাস জল তোমার খারাপ করবে না।" সুখি হাসল।

আমি সামান্য অপেক্ষা করে বললাম, "পুজোটা কাটুক।"

"তুমি যাচ্ছ?"

"যাব।"

সুখি ডান হাত বাড়িয়ে হেসে উঠল। "হাত মেলাও! বাব্বা, তোমায় বার করা কি সহজ! জয় রাধামাধব।"

আমি হেসে ফেলে বললাম, "তোর আবার রাধামাধব হল কবে!"

"হল!" সুখি হাসছিল।

রাত্রে খাওয়াদাওয়া সেরে আমরা যে যার বিছানায় শুয়ে আছি। নীচের তলা থেকে এখনও মাঝে মাঝে কথাবার্তার টুকরো ভেসে আসছে। ঘরের একটা জানলা খোলা। পাখা চলছে, জোরে নয়। শুক্লপক্ষ হলেও এখন বাইরে অন্ধকার। চাঁদ মাথা তুলেই সন্ধে সন্ধে বিদায় নিয়েছে। আজ বোধ হয় তৃতীয়া।

সামনেই ষষ্ঠী।

হঠাৎ ঠাকুমার কথা মনে পড়ে গেল।

ষষ্ঠীর দিন বুড়ি আমাদের কপালে তেল-হলুদের ফোঁটা দিয়ে দিত। সরষের তেলের গন্ধ লাগত নাকে, কপালে গড়িয়ে পড়ত। সুযোগ পেলেই কপাল থেকে ওই হলদে ফোঁটাটা মুছে ফেলতাম।

"সুখি?"

"বলো?"

"আমায় একটা রোগে ধরেছে," অন্যমনস্কভাবে বললাম, নিচু গলায়।

"রোগ!"

"দশজনে বোধ হয় তাই বলবে।"

"শুনি?"

"আজকাল—বেশ কিছুদিন ধরেই দেখছি, একলা একলা যখন শুয়ে বসে থাকি, পুরনো কথাগুলো বার বার মনে পড়ে। আগেও যে না পড়ত তা নয়, তবে যত দিন যাচ্ছে ততই কেমন যেন অতীতের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছি। ভাবনাগুলো পিছু টানে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।... মাঝে মাঝে স্বপ্নও দেখি, ভাঙাচোরা, এলোমেলো, মিল থাকে, আবার থাকেও না।"

'এটা আবার রোগ হল নাকি? কোন ডাক্তারে বলেছে?" ঠাট্টার গলায় হালকাভাবে বলল সুখি।

"তুমি ঠিক বুঝতে পারলে না।...আমি তোমায় বোঝাতেও পারব না। কিন্তু সত্যি সত্যি বলছি, আমি তো এখনও বেঁচে আছি; এই বাড়ি, এই সংসার, ছেলে বউমারা, নাতিনাতনি আছে সবই। শুধু বিজলী নেই। খুব বড় অভাব। তবু আমি খারাপ তো নেই। তা হলে কেন সেই পুরনো দিনগুলো আমার শোয়াবসার সঙ্গী হয়ে থাকবে? কেন?"

সুখি ভবঘুরে, আগলা পাগলা, চঞ্চল প্রকৃতির মানুষ হলেও ওর মাথা মোটা নয়। বুদ্ধি, ভাবনাচিন্তা, অনুভূতি—সবই আছে। কথাও বলতে পারে বেশ, রগড় করতে পারে, আবার খোঁচাও মারতে জানে।

সুখি বলল, "দাদা, বুড়ো হলে অমন হয় মানুষের। তুমি তো জানই, আমাদের একটা লেজ থাকে। সেটা চোখে দেখা যায় না, ডারউইন সাহেবের কেতাবি লেজ নয়। এ হল হনুমানের লেজের চেয়ে অনেক অনেক বড়। ওই লেজটা আমরা যদি নাড়াচাড়া না করি, না খেলাই মাঝে মাঝে—অঙ্গটা পঙ্গু হয়ে যাবে।" সুখি হেসে হেসে তামাশা করে বলল।

"তামাশা করছ?"

"আরে না, তামাশা কেন?" বলে সামান্য চুপ করে থাকল সুখি। তারপর বলল, "দেখো, আমাদের জীবনটা তো রোজকার খবরের কাগজ নয়। আজ সকালে টাটকা যা পাচ্ছি, বিকেলে সেটা বাসী, সন্ধের পর ছেঁড়া কাগজের বান্ডিল।... কী যেন বলে, প্রতিদিন আমরা বাঁচি, মানে মরে না-যাওয়া পর্যন্ত, তা বলে সূর্য উঠল আর ডুবল, দিনের হিসেব চুকল, কিংবা রাত এল আবার ফুরিয়ে গেল, এভাবে হয় না। দিন আসে যায় এ হল পাঁজির হিসেব, সময়ের হিসেব, তবে এই দিনকার সময়ের হিসেব ছাড়াও একটা বড় হিসেব আছে সময়ের। সেটা মুহূর্তের নয়, নিত্যদিনের নয়, আমাদের মনের তলায় ওই সময় বয়ে যায় কিন্তু হারিয়ে যায় না।"

আমি মন দিয়ে শুনছিলাম। বোঝার চেষ্টা করছিলাম কথাগুলো। অনুভূতি ঘন হচ্ছিল।

সুখি আবার হালকাভাবে বলল, "একটা লেকচার ঝেড়ে দিলুম তো!... পেটে নেই বিদ্যে, কথা বলে সিদ্ধে। মানে জান তো? এসব গেঁয়ো কথা। মুখ্যুসুখ্যুর কথা। বিদ্যে না থাকলেও সিদ্ধপুরুষরা অনেক জ্ঞানের কথা বলে।" হেসে উঠল সুখি।

"তুই সিদ্ধপুরুষ?" আমিও ঠাট্টা করে বললাম।

"না। হাঁড়ির মুখ খুলে, ভাত টিপলেই বুঝবে, আমি অর্ধসিদ্ধ। আরও সময় লাগবে, রাজাদা।"

হালকা হাসি তামাশার পর আমরা দুজনেই চুপ।

নীচের তলায় আর শব্দ হচ্ছে না। ওদের খাওয়াদাওয়ার পর্ব চুকে গিয়েছে ; গোছগাছও শেষ। বড় ছেলে সতীশই সবার শেষে খেতে বসে। তারপর বউমারা। ছোট ছেলে শিরীষ সারাদিনের ক্লান্তি আর খিদে নিয়ে বাড়ি ফিরে বেশি রাত করতে পারে না। ও আর আমার নাতিনাতনিরা একসঙ্গে বসে পড়ে। খেতে বসে গল্প, তর্কাতর্কি, হাসাহাসি, চিৎকার না হয় কী! শিরীষ সকাল থেকে পেশাদারি গাম্ভীর্য নিয়ে থাকলে, রাত্রে খেতে বসে ভাইপো ভাইঝি ছেলে, এমনকী বউ-বউদিকেও হাসিয়ে বেদম করে দেয়। কোথায় কোন কাগজে হাসির কী পড়েছে, কিংবা কোনও ডাক্তার বন্ধু বা পরিচিত রোগীর মুখে কোন মজার কথা শুনেছে—সেগুলো রসিয়ে রসিয়ে বলে, আর হাসাহাসির অট্টরোল ওঠে খাবার টেবিলে।

এইসব গল্পের কোনও কোনওটা আবার আমার কানে আসে নাতনি মারফত। যেমন সেদিন রমু বলল, 'জান দাদা, কাকুমণি দারুণ একটা দিয়েছে এবার।

'নাকি, কেমন দারুণ?'

'একটা বোলচালমারা হাইফ্যামিলির ছেলে। চাকরি করে বড়, স্মার্ট ভীষণ, কথায়বার্তায় এক্সপ্লোসিভ টাইপ। সেই ছেলেটার সঙ্গে একটি মেয়ের বিয়ের কথা হচ্ছে। ছেলে বলল, মেয়েটির সঙ্গে সে নিজে কথা বলবে।'

'আজকাল তো তাই বলে শুনেছি', নাতনিকে বললাম।

'আঃ, শোনোই না!... তা রেনবো হোটেলের টি-শপে বসে চা-টা খেতে খেতে ছেলে খুব স্মার্টলি মেয়েটিকে বলল, দেখুন আমি বরাবরই কুকুর ভালবাসি। আমার তিনটে কুকুর আছে এট্প্রেজেন্ট : একটা অ্যালসেশিয়ান, একটা টেরিয়ার, আর একটা

স্প্যানিয়াল। তার মধ্যে অ্যালসেশিয়ানটা প্রায়ই আমার বেড শেয়ার করে। প্রবলেম হচ্ছে, আপনি কি ওর সঙ্গে শেয়ার করতে পারবেন? আই মিন শুতে পারবেন?'

'সে কী রে?'

'বাজে বোকো না। শোনো। মেয়েটি কী জবাব দিল জান?'

'বল।'

'বলল, অসুবিধে হবে না, অ্যালসেশিয়ান পাশে নিয়ে শুতে পারব। কিন্তু আপনাকে নিয়ে নয়।' রমু একেবারে হেসে গড়িয়ে পড়ল। 'কেমন জবাব, দাদা! টেরিফিক।'

আমি হো হো করে হেসে উঠলাম। সত্যিই মুখের মতন জবাব। দারুণ মেয়ে। ছোকরাকে একেবারে বোবা বানিয়ে দিল।

রমুর এসব গল্প শুনে আমি মজা পাই, হাসি। বুঝতে পারি সময়টা এখন কত দূর এগিয়ে গিয়েছে। অন্তত সমাজের একটা অংশ কোন স্তরে উঠে তিনটে কুকুর পুষতে পারে, কথাও বলতে পারে অনায়াসে কোনও মেয়ের সঙ্গে।

হয়ত এটা গল্প। শিরীষের হাসি-তামাশা। কাগজে পড়া চুটকি। তবু শুধু জল দিয়ে তো দুধ বেচা যায় না।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রমুর কথা শুনে, দুজনের হাসাহাসির মধ্যে হঠাৎ আমার যমুনার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। যমুনা আমার বাল্যসঙ্গিনী, বালিকা প্রণয়িনীও বলা যায়। যমুনাকে আমরা মনা বলে ডাকতাম। কিংবা বলতাম ঢেঁড়স। সত্যিই কচি ঢেঁড়সের মতন দেখতে। রোগা, লিকলিকে, লালচে-সাদা রং গায়ের। হাত পায়ে পাতলা লোম যেন কচি ঢেঁড়সের গায়ে জড়ানো আঁশ। মুখ সরু, নাক লম্বা, মাথার চুল টেনেটুনে ঘাড় পর্যন্ত। ছিটের ফ্রক, কানে পাতলা পাতলা দুটো সোনার আংটা। অসম্ভব ভিতু। গলার স্বর যত চিকন তত প্রবল। মনা কীসে না ভয় পেত? টিকটিকি, ব্যাং, আরশোলা, মায় ফড়িং দেখলেও তার মুখ শুকিয়ে যেত। আমি তাকে ভয় দেখানোর জন্যে মাটির খেলনা টিকটিকি, আরশোলা, ব্যাং সাজিয়ে রেখে দিতাম লুকিয়ে। মনার চোখে পড়লেই চিল চিৎকার আর দৌড়।

একবার তাকে ভয় দেখাবার জন্যে মায়ের পুরনো শাড়ির পাড় ছিঁড়ে পাকিয়ে পাকিয়ে সাপের মতন তৈরি করলাম খানিকটা, লম্বায় হাত দুই হবে। পাড়গুলোও বিচিত্র, ফিকে রং গাঢ় রং, কলকার লতাপাতা। ওই অপূর্ব শাড়ির পাড় ছেঁড়া সাপ গলায় জড়িয়ে একদিন আধ-সন্ধেবেলায় ভেতর উঠোনে শুয়ে থাকলাম। একেবারে সত্যবান।

মনা উঠোনে আসতেই চোখে পড়ল, আমি পড়ে আছি একপাশে, গলায় সাপ জড়ানো। রজ্জুভ্রমে সর্প আর কি! বা সর্পভ্রমে রজ্জু। সঙ্গে সঙ্গে তার চিৎকার আর দৌড়।

মা কাকিরা ছুটে এল। মনার মাকে কাকিমা বলতাম।

উঠে বসলাম আমি।

'কী হয়েছিল রে? তুই গলায় ওটা কী বেঁধেছিস?'

'শাড়ির পাড়।'

‘কেন?’
‘এমনি। মজা করে।’
‘মজা! গলায় দড়ি বেঁধে মজা।’
‘যাত্রা সিনেমায় মহাদেবরা গলায় ন্যাকড়ার সাপ বাঁধে...।’
অতঃপর মায়ের হাতে প্রহার। মনার বোধ হয় আনন্দ দুঃখ—দুইই হয়েছিল।
কোথায় গেল সেই মনা! কিশোরী হতে না হতেই তারা বদলি হয়ে গেল দেড়শো-দুশো মাইল তফাতে। তার বিয়ের চিঠি এসেছিল বছর কয়েক পরে। তারপর সে কোথায় গেল, কী হল জানি না। বেঁচে আছে কি না কে বলবে! বেঁচে থাকলেও আজ বুড়ি। বাত, চোখের ছানি, বাঁধানো দাঁত পরে বেঁচে আছে! জানি না।
তবু একটা মজার কথা মনে আছে।
যমুনা একদিন আমার ঘরে এসে, দুপুরে, ছুটির দিনে—আমার মাথার পাশে তখন ব্যাকরণ কৌমুদি খোলা, ঘুমে অচেতন, দেশলাইয়ের বাক্স থেকে গোটাকয়েক কাঠপিঁপড়ে গেঞ্জির ওপর ছড়িয়ে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল।
কাঠপিঁপড়ে জৈনধর্মের কিছুই জানে না। ফলে আমায় সে যতটা পেরেছে কামড়েছে। জ্বলে মরেছি।
বিকেলে যমুনাকে বললাম, ‘তোকে খুন করব। শয়তানি আমার সঙ্গে?’
যমুনা বলল, ‘তুই না সত্যবান? না, যাত্রার শিব?’
‘আমি তোকে অভিশাপ দেব।’
‘দে। তোর অভিশাপে কাঁচকলা হবে।’
‘দেখিস কী হয়! তোর বিয়ে হবে না। কেউ তোকে বিয়ে করবে না। পাজি বদমাশ স্টুপিড মেয়েদের কেউ বিয়ে করে না।’
‘না করলে যম আছে।’
‘যমই তোকে বিয়ে করবে।’
অসতর্কভাবে কথাটা মুখে এসে গিয়েছিল। তখন বুঝিনি। পরে দুঃখ হয়েছে, কেন অমন কথা বললাম।
আজ অবশ্য যমুনার কী হয়েছে কিছুই জানি না। সে যদি বেঁচে থাকে শান্তিতে থাকে যেন!

কেমন একটা শব্দ হল। হুঁশ হতেই বুঝলাম, সুখি ঘুমের মধ্যে জোরে জোরে কেশে উঠল।

ছয়

অষ্টমীর দিন সন্ধেবেলায় পাড়ার পুজো প্যান্ডেলে বসেছিলাম খানিকক্ষণ। আধঘন্টার মতন। গতকাল আসিনি। আগামিকালও আসব না। বিজয়ার পরের দিন যদি একবার আসি সম্মিলনীতে। পাড়ার পাঁচজনের সঙ্গে ওখানেই দেখাশোনা কোলাকুলির পর্ব চুকে যায়। বাড়িতে যারা যায় তারা বেশি ঘনিষ্ঠ, কোনও না কোনও

সূত্রে আত্মীয়জন, বউমা আর ছেলেমেয়ে নাতিনাতনিরা ওদের আপ্যায়ন করে, আমি তেতালায় নিজের ঘরে বসে থাকি নিত্যদিনের মতন। ঘরে বসেই দেখি ছাদে চাঁদের আলো কত না উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সামনেই যে পূর্ণিমা।
ষষ্ঠীর দিনও একবার এসেছিলাম ভূপতির জন্যে। তার ‘বঙ্গশ্রী’। সদ্য সদ্য কোমর বেঁধেছে বলে সুবিধে করতে পারেনি। পরে হয়তো জমিয়ে নিতে পারবে। তবে সেদিন ‘ফিতে কাটা’ আর পুজোর চল্লিশ বছর পূর্ণ হওয়ার জলুস ভালই হচ্ছিল দেখলাম। এম-এল-এ মশাই এসেছিলেন, সঙ্গে চেলাচামুণ্ড, তিনি অবশ্য ফিতে কাটলেন না, তাঁদের পক্ষে এসব কর্ম করতে বাধা আছে, পুতুলে—হোক না প্রতিমা— বিশ্বাস করতে নেই। লোকচক্ষের বাইরে শনিপুজো কর যায় আসে না, সর্বজনের হট্টমাঝে ধর্মটর্ম নয়। রিটায়ার্ড জজসাহেব ফিতে কাটলেন, প্রদীপ জ্বালালেন প্রবীণা এক মহিলা, ভাষণটাষণও হল।
টিমটিমে একটা পুজো আজ চল্লিশ বছরে আলোয় হট্টরোলে এক মহোৎসব। ভাল। গমগমে গানের মাঝখানে বাড়ি ফিরে এলাম।
আজ অষ্টমীর দিন একবার গেলাম। শত হোক পাড়ার মানুষ।
জনাকয়েক প্রবীণ ও বৃদ্ধের জন্যে একপাশে কিছু চেয়ার পাতা। মানে বৃদ্ধের দল নিজেরাই একটা জায়গা করে নিয়েছেন নিজেদের জন্যে।
দীনবন্ধু, ডাক্তার ব্যানার্জি, গোবিন্দ সেন, তপোব্রত পালিত আরও কেউ কেউ বসে। ডাক্তার ব্যানার্জি রসিক মানুষ। সরকারি ডাক্তার ছিলেন। এখন অবসর। উনি এই জায়গাটা, বলেন এনক্লোজার, এর নাম দিয়েছেন, ‘বৃদ্ধ ভজনালয়’। বলেন, আমরা নিমতলা পার্টি মশাই, হরি দিন তো গেল গাইতে গাইতে চলে যাব। হু কেয়ারস্।
ওই চক্রে আমি আর সান্যালমশাই বয়ঃজ্যেষ্ঠ। মানে আশি ধরছি। অন্যরা কেউ সত্তর পার করে দিয়েছে, কেউ বা ষাট ছাড়িয়ে দু-চার বছর এগিয়ে এসেছে। ব্লাডসুগার, প্রেশার, চোখের ছানি, হজমের গোলমাল ইত্যাদির চর্চা তো হতেই পারে।
কিন্তু আজ গোবিন্দ এসে বললেন, ‘কাগজে আজ তিনটে মার্ডার কেস, একটা ভয়ংকর ডাকাতি আর হাওড়ায় অগ্নিকাণ্ড...।’
চিত্ত বলল, ‘কিছু না দাদা, এটা মরূদ্যান।’
দীনবন্ধু বরাবরই বেরসিক, বলল, ‘মা এবার কীসে এসেছেন দেখবে তো! নৌকোয় না?’
‘ঘোড়ায়।’
‘তবে আর কি! ঘোটকে এলে চাঁট খাবে না!’
তামাশাটা বাড়তে লাগল। রাজনীতি, দেশ, বাজারদর, ম্যালেরিয়ার দাপট থেকে এবার এখানকার পুজোয় কত লক্ষ টাকার বাজেট হয়েছে...প্রসঙ্গগুলো টপকাতে টপকাতে সেই সেদিন আর এদিনের তুলনায় এসে পড়ল।
হঠাৎ সান্যালমশাই আমায় বললেন, ‘রাজমোহনবাবু, আপনি তো ঠিক বাঙালি নন।’

'মানে?'
'আমাদের বাংলাদেশের পল্লিগ্রামের সেকালের দুর্গাপুজোটুজো দেখেননি?'
'বাঙালি নই যখন বললেন, দেখব কেমন করে?'
'চালির চিত্র আঁকা দেখেছেন? আমার আদি বাড়ি যশোরে। ঠাকুরগড়া শেষ হয়ে যেত চতুর্থীর আগেই, তারপর শুরু হত চালিচিত্র। পঞ্চমী ষষ্ঠী পেরিয়ে যেত। সেই ছবির একদিকে হিমালয় মহাদেব নন্দীভৃঙ্গী, অন্যদিকে সমুদ্রমন্থন, তারপরই মহাকালী প্রলয়ংকরী।'
'দেখা হয়নি অত, তবে চালচিত্র দেখেছি।'
'ও কিছু নয়। সেইসব পটুয়া চালি-আঁকিয়ে কোথায় পাবেন! এখন কুমোরটুলির অর্ডারি মাল।'
'হ্যাঁ, তা ঠিকই।'
'আচ্ছা বলুন তো', সান্যালমশাই হাসলেন। 'নোলক নাড়া ঘড়ি কাকে বলে?'
'নোলক নাড়া ঘড়ি!' আমি হেসে ফেললাম।
'পারলেন না তো! নোলক নাড়া টাইমপিস ঘড়ি। মানে পেন্ডুলাম...। পুজোর সময় গ্রামগঞ্জের বাজারে আমরা কিনেছি।'
আমি হেসে ফেললাম।
তবে আর বসলাম না সেখানে। না জানি আবার কী জানতে চেয়ে সান্যালমশাই আমায় অপ্রস্তুতে ফেলবেন।
তা ছাড়া পুজো প্যান্ডেলে এবার জলসার আসর আসবে। গাইয়ে বাজিয়েরা এসে পড়বেন সামান্য পরে।
'আসি। আবার পরে দেখা হবে।'

বাড়ির ফটক খুলে পা বাড়াতেই মাথার ওপর ছোঁয়া লাগল শিউলি ঝোপের ডালের। ঝুলে রয়েছে। বাতাস গন্ধে ভরা।
প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ল একটি মেয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। বেখেয়ালে। তার মুখ দেখতে পেলাম না। অত্যন্ত আবছা। আঁচলেরই হবে হয়তো, খানিকটা কাপড় মুখে গোঁজা। দ্রুত চলে গেল।
কে?
বাড়ি নিস্তব্ধ। সব ঘরে বাতিও জ্বলছে না। এ সময় বাড়িতে কারও থাকার কথাও নয়, পুজো প্যান্ডেলে চলে গিয়েছে। তবে বাড়ি একেবারে ফাঁকা রাখা যায় না। কাজের লোক বলতে নিবারণ আর রাধারানি। তাদের কেউ না কেউ আছে।
হঠাৎ চোখে পড়ল নীচে সতীশের অফিসঘর খোলা। তার চেম্বার।
সতীশ এখনও এই অষ্টমীর দিন সন্ধে উতরে যাবার পরও কী করছে? আশ্চর্য!
বারান্দায় উঠে সতীশের ঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখি সতীশ উঠে পড়েছে। সাড়া পেয়ে সে তাকাল। "বাবা?"
"তুমি এখনও কাজ..."
"প্যান্ডেলে যাব বলেই বেরোচ্ছিলাম," ইশারায় কাপড়চোপড় দেখাল। পরনে

নতুন তাঁতের ধুতি গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি।
"বাড়িতে কেউ নেই?" আমি বললাম।
"নিবারণদের থাকার কথা।"
"বউমারা চলে গেছে?"
"অনেকক্ষণ।"
সামান্য ইতঃস্তত করে বললাম, "আমি বাড়ি ঢুকছি, একটি মেয়ে দেখলাম চলে গেল। চিনতে পারলাম না। ও যেন ফোঁপাচ্ছিল—!"
সতীশ কেমন বিরক্ত হয়েই বলল, "বলবেন না, ওঁর জন্যেই আমার সন্ধেটা মাটি হয়ে গেল।"
"কী হল হঠাৎ।"
"আর বলবেন না। আমি ওঁকে চিনিই না। বললেন, পাশের পল্লিতে থাকেন—গ্রিন পার্ক। মহিলা ডিভোর্সি। তিন বছর হল স্বামীর সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই। একটি ছেলে আছে। বছর ছয় বয়েস। ডিভোর্সের মামলায় যখন জাজমেন্ট হয় তখন কোর্ট ছেলেকে মায়ের জিম্মায় দিয়েছিল, মাইনর চাইল্ড। তবে স্বামীর পক্ষের জোরাজুরিতে জজসাহেব একটা শর্ত দিয়েছিলেন। ছেলের বাবা মাঝে মাঝে ছেলেকে নিজের কাছে নিয়ে যেতে পারে, কিছুদিনের জন্যে, কিন্তু আবার তাকে মায়ের কাছে ফেরত দিতে হবে।"
"তা হঠাৎ...।"
"হঠাৎ ঠিক নয়, ছেলের বাবা মাঝে মাঝেই লোক পাঠিয়ে ছেলেকে নিয়ে যেত। সময়ে ফেরত পাঠাত না। এই নিয়ে অশান্তিও হচ্ছিল। ... এবার পুজোর আগে ছেলেকে তুলে নিয়ে গিয়েছে, এখনও ফেরত পাঠাচ্ছে না। বলছে, পাঠাবে না। যখন তার খুশি হবে পাঠাবে।"
"আশ্চর্য! ... তা তুমি?"
"মহিলা কার মুখে আমার কথা শুনে এসে হাজির। তাঁর আরজি—আমি যেন ওঁকে সঙ্গে নিয়ে, মানে ওঁর ল' অ্যাডভাইসার হয়ে, ওঁর সঙ্গে লোকাল থানায় গিয়ে একটা স্টেপ নেবার জন্যে ব্যবস্থা করি।"
আমি ছেলেকে দেখছিলাম। সতীশের মুখে তখনও বিরক্তি। দুঃখবেদনার আভাস নেই। সমস্যাটা তাকে বিন্দুমাত্র পীড়িত করছে না যেন।
"তুমি কী বললে?"
"বললুম, আমি ওকালতি করি ঠিকই, তবে ডিভোর্স কেস নিয়ে কোনওদিন নাড়াচাড়া করিনি। ওটা আমার প্রফেসন্যাল এক্সপিরিয়েন্সের মধ্যে পড়ে না। আপনি অন্য কারও কাছে যান। আপনার সঙ্গে আমি থানায় যেতে পারব না। তাতে লাভও হবে না। এমন কারও কাছে যান, সাহায্য নিন—যিনি এ ব্যাপারে পাকা, বোঝেনটোঝেন।"
আমার কিছু বলার ছিল না।
সতীশ দরজার কাছে চলে এল। আলো নিভিয়ে দিল ঘরের।
আমরা বারান্দায়।

"আপনি আছেন তো! নিবারণরা আছে। আমি একবার পুজোমণ্ডপ থেকে ঘুরে আসি। যাওয়াই হয় না। ওই ওদের সুভেনিরিতে কমিটি মেম্বার হয়েই আছি।" সতীশ হাসল হালকাভাবে।

ও চলেই যাচ্ছিল, হঠাৎ কী মনে হল, ছেলেকে বললাম, "আজকাল ডিভোর্স কেস খুব বেড়ে গিয়েছে? না?"

"বেশ বেড়েছে। আমি তো ও ধরনের কেসটেস করি না, তবে যারা করে তাদের মুখে শুনেছি, আপার, মিডল, অর্ডিনারি—সব ক্লাসের লোকই এখন ব্যাপারটা অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে। আগের তুলনায় পার্সেন্টেজ এখন অনেক বেশি।... সময় পালটে গিয়েছে, বাবা। মুখ বুজে মার খেতে কেউ আর চায় না।"

"তাই দেখছি।... তুমি এসো। আমি ওপরে যাই।"

সতীশ চলে গেল।

রাত বেশি হয়নি। অষ্টমীর চাঁদ ডুবে গিয়েছে কি না জানি না। ছাদে এখনও জলে ধোয়া জ্যোৎস্না যেন। আলো আছে তবে উজ্জ্বল নয়। বাতাস ঠান্ডা। হিম পড়ছে বোধ হয়। উৎসবের একটা মৃদু গুঞ্জন ভেসে আসছে দূর থেকে। বউমারা বাড়ি ফিরবে কখন জানি না। বড় বউমা জলসায় বসে থাকার মানুষ নয়। হয়তো সে এখনই এসে পড়বে।

মেয়েটির কথা, সামান্য আগে যাকে দেখলাম, মনে পড়ছিল। ভাবছিলাম। দুঃখ হচ্ছিল। বেচারি। সত্যিই তো পুজোর সময় ছেলেটিকে কাছে না পেলে তার ভাল লাগবে কেন? কষ্ট তো হবেই। ওর স্বামী, মানে আগে যে স্বামী ছিল, কেমন মানুষ, এত নির্দয় হবে কেন? কী দরকার এমন নিষ্ঠুর হবার! ছেলের অধিকার যখন তার তখন পুজোর পাঁচ-সাতটা দিন ছেলেকে তার মায়ের কাছে থাকতে দিলে কী ক্ষতি হত? এ তো এক ধরনের পীড়ন, অত্যাচার, জেদ।

সতীশকে আমি দোষ দিতে পারি না। মেয়েটির সঙ্গে থানায় গিয়ে সে কী করতে পারত! কিছুই নয়। আর থানার বাবুরাই বা কী করবে!

আমরা কেউই ভেতরের ঘটনা জানি না। জানার কথাও নয়। এক স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ভেঙে গিয়েছিল মাত্র এইটুকুই জানতে পারলাম।

কিন্তু, সতীশ যা বলল, তা কি পুরোপুরি ঠিক! সংসারে স্বামী-স্ত্রীর বাঁধন আলগা হয়ে যাচ্ছে আজকাল! ছাড়াছাড়ি, সম্পর্ক ভেঙে ফেলার মানসিক প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছে।

যেতে পারে। অস্বাভাবিক নয়। মেয়েরা এখন এগিয়ে এসেছে অনেকটা। সামাজিক ভয়ভীতি কেটে গিয়েছে যথেষ্ট। মনের বাঁধনগুলোও ছিঁড়ে ফেলতে অসুবিধে হচ্ছে না তেমন।

আমার জেঠাইমার কথাই ধরা যাক। জেঠামশাই চার-পাঁচ বছর স্ত্রীর সঙ্গে ঘর করার পর, হঠাৎ তাকে ত্যাগ করল। অন্য একটা বিয়ে করে দিব্যি দূরে চলে গেল। জেঠাইমার দোষ হয়েছিল কোথায়! হয়নি। সন্তানাদি হয়নি জেঠাইমার—এ কি তার দোষ? না হতেই পারে। আর যদি এমনই হয় জেঠাইমার দেহগত শারীরিক কোনও

খুঁত ছিল—, থাকতেও পারে, তা বলে তুমি স্ত্রী ত্যাগ করবে! এমন অধিকার তোমার একলার থাকবে কেন?

দোষ তখনও ছিল। সুশীতল, আমার বন্ধু ও সহকর্মী, বছর পাঁচেক হল চলে গিয়েছে, তার স্ত্রী প্রতিমা বলত, আমরা হলাম বলির পাঁঠা, আপনারা খাইয়ে পরিয়ে কবে যে উচ্ছুগু করবেন কে জানে! প্রতিমা ছিল সুরসিকা, সব ব্যাপারেই স্বচ্ছন্দ।

ওরা এখন দুর্গাপুরে থাকে। প্রতিমার ছেলে চাকরি করে, বড় চাকরি, মেয়ের বিয়ে হয়েছে দিল্লিতে।

এখন মেয়েদের ঠিক ওইভাবে দেখা যাবে বলে মনে হয় না। তা সে যাই হোক আমার মনে হয়, সতীশ যেভাবে বলল, যতটা বলল—তা বোধ হয় ঠিক নয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা হচ্ছে না এমন পরিবার কি বেশি? আর বনিবনা না হলেই সম্পর্ক চুকিয়ে দিচ্ছে—তাও কি অত বেশি? যদি তাই হত, তবে আমাদের সমাজ আর পরিবারে ডিভোর্সের সংখ্যা কোথায় গিয়ে দাঁড়াত? এই দেশটা এখনও ইংল্যান্ড আমেরিকা, জার্মানি হয়ে যায়নি। পরিবারগতভাবে আমরা এখনও একটা মৌচাকের মতন হয়ে আছি অনেকটা। কতকাল থাকতে পারব, তা জানি না।

সহজ কথাটা এই, স্বভাবগতভাবে আমরা এখনও বন্ধন পছন্দ করি। কাগজপত্রে প্রায়ই বধূহত্যা, নির্যাতন, অগ্নিকাণ্ড—যা চোখে পড়ে, এটা এই বিশাল সমাজের এমন একটা দিক, যা নৃশংসতার পরিচয় দেয়, কিন্তু গোটা সমাজ কি নৃশংস?

"দাদা!"

প্রায় চমকে উঠেছিলাম। মুখ তুলে দেখি, ছটু।

"তুই?"

"জেঠিমণি তোমার খাবার আনছে।"

"ক'টা বাজল রে!"

"সওয়া নয়।"

"পুজো প্যান্ডেলের জলসা ছেড়ে তুই চলে এলি?"

ছটু হাসল। "জলসা নয়, জ্বলজ্বলা!"

"মানে।"

"জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। আলো, ফোকাস, পপ্, ড্রাম, সিটি..." ছটু হাসল।

আমিও হাসলাম, "তোর ভাল লাগল না?"

"না।... বিউটি টেলারিংয়ের পেছনে বসে খগেনরা মদ খাচ্ছে। অন্ধকার মতন জায়গা, একটা কলকে গাছ...।"

"মদ?"

"আরে, তুমি চমকে উঠলে যে! ওরা খায়...!"

"পাড়ার মধ্যে! পুজোর দিনে?"

"বাঃ, মহাষ্টমী বলে কথা। ছেড়ে দাও, বুড়ো মানুষ তুমি, এখনকার ব্যাপার বুঝবে না। এসব নতুন কিছু নয়।"

কথা বাড়ালাম না। বুড়ো হলেও আমার দুটো কান আছে, চোখ আছে, কাগজপত্রের পাতা ওলটানোর অভ্যেস রয়েছে, লোকজনও একেবারে না আসে

আমার কাছে তাও নয়, দেখি শুনি অনেক কথাই—তা বলে পাড়ার মধ্যে পুজোর দিনে এমন বেলাল্লাগিরি করবে ভাবতে কষ্ট হয়।

কথা ঘুরিয়ে বললাম, "গান তা হলে তোর ভাল লাগল না?"

"না।"

"লোকে নাকি এসব খুব পছন্দ করে?"

"করলেই বা আমার কী! আমার ভাল লাগে না।"

পায়ের শব্দ শোনা গেল। বড় বউমা আর নিবারণ এল।

রাত্রে আমি আর নীচে নামি না। ঘরেই আমার একটা টেবিল আছে খাবার। বড় বউমা খাবার গুছিয়ে দিল।

"এত কে খাবে?"

"যেটুকু ইচ্ছে খান। বেশি দিইনি।"

"ওরা সব ফিরবে কখন?"

"দশটার আগে নয়। পাড়াসুদ্ধু লোক। উঠতে চাইলেও হাত ধরে টেনে বসিয়ে দেয়।...আমি যাই বাবা, ক'টা কাজ আছে। ছট্টু রইল।"

"এসো।"

বড় বউমা আর নিবারণ চলে গেল।

ছট্টু হঠাৎ বলল, "তুমি লক্ষ্মীপূর্ণিমার পরের দিন শুনলাম ঘাটশিলা যাচ্ছ?"

"যাবার কথা। কী করব, সুখি একেবারে নাছোড়বান্দা।"

"আমারও যাবার ইচ্ছে ছিল। আমি আর রমু—তোমায় অ্যাকমপনি করতাম।"

"তা চল না।"

"বাড়ির লেডিরা আপত্তি করল।"

"কেন?"

"কে-ন!" ছট্টু বিছানায় বসে পা দোলাতে দোলাতে বলল, "ওরাই জানে। বলল, সুখিদাদার ওখানে এক পাগলি আছে। মানে মেন্টালি অ্যাবনরম্যাল। তার মাথায় কখন কী খেয়াল চাপে ঠিক নেই।... হুট করে এতগুলো লোক গিয়ে হাজির হলে সে কী ভাববে, কী করবে, আমাদের পছন্দ করবে কি করবে না, তারপর একটা কেলেঙ্কারি হয়ে যায় যদি—তবে বিপদ।"

আমি একরকম নিরামিশাষী ; মাংসে ডিম খাই না। মাছ সামান্য খেতেই হয়, ভাল লাগে না তেমন। স্বাদ কই? মনে হয় টাটকাও নয়। রাত্রে মাছও খাই না। বড় বউমা ছানার ডালনা, সদ্য বাজারে-আসা ফুলকপির তরকারি, গাজর মটরশুঁটির একটা তরকারি করেছিল। দু-একটা ভাজাও আছে। বাটিতে দুধ, দুটো মিষ্টি।

আয়োজন বেশি। অষ্টমী বলেই। আজ আবার আমরা নিরামিষই খাই।

মনে পড়ল, আমার ঠাকুমা এই দিনটিতে বাদাম কিসমিস দেওয়া ভাজা মুগের ডাল করত, নয়তো ছোলার ; পাকা কুমড়োর ছক্কা। কী স্বাদ! আমার মাকেও দেখেছি সেটা রপ্ত করে ফেলতে। বিজলী ঠিক পারত না।

খেতে খেতে আমি বললাম, "পাগল কি না আমি জানি না। ওকে তো দেখিনি আগে। তবে সুখি বলেছে, একেবারে স্বাভাবিক নয়।"

"কবে থেকে আছে সুখিদাদার কাছে?"

"দেড়-দু'বছর।"

"কী হয়েছিল মহিলার?"

"ওটা নাই বা শুনলে! ...আমিও সঠিক জানি না।"

"কী নাম তা তো জান।"

"অনিলা।"

ছট্টু সামান্য সময় কথা বলল না। পরে বলল, "ঠিক আছে, ঘুরে এসো। তবে গিয়ে যদি দেখ, কোনও ট্রাবল হচ্ছে না, আমাদের লিখে দিয়ো। আমি আর রমু হাজির হয়ে যাব। কাছেই তো।...কদিন হইচই করে আসব।... আসলে কী জান? তুমি বাড়িতে না থাকলে এই বাড়িটা কেমন ফাঁকা লাগে।"

"কিন্তু আমি তো বরাবর থাকব না ছট্টু।"

ছট্টু কিছু না বলে উঠে গেল।

সাত

সুখির বাড়িতে এসে মনে হল, কে যেন চারপাশের দরজা জানলা হাট করে খুলে দিয়ে অমলিন এক আকাশের তলায় বসিয়ে দিয়েছে আমাকে। এত বড় আকাশ—যার পুব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ চোখে দেখা যায় কিন্তু বোঝা যায় না, কত দূরে তার প্রান্তগুলি মাটির সঙ্গে মিশে যেতে পারে। উথলে ওঠা কার্তিকের রোদে সকাল কী মনোরম। গাছের পাতায় হিম, শিশিরবিন্দু জমে আছে। ঘাস ভিজে। ঝাউতলায় এক ঝাঁক পাখি নেমেছিল, উড়ে গেল ঘূর্ণি তুলে। শীতের আমেজ লাগছে বাতাসে। খানিকটা তফাতে মস্ত এক বটগাছ, হেমন্তে পাতার বুঝি রং বদল হচ্ছে গাছের মাথায়। আচমকা গাছের মাথা দুলিয়ে কতকগুলো বক উড়ে গেল শূন্যে। রোদের উজ্জ্বলতার সঙ্গে রং মিশে যাচ্ছে, ঈষৎ লাল, কমলা-গেরুয়া।

বাড়িটা ভালই করেছে সুখি।

কাছেই সুবর্ণরেখা নদী। বাড়ির বারান্দায় বসেও দেখা যায়। জায়গা হিসেবে পছন্দ ভালই করেছিল সুখি। নির্জন তো অবশ্যই। কাছাকাছি প্রতিবেশী বলতে দুটি পরিবার। অত্যন্ত সাধারণ। পাকা বাড়িও নয় তাদের। আছে অনেকদিন ধরেই।

সুখির বাড়ি ছোট। দুটি ঘর, বাড়তি সরু ঘর ধরলে আড়াই। রান্না ভাঁড়ার ছোট মাপের। সামনে পিছনে বারান্দা। কাঠের জাফরি দিয়ে ঘেরা। বাড়ির ছাঁদটা প্রায় আধাআধি গোল। সামনে বাগান। ফুলের। পিছনে হাত কয়েকের সবজি বাগান।

ছোট হলেও সুখি যতটা পারে পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর করে রেখেছে। সিমেন্টের মেঝেতেও ময়লা নেই, দাগ নেই দেওয়ালে। আসবাবপত্র অল্প, কিন্তু মজবুত।

সুখি বলল, "কী! কষ্ট হবে না তো?"

"তুই আমায় খোঁচা মারছিস!"

"না। আমার মনে হয়, তোমার বয়েস হয়েছে, যদি অসুবিধে বোধ কর—!"

"আমার বেশ ভাল লাগছে। খুবই ভাল। সত্যি বলতে কী, আমি ভাবতেই পারিনি

তুই এমন একটা বাড়ি করবি।"
"যখন বলতাম বিশ্বাস করতে না?"
"না।" আমি মাথা নাড়লাম। "তোমায় বিশ্বাস করা যায় না।" হাসলাম। 'তুই' থেকে আবার 'তুমি'।
"আমার কপালটাই ওইরকম। দুর্নাম কুড়িয়েই জীবনটা কাটল।" হাসল সুখি।
আমিও হাসলাম।
"তোমার এই বাড়ি তো প্রায় নদীর গায়ে।"
"ইচ্ছে করেই জায়গাটা বাছা। তা ছাড়া হিসেবের কড়ি বুঝে..."
"বুঝলাম।"
"তোমার কোনও অসুবিধে হবে না। একটা সাইকেল রিকশাও ঠিক করে রেখেছি তোমার জন্যে। তাকে খবর দিলে তোমায় বাজারে স্টেশনে যেখানে যেতে চাও নিয়ে যাবে। ছেলেটার নাম গোপাল।"
সুখি এবার তার দোকানে বেরুবে।
স্টেশনের কাছে বাজারে তার একটা দোকান রয়েছে। খাদি স্টোর। খদ্দরের জামা, ছিট, ধুতি, পাজামা, চাদর থেকে সমস্ত কিছু বিক্রি হয়। মায় শীতের দিনে জহর কোট, কম্বল, টুপি পর্যন্ত।
দোকানটা প্রায় গোড়া থেকেই সে করছে।
"রাজাদা আমি চলি এখন ; অনিলা আসছে— তোমার যা দরকার হবে তাকে বোলো।"
অনিলাকে কাল দু-একবার দেখেছি। আমাদের গাড়ি সামান্য দেরি করেছিল পৌঁছোতে। হেমন্তের বিকেল ফুরিয়ে অন্ধকার নামছে তখন। স্টেশন থেকে বাড়ি। আলো জ্বালার সময় হয়ে এসেছে।
পরে রাত্রেও একবার দেখলাম। ওকে আগে কখনও দেখিনি। সুখির মুখে শুনেছিমাত্র। আড়ষ্টতা এবং দ্বিধা আমার ছিল। থাকার কারণও রয়েছে। ফলে ওকে ভাল করে লক্ষ করা সম্ভব হয়নি।

সুখি বেরিয়ে যাবার সামান্য পরে অনিলা এল।
আমি বারান্দায় চেয়ারে বসে।
অনিলা এসে আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।
পা সরিয়ে নেবার সময় পাইনি। চেষ্টাও করিনি। হেসে বললাম, "বার বার পা ছুঁতে নেই। কাল তো প্রণাম করেছ।"
অনিলা বলল, "ওতে দোষ নেই। আপনি গুরুজন।"
"বসো।"
কাছেই একটা বেতের মোড়া। অনিলা বসতে পারত ; বসল না। বলল, "আপনি বসুন। আমি বাগান থেকে দুটো ফুল তুলে আনি।"
বারান্দার নীচে বাগান। বড় নয়, ছোটই, চোখের হিসেবে সওয়া কি দেড় কাঠার মতন জায়গা। জালি তারের ফেন্সিংয়ের গায়ে বুনোলতা জড়ানো, লতার ইতিউতি

ছোট্ট ফুল। বাগানে গাছগুলো বেছে বেছে সাজানো। যত্ন নেওয়া হয়। শীতের গোড়ায় মরশুমি-ফুলের জায়গা তৈরি হয়েছে। ফুল নেই, চারা উঠছে সবে। এক পাশে এখনও বেলফুল চোখে পড়ে। টগর বুঝি একজোড়া, লাল রঙ্গন, কাঠের ফটকের কাছে ফোয়ারা তোলার ধরনে একটা করবী গাছ। গোলাপ গাছের জন্যে আলাদা জায়গা। মাটি আলগা। ফুল মাত্র দু তিনটি, কুঁড়ি ধরেছে কোনও কোনও ডালে। আমার মনে হল, একটা কুর্চি ফুলের গাছও আছে।
আকাশের রোদ ঘন হয়ে আসছিল। একেবারে নীল আকাশ। চিল উড়ছিল দু-একটি। আশেপাশের গাছগাছালি থেকে পাখি ডাকল।
অনিলা বাগানেই ছিল। সামনে থেকে পাশে সরে যেতে যেতে কখন পিছন দিকে চলে গিয়েছে খেয়াল করিনি। ওকে আর দেখতে পেলাম না।
আমার শৈশব যেখানে কেটেছে তার স্মৃতি মুছে যায়নি এখনও। এই পরিবেশ একেবারে অচেনা নয় আমার কাছে। তফাত আছে অবশ্যই— তবে খুব বেশি নয়। এমন মাঠঘাট, শুকনো মাটি আমার দেখা। ঢেউ তোলা প্রান্তর আমি দেখেছি। দেখেছি, বিশাল বট নিম অশ্বত্থ, ঘনপল্লবিত দেবদারু। তবে ছেলেবেলায় দেখা সেই পলাশ বন, শিমুল এখনও চোখে পড়েনি। চোখে পড়েনি কয়লাকুঠির সেই খাঁচা, ফায়ার-ব্রিকসে গাঁথা পাওয়ার হাউসের চিমনি। ওটা আলাদা ব্যাপার তবে ছোটনাগপুর হিল রেঞ্জ, সাঁওতাল পরগনার প্রকৃতিতে তফাত তেমন নেই।
ঠাকুমাকে মনে পড়ল, গায়ে পাতলা একটা ঘি রঙের চাদর, কুয়াতলার সামনে দাঁড়িয়ে বিলাসীকে দিয়ে জামাকাপড় কাচিয়ে নিচ্ছে। একটা নেড়ি কুকুর একেবারে ঠাকুমার পায়ের কাছে। বিলাসী হাতের জল ছুড়ে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছে বার বার। ঠাকুমা বলল, ছেড়ে দে, তুই তোর কাজ সার। খেলা করিস না।
আমি কিন্তু খেলাই করছিলাম। মুখের সামনে বই খোলা, অথচ চোখ বা মন কোনওটাই বইয়ে নেই। মনের তলায় চোখের গভীরে ঠাকুমা। ঠাকুমার মাথায় দেখছি কাপড় নেই। বুড়ির সব চুল সাদা। কাল আবার লছু নাপিত এসে বুড়িমায়ের চুল কেটে দিয়েছে। মাস দেড়মাস অন্তর ঠাকুমা চুল কাটে মাথার। তখন বড় রোগা শুকনো দেখায় বুড়িকে।
আমার ভাল লাগে না।

অনিলা আবার এল।
আমি অবাক। এরই মধ্যে কখন সে স্নান সেরেছে। পরনের শাড়ি সাদা, পাড় হালকা নীল। চওড়া পাড় নয়, সরু ধরনের। গায়ের জামা সাদা। সদ্য স্নান করার দরুন মাথার চুল পিঠের ওপর ছড়ানো।
অনিলাকে এই প্রথম আমি ভাল করে দেখলাম।
কাচের প্লেটে কয়েকটি টাটকা ফুল সাজিয়ে এনেছে। আমার পাশে ছোট টুলটির ওপর রাখল। টুলের ওপর এক টুকরো কাপড়।
"বসো।"
অনিলা এবার দু-চার পা এগিয়ে গিয়ে বসল। মোড়ায় নয় ; বারান্দার ধার ঘেঁষে।

সিঁড়িতে তার পা।

মেয়েরা রোগা হলে যে চোখে লাগবে এমন কোনও কথা নেই। কিন্তু অনিলার বেলায় কেমন যেন অস্বস্তি হয়। ও বড় শীর্ণ— প্রায় অস্থিসার, মজ্জাহীন। অমন প্রায়-নিখুঁত শারীরিক গঠনের একটি মেয়ের এই শীর্ণতা যেন তার সমস্ত সৌন্দর্যকে নষ্ট করে দিয়েছে। অনিলার চৌকো মুখ, গড়ানো থুতনি, লম্বাটে গলা— খানিকটা বিসদৃশ লাগতেই পারে। প্রতিমার কাঠামো আর সম্পূর্ণ মূর্তি তো এক নয়। এখানে অবশ্য অতটা বলা যাবে না।

ওর চোখদুটি দীর্ঘ, চোখের পাতা পাতলা, আঁখিপল্লব ঘন, কিন্তু পুরোপুরি কালো নয়, সামান্য সোনালি। চোখের মণি ঈষৎ ধূসর, কিন্তু উজ্জ্বল, চোখের জমি অসম্ভব সাদা।

গায়ের রং ফরসা, বেশি ফরসাই বলা যায়। তবে এই ফরসা যেন রক্তহীনতার ফ্যাকাশে বর্ণ। কোথাও আভা নেই, সজীবতা নেই।

"মাটিতে বসলে কেন?" আমারই অস্বস্তি হচ্ছিল।

অনিলা বলল, "কিছু হবে না। বারান্দা পরিষ্কার। খানিকটা আগে মোছা হয়েছে।"

বারান্দার সামনে দুটি থাম। মাথার ছাদ ধরে রেখেছে। কয়েক ধাপ সিঁড়ি নামলেই বাগান। একটি থামের গায়ে পিঠ হেলিয়ে বসেছে অনিলা। তার মাথায় পিঠে রোদ পড়ছে না ; পায়ের ওপর রোদ লুটিয়ে রয়েছে।

অনিলার মাথার মাঝখানে লম্বা সিঁথি। সাদা। তার কানে ছোট ছোট দু কুচি সোনা, লবঙ্গ ফুল। ডান হাতে একটি পাতলা চুড়ি। অন্য কোনও অলংকার নেই।

কী কথা বলা যায় আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না। চুপচাপ বসে থাকাও অস্বস্তিকর।

আলাপ বা গল্প করার মতন করে বললাম, "অনেককাল আগে, তা ধরো বছর তিরিশ তো হবেই একবার বন্ধুদের সঙ্গে এখানে এসেছিলাম। দু-চার দিনের জন্যে। তখন সবই ফাঁকা। ঘরবাড়ি খুবই কম। বাজারহাট মামুলি। থাকার জায়গা পাওয়া যেত না। এখন তো প্রায় আধা-শহর। অনেক পালটে গিয়েছে।"

অনিলা বলল, "আমি জানি না। আগে দেখিনি।"

"তোমার বোধ হয় বছর দুই হল...।"

"দেড় বছরের বেশি।"

অনিলা কথা বলার সময় তার ঠোঁট খুলে গিয়ে ধবধবে সাদা দাঁত দেখা যায়। সামনের একটা দাঁত বেঁকা ও আধভাঙা। দেখতে ভালই লাগে। গলার স্বর চিকন।

এখানে কুয়ার জল। বাড়িতে একটা মেয়ে কাজ করে। মাঝবয়েসি। আদিবাসী ঠিক নয়, তবে এখানকারই মানুষ। সিংভূমের ছাপ রয়েছে। কথা বলে বাংলায়, ভাষা আর উচ্চারণ একটু কানে লাগতে পারে।

মেয়েটা জল তুলছে কুয়ায়। তাকে দেখা যাচ্ছে না। জল তোলার শব্দ ভেসে আসছে পিছন থেকে।

"সুখি যে সত্যি সত্যি এখানে থেকে যাবে আমি ভাবিনি," গল্প করার ভঙ্গিতে আমি হালকাভাবে বললাম। "ওর মতিগতি বোঝা দায় ছিল। কোথায় কোথায় না আড্ডা গেড়েছে। চার-ছ'মাস, তারপরই উধাও।"

অনিলা কথা বলল না, আমার দিকে তাকিয়ে থাকল।

"ওর শেষ অ্যাড্‌ভেঞ্চার কী, জান?"

"কী?"

"চিনির কল নিয়ে মেতে যাওয়া। আমেদপুরের দিকে কোথায় একটা পুরনো বন্ধ-হওয়া চিনির কল লিজ নিয়েছিল, ছ মাসও চালাতে পারেনি। ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে এল।"

অনিলা এমন করে হাসল যেন মেঘের গা ছুঁয়ে ক্ষণিকের জন্যে রোদের আভা দেখা দিয়ে আবার মিলিয়ে গেল।

অল্প সময় চুপ করে থেকে আমি বললাম, " সাবালক হতে কারও কারও আশি বছরও লেগে যায়, বুঝলে!" হাসলাম, "সুখির অবশ্য অতটা লাগল না। ষাটের পরই চাবি খুলল।"

"আপনি দাদার চেয়ে কত বড়?"

"প্রায় দশ।"

অনিলা সুখিকে 'দাদা' বলে।

"দাদার তবে সত্তর?"

"কাছাকাছি। তবে শরীর স্বাস্থ্য রাখতে পেরেছে। দেখলে কি এতটা মনে হয়? পঁয়ষট্টি বড় জোর। তাই নয়?"

অনিলা রোদ থেকে পা সরিয়ে নিল। তাত বাড়ছে রোদের। সূর্য উজ্জ্বলতর। কাক ডাকছে। হাওয়া এসেছে উত্তরের।

"সুখির দোকান ভাল চলছে শুনলাম। এখানে এসে দেখেশুনে আমি সত্যিই বড় খুশি হয়েছি। সুখি যে কিছু করবে আমি ভাবতে পারতাম না। এমনকী আজকাল ও যত বলত, আমি তার থেকে খানিকটা বাদ দিয়ে দিতাম। এখন দেখছি ও আমায় জব্দ করে দিয়েছে।...কত দেরিতে ও সত্যি সত্যি শুরু করল জীবন...!"

"জীবন! কেন জীবন কেন?"

নিজেকে শুধরে নিলাম। জীবন বলা উচিত হয়নি। জীবন তো গোড়া থেকেই শুরু হয় ; সুখিরও হয়েছে। আসলে কোনও কোনও মানুষের সাদাসিধে পথটা ধরা হয় না এগুবার, আঁকাবাঁকা পথে অনেকটা এগিয়ে পিছিয়ে, পরে একসময় সোজা রাস্তাটা ধরে নেয়। সুখির বেলায় সেইরকমই হয়েছে বলা যেতে পারে।

সাধারণ কথায় সহজ হওয়া যাবে ভেবে বললাম, "ও ফেরে কখন?"

"দুপুরের আগেই। বারোটা-একটা।"

"আবার—?"

"বিকেলে যায়। রাত আটটার মধ্যেই ফিরে আসে।"

নজরে পড়েছিল, আলাদাভাবে খেয়াল করিনি। রোদ বারান্দায় উঠে আসার পর খেয়াল হল অনিলার মাথার ছড়ানো চুলের সিকিভাগই আর কালো নেই ; রুপোলি সাদা হয়ে গিয়েছে। মাথার সামনের দিকে কয়েক গুচ্ছ চুল বরং সাদা, পাকা। কপালে একটি ছোট্ট টিপ, চন্দনের।

অনিলা কি পুজোআর্চা করে? কই খেয়াল করিনি তো! ধূপের গন্ধও কি পেয়েছি!

ঠাকুরঘর আছে নাকি এ বাড়িতে? না, তাও যে নজরে পড়েনি। সুখি কোনওদিনই দেবভক্তি নিয়ে মাথা ঘামায়নি। ওর কাছে ওটা অপ্রয়োজনীয়।

তা হলে?

অনিলার বয়েস হয়েছে। আমার অনুমান ষাটের কাছাকাছি। পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন হতে পারে। সুখিও বলেছিল ওইরকম, সঠিক আমার মনে নেই। তবে এত শীর্ণ রুগ্ণ একটি মহিলার বয়েস অনুমান করা কঠিন।

সুখি আমাকে অনিলার কথা বলেছে আগেই। বিস্তারিতভাবে বলতে যা বোঝায় তা হয়তো নয় ; তবে ক্রমে ক্রমে খাপছাড়াভাবে প্রায় সবই বলেছে— যা সে জানে বা শুনেছে। আমার ধারণা, সুখি যা বলেছে তার বেশি সে জানে না। কিংবা জানলেও সে বলতে চায়নি। কোনও বাধা ছিল।

অনিলা নিজেই বলল, "রবিবার দোকান বন্ধ রাখে দাদা।"

সুখিকে যে 'আপনিও' বলে না অনিলা, 'তুমি' বলে, এটা আমার গতকাল এবং আজ সকালে শোনা হয়ে গিয়েছে। কানে লাগেনি। বরং ভাল লেগেছে এই ভেবে যে দু জনের মধ্যে সম্পর্কটা সহজ, দূরত্ব রাখার বৃথা চেষ্টা নেই।

"দোকান তো ভালই চলে, সুখি বলে—," আমি বললাম।

"চলে। দাদা বেশির ভাগ জিনিস আনায় পাটনা আর এলাহাবাদ থেকে। পাটনার খদ্দর মোটা হলেও দামে সস্তা। এলাহাবাদ দিল্লি থেকে তৈরি পোশাক আনাতে হয়। গরম যা দিল্লি থেকেই আসে...।"

"তুমি দেখছি খোঁজ রাখ অনেক—" আমি হাসলাম।

মাথা নাড়ল অনিলা। "কোথায় আর রাখি। দাদা বললে জানতে পারি।"

"মন্দই বা রাখ কোথায়?"

"এখানের লোক বড় গরিব। বেশি দাম দিয়ে জামাকাপড় কিনবে কেমন করে। পাটনার খাদি ভাল বিক্রি হয়, শীতের সময় দিল্লি। পুজোর সময় বাঙালিরা বেড়াতে আসে ; তারাও এটা সেটা কিনে নিয়ে যায় শখ করে। কলকাতায় তো অভাব নেই দোকানের।"

অনিলা উঠে পড়ল। রোদ তার কোলের ওপরে উঠে এসেছিল।

"আপনার জন্যে একটু দুধ আনি।"

"দুধ! কেন?"

"খাবেন না?"

"চা-জলখাবার খাবার পর আর তো আমি কিছু খাই না। বড় জোর দুটো সিগারেট," আমি হাসলাম। "এখন কি দুধ খাওয়া যায়! পেট ভারী হয়ে যাবে। সহ্য হবে না।"

"টাটকা দুধ, দাদা। গরম!"

"না ভাই। আমি একটু নিয়ম মেনে চলি। বয়েসটা যে অনেক দূর গড়িয়ে গিয়েছে। অনিয়মে কষ্ট হয়।"

অনিলা বলল, "আপনার সেবাযত্ন করা আমার কাজ। কাজে ফাঁকি দিলে দাদা আমার ওপর রেগে যাবে।"

"সুখি তোমার ওপর রাগ করে!" আমি হাসলাম।

"করে। আমিও করি," অনিলা হাসল হালকাভাবে। এই প্রথম তার মুখে হাসি দেখলাম।

"তাই নাকি! তুমিও রাগ করতে পার!"

"পারি। দাদার সঙ্গে আমার রাগারাগি তুচ্ছ ব্যাপার। ভেতরের রাগ আলাদা। তার আগুন যখন জ্বলে তখন আমার জ্ঞান থাকে না।" অনিলার চোখ যেন ছোট হয়ে ধারালো দেখাচ্ছিল।

আট

ব্যবস্থার কোনও ত্রুটি রাখেনি সুখি।

তার ঘর মাঝারি মাপের। নিজের প্রয়োজন বুঝে রেখেছে সবই। ছোট খাট, টেবিল, চেয়ার, আলনা, কাঠের আলমারি। বই রাখার একটা র‍্যাক। র‍্যাকের মাথার ওপরও অগোছালোভাবে কিছু বই আর কাগজ রাখা।

নিজের খাট-বিছানা আমায় ছেড়ে দিয়ে সুখি তার শোওয়ার জন্যে একটা সরু তক্তপোশ ঢুকিয়ে রেখেছিল আগেই। ওর বিছানা পুরু নয়। আরাম কম হতে পারে। তবে তাতে সুখির কিছু যায় আসে না।

পাশের ঘর অনিলার।

মশারি টাঙিয়ে আমরা শুয়ে পড়েছি। রাত দশ-সাড়ে দশ হবে। এখানে এই রাতই গভীর মনে হচ্ছিল। এমন নির্জনে রাত যেন ঘড়ির হিসেব মেনে চলে না।

সুখি বলল, "আজ তোমার পুরো রেস্ট হল। কাল একবার স্টেশনের দিকে চলো।"

"কখন?"

"সকাল বিকেল যখন হয়। সকালেই তোমার সুবিধে হবে। বিকেলে এত তাড়াতাড়ি বেলা মরে যায় আজকাল, পাঁচটা বাজতে না বাজতেই ঝাপসা। তোমার ঘোরাফেরা হবে না। তার ওপর, অদ্ভুত ব্যাপার রাজাদা, আজ বিকেল থেকে কেমন হাওয়া বইছে দেখছ! শীত আসছে—।"

"আমি আজ বিকেলে একবার নদীর দিকে গিয়েছিলাম।"

"একলা?"

"না, অনিলা ছিল।"

"নদীর দিকে একলা যাবে না, যা পাথর, বুড়ো মানুষ, পড়লে আর রক্ষে নেই। সুবর্ণরেখার ধারে বলতে পাথর, মানে শিলা..." সুখি হাসল। "আমি মাঝে মাঝে ভাবি এত পাথর জমল কেমন করে?"

"পাহাড়ি জায়গা।"

সুখি বলল, "এখানের ভিড় এখন হালকা হয়ে গিয়েছে। তুমি রোজ খানিকক্ষণ ঘোরাফেরা করবে। দরকার হলে গোপালকে বলবে ; তোমায় নিয়ে যাবে যেখানে যেতে চাও। আমি তোমায় নিয়ে বেরোব রবিবার।"

শীত পড়ছে যে অনুভব করা যায়। হালকা কম্বলটা গায়ে টেনে নিলাম।
হঠাৎ আমার পুরনো কথা মনে পড়ল।
"সুখি?"
ডাকে সাড়া দিল সুখি।
"তুই তখন খুবই বাচ্চা। ইজের পরাই তখন তোর কাছে ভদ্রলোক হওয়া...।"
"আরে রাম রাম! তর্কালঙ্কার মশাইয়ের সেই লেটার বক্স দেখানোর গপ্প নাকি?"
আমি হাসলাম। "আরে না না ; সে গল্প নয়।...তোর মনে থাকার কথা নয়, তবু নন্দাপিসিকে মনে আছে?" সুখিকে তুই করেই বললাম।
"কে নন্দাপিসি?"
"স্টোরবাবুর দিদি। মনে নেই? সাইডিং লাইনের পাশে কোয়ার্টার। খড়ের চাল। সামনে তালগাছ।"
"না, মনে নেই।"
"নন্দাপিসির সঙ্গে অনিলার একটা মিল আছে!"
"মিল?"
"লোকে নন্দাপিসিকে আড়ালে বলত, কাঠের পুতুল। এত রোগা, কাঠকাঠ চেহারা। তার ওপর বসন্ত রোগে এক চোখ কানা হয়ে গিয়েছিল। বিয়ে-থা হয়নি।"
"আমার মনে পড়ছে না। ওই গোমস্তাবাড়ির মেয়ে যাকে কুকুরে কামড়েছিল! মারা গেল!"
"না", আমি বললাম, "সে আলাদা।" বুঝতে পারলাম নন্দাপিসিকে মনে নেই সুখির। থাকার কথাও নয়। সুখিরা অনেক আগেই কোলিয়ারি ছেড়ে চলে এসেছিল। আমরা এসেছি পরে। আমার ঠাকুমা মারা যাবারও ক'বছর পর বাবাকে দু-তিন জায়গায় ছুটিয়ে শেষে কলকাতার অফিসে পাঠিয়ে দিল কম্পানি। তারপর, খুবই আশ্চর্যের কথা, সুখিদের সঙ্গে আবার আমাদের দেখাশোনা যোগাযোগ হয়ে গেল।
অনিলার সঙ্গে নন্দাপিসির মিলটা একেবারেই বাহ্য। নগণ্য। নন্দাপিসি দেখতে ভাল ছিল না মোটেই ; কিন্তু তার অন্য পাঁচটা গুণ ছিল। তখনকার দিনের মেয়ে, তাও আবার না শহর না মফস্সল না গ্রাম-গঞ্জ, একেবারে এক প্রান্তের কয়লাকুঠির, যার সঙ্গে সম্পর্ক নেই চলতি সমাজের। তবু নন্দাপিসি লেখাপড়া শিখেছিল নিজের চেষ্টায়। বই পড়ত। হাতের কাজ জানত কতরকম : এমব্রয়ডারি, মাছের আঁশ, উলবোনার কাজ। লোকে বলত, এত গুণ মেয়েটার, ভগবানই শুধু মেরে দিয়েছেন। ভগবান মারুন বা না-মারুন, ভগবানের প্রাণীরাও মারেনি। আমরা অবাক হয়ে দেখতাম, গাছের ডাল কাঁপিয়ে কত পাখপাখালি ঝাঁপিয়ে পড়ত নন্দাপিসির গায়ে মাথায়, পিসি যখন তাদের কাঁচা উঠোনে একটা থালা হাতে নেমে আসত। পাখিদের খাওয়াবে। রাজ্যের কুকুর জমা হয়ে যেত সদরের কাছে।
এই নন্দাপিসি একদিন কাঁচা কয়লার পাঁজা থেকে পোড়া কয়লা বেছে এনে রান্নাঘরে উনুন জ্বালাচ্ছিল। কেরাসিন তেলের বোতল ছিল পাশে। কী করে যে তেলে কয়লায় দেশলাইয়ের কাঠির স্ফুলিঙ্গে একটা ভুলচুক হয়ে গেল— নন্দাপিসির শাড়িতে আগুন ধরে গেল।

রান্নাঘরের বাইরে আসার আগেই পিসি জ্বলছে।
চোখে আমি দেখিনি। দেখা যায় না। ছোটদের কাউকে কাছেই যেতে দেয়নি বড়রা। শুনেছি, বেগুনপোড়ার মতন কালো আর গলা গলা হয়ে গিয়েছিল শরীরটা। হাড় ছাড়া শরীরে মাংস বলতে যার কিছু থাকে না, সে আবার গলা গলা হয় কেমন করে! ছেলেমানুষ হলেও একটা জিনিস আমাদের চোখে পড়ত। ভগবান পিসির দুই বুক ভরে দিয়েছিল মাংসে।
পরে অনেকে বলত, নন্দাপিসি নিজের গায়ে নিজেই আগুন ধরিয়ে ছিল।
জানি না।
অনিলারও ওইরকম একটা ঝোঁক এসেছিল বলে সুখির কাছে শুনেছি।
"তুমি অনিলার সঙ্গে কথাবার্তা বলেছ নাকি? ওর ব্যাপারে—?" সুখি বলল। ঘুমে গলা জড়িয়ে আসছে সামান্য।
"না।"
"বোলো না।...পুরনো কথা ওকে মাঝে মাঝে এমন খেপিয়ে তোলে—!"
"আমার দরকার কী তুলে?... তবে একটা কথা সুখি—!"
"কী?"
"আমার মনে হল, ও শান্তিতে নেই। কেমন অস্থিরভাব মনে। মনটা যদি তেমন হত, বুজিয়ে দিয়ে পাথর চাপা দিলেই ল্যাঠা চুকে যেত—তবে কথা ছিল না। কিন্তু তা সম্ভব নয়।"
"ঠিকই। তবে সাপুড়েদের সাপের ঝাঁপির মতন যখন তখন মনের ডালা খুলে গুটিয়ে থাকা সাপটাকে খোঁচা মেরে মুখ তুলতে দেওয়াও ভাল নয়। জীবনটা খেলা নয়, সাপের ফণা দোলানো খেলা দেখিয়ে আবার সেটা ঝাঁপিতে পুরে রাখবে। ওকে আমি যতটা পারি ঝাঁপির মধ্যে রাখতে চাই।"
"ভালই তো!"
"তোমার মতন আমি অত পুরনো কথা ভাবি না। ভাবতেও চাই না। তা বলে কিছুই যে মনে পড়বে না এমন নয়, রাজাদা। নন্দাপিসির কথা তুললে তুমি। আমি বললাম, মনে নেই। সত্যিই মনে নেই।"
"তখন তোমরা বোধ হয় আর ওখানে ছিলে না। নন্দাপিসি পুড়ে মারা গিয়েছিল। আমাদের ওখানে এমন ঘটনা আর ঘটেনি। তোমরা থাকলে নিশ্চয় মনে থাকত।"
"জানি না। সত্যিই ছিলাম না তবে। কিন্তু পালদের বাড়িতে, বলাইয়ের দিদিমা হরির লুঠ দিতে গিয়ে উঠোনে পড়ে হরি হয়ে গেল আমার মনে আছে।" সুখি যেন আলগাভাবেই বলল।
আমার মনে পড়ল। তবে দৃশ্যটা আমি স্বচক্ষে দেখিনি। শুনেছি। বাবা যতদিন না কোলিয়ারি ছেড়েছে, আমায় আজ বাড়ি কাল শহরের স্কুলের বোর্ডিংয়ে থাকতে হত। ঘটনাটা ঘটেছিল আমার বোর্ডিংয়ে থাকার সময়। বলাইয়ের দিদিমা হরির লুঠ দিচ্ছিল, হঠাৎ উঠোনে পড়ে গেল। মারাও গেল সঙ্গে সঙ্গে।
"তুই তখন...?"
"কত আর ছয়-সাত বছর হবে। কেমন করে যেন মনে আছে। এতবার ওটা

শুনেছি, তার জন্যেও হতে পারে।" বলে সুখি চুপ করে গেল। হাই তুলল। জড়ানো গলায় বলল আবার, "একটা কথা বার বার শুনতে শুনতে এক সময় মনে হয়, আমিও যেন হরি হয়ে যাওয়াটা দেখেছি।" বলার শেষে হাসল।

বলাইয়ের ঠাকুমার কথায় বলাইকে মনে পড়ল। ছেলেবেলার সঙ্গী। তবে অত্যন্ত অসভ্য বদমাশ ছেলে। লুকিয়ে বিড়ি খেত, খারাপ কথা বলত, বাড়ি থেকে পয়সাকড়িও চুরি করত। বলাইয়ের এক মামা—নিজের নয়, কুমুদবাবু আমাদের বি. বি. হাই স্কুলের বাংলার মাস্টারমশাই ছিলেন। তাঁর চেহারা ছিল গোল, গায়ের রং কালো। কুমুদস্যার, ধুতির ওপর শার্ট কোট পরতেন, একটা চাদর থাকত কাঁধে। তিনি দাড়ি রাখতেন। আর ক্লাসে যখন পড়াতেন তখন যেন তাঁর টেবিলের চারপাশে নাচতেন। সবচেয়ে মজা হত স্যার যখন হাত পা ছুড়ে ওই কবিতাটা পড়াতেন—'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়...।' মনে হত স্যার যেন ভাবের ঘোরে যুদ্ধ করছেন। আমরা হাসতেও পারতাম না। হাসলেই সর্বনাশ! তবে আর-একটা কবিতা, 'রেখো মা দাসেরে মনে...' পড়াবার সময় সার চোখের জলে বুক ভাসাতেন।

বড় ভাল মানুষ ছিলেন কুমুদস্যার। দুই মেয়ে এক ছেলে। আমাদের স্কুল হোস্টেল বা বোর্ডিংয়ের রাস্তায় তাঁর বাড়ি ছিল। ছেলেমেয়েদের আমরা চিনতাম। ছেলে তো আমাদের চেয়ে উঁচু ক্লাসে পড়ত। একটি মেয়ে একেবারে তুবড়ি। মানে একটু আগুন লাগলেই ফুলকি ছড়িয়ে দিত। আমরা আড়ালে তাকে কালী তুবড়ি বলতাম। একবার আমাকে সে পচা আতা ছুড়ে মেরেছিল। দোষ আমারই। আমি তাকে দেখে হেসে বলে ফেলেছিলাম, রেখো মা দাসেরে মনে...।'

সুখি ঘুমিয়ে পড়েছে। সাড়া নেই। তার নিশ্বাসের সঙ্গে ঘুমের মৃদু শব্দ জড়ানো। সারাদিনের ক্লান্তির পর এই ঘুম স্বাভাবিক।

অন্য দিন আমি ঘুমোবার ওষুধ খাই। ডাক্তাররা বলে, ওষুধটা ঠিক বা পুরোপুরি ঘুমোবার ওষুধ নয়, ওটা ট্র্যাংকুইলাইজার গোছের। আজও খেয়েছি। কিন্তু এখনও ঘুম আসছে না। হয়তো নতুন জায়গা, অনভ্যস্ত বিছানা, অপরিচিত পরিবেশ বলে।

অনিলা কি ঘুমিয়ে পড়েছে!

কলকাতার কথা মনে পড়ল।

ওরা বার বার বলেছে, সামান্য অসুবিধে হলেই সুখিকে বলে ফিরে যেতে।

না, আমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। মাত্র তো একটা দিন কাটল, এখনই কীসের অসুবিধে।

ঘুমোবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই; যখন আসার আসবে।

শুয়ে থাকতে থাকতে আবার সেই স্কুলের কথা। আমাদের হোস্টেলের ছবিটাই মনে পড়ছিল। ছোট হোস্টেল। বলা হত বোর্ডিং। দশ-পনেরো জন ছেলে মাত্র। দু'জন মাত্র মাস্টারমশাই। পাকা বাড়ি, একতলা। পুবের বড় ঘরটায় আমরা চারটে ছেলে, অন্য ঘরগুলো মাঝারি। তিনটি করে ছেলে। মাস্টারমশাইরা থাকতেন এক পাশে কোণের দিকে ঘরে। যদুনাথবাবুর ঘাড়ে ছিল আমাদের দেখাশোনার দায়িত্ব। মানে তিনিই একরকম সুপারিনটেনডেন্ট। শীতলবাবু বোর্ডিং ম্যানেজার। হাটবাজার

তাঁর হাতে। পাঁড়েজি আমাদের রাঁধুনি, হলধর হল যোগাড়ে।

বোর্ডিংয়ের সামনে লম্বা মাঠ। কৃষ্ণচূড়া আর পলাশ গাছ ছাড়া মাঠে কচি কচি বুনো ফুলের ঝোপ। একটা কুলগাছও ছিল। মাঠের শেষে পুরনো একটা গোশালা। আগে গোশালা থাকলেও পরে ভাঙাচোরা খাপরা-ছাওয়া একটা ছাউনি। সূর্য উঠত ওই দিক থেকে। অস্ত যেত নিমগাছের সারির আড়ালে।

যদুনাথবাবু ইংরিজির মাস্টারমশাই ছিলেন। তাঁর চেহারা একেবারে কাঠ কাঠ। মাথায় লম্বা। গায়ে ছিপছিপে। গোঁফ ছিল। চোখে চশমা। পরতেন ধুতি আর কলার দেওয়া শার্ট; হাতে কফ্ বোতাম। তিনি ছাতা ছাড়া এক পা-ও নড়তেন না। শীতের দিনেও তাঁর হাতে ছাতা থাকত।

ক্লাসে তিনি ইংরিজি পড়াতেন। গালিভারের গল্প, কবিতা : 'ও মেরি গো, অ্যান্ড কল্ দ্য ক্যাটল হোম্...। রানা প্রতাপ—পড়াবার সময় কাঁধ ঝাঁকাতেন বার বার। আর কিছু মনে পড়ে না। উনি আমাদের ক্লাসের বটকৃষ্ণ—যাকে আমরা বটকেষ্ট বলতাম, বিরাট বড়লোক বাড়ির ছেলে—তাকে সবসময় ঠাট্টা করে বলতেন—'কিষ্টোবাবা, তোমার সঙ্গে মা সরস্বতীর বনবে না; বৃথাই আসাযাওয়া।' বটকৃষ্ণ লজ্জায় মুখ নামিয়ে নিত। যদু স্যারকে সে পছন্দ করত না একেবারেই; আড়ালে বলত, 'ছাতা মাস্টার।'

এই বটকৃষ্ণর একবার টাইফয়েড জ্বর হল। তখন টাইফয়েড মানে বাঁচার আশা কম। কোনও ওষুধ নেই। আমরা ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আশ্চর্য, যদু স্যার প্রায় রোজই বটকৃষ্ণর বাড়িতে যেতেন তার খোঁজ নিতে। ...তা কপালজোরে বটকৃষ্ণ বেঁচে গেল। যদু স্যার বললেন, একে বট, তায় কৃষ্ণ! কে তোমায় ছোঁবে বাপ!

এই বটকৃষ্ণই বড় হয়ে দারুণ ছাত্র হয়েছিল। পরে সে বিলেত যায় পড়তে। তাকে আমি মাত্র একবার দেখেছি পরে। এখন সে কোথায় জানি না।

রাত বাড়ছে। শীতও করছে।

ঘুম আসছিল।

তন্দ্রার মধ্যে মনে হল একটা শব্দ শুনছি। এই শব্দ কানে শোনা যায় না। মনের তলায় অনুভব করা যায়।

জলের তলায় টুকরো টুকরো অতীত যেন খেলা করছে। জলের তলায় মাছ যেন।

যদু স্যার একবার আমাদের গায়ে হাত তুলেছিলেন। আমরা লুকিয়ে সন্ধেবেলায় সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। শহরের পুরনো সিনেমা হাউসটা মাস চার-পাঁচ বন্ধ থাকার পর আবার নতুন করে সারিয়েসুরিয়ে সদ্য খোলা হয়েছে।

পুরনো ছবি নয়, নতুন ছবিই দেখানো হচ্ছিল।

উমাশশীর ছবি।

পরের দিন যদু স্যারের হাতে মার খেয়ে উমা ভুলে গেলাম।

ঘুমের মধ্যে মনে হল, আমি অনিলার গলা শুনলাম।

মুহূর্তের জন্যে আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গিয়েছিল। কান পেতে থাকলাম। কই, কোথাও কোনও শব্দ নেই।

রাত বোধ হয় গভীর হয়ে গিয়েছে। সুখি অঘোরে ঘুমোচ্ছে। বাইরে বাতাস দিল

দমকা। গাছপাতা দুলে উঠল বোধ হয়।

হঠাৎ মনে হল, বিজলী আমার চোখের পাতায় নেমে এসেছে।

'ঘুমোও। রাত যে পেরিয়ে যাচ্ছে।'

ঘুমিয়ে পড়লাম কখন।

নয়

তিনটে দিন কেটে গেল।

সকালের দিকে একদিনই বেরিয়েছিলাম। সুখির দোকান দেখতে। স্টেশনের কাছে বাজারে তার দোকান।

সুখি নিজে আর তার এক কর্মচারী ছাড়া অন্য কেউ দেখাশোনা করে না দোকানের। মোটামুটি গোছানো দোকান। ভিড় এইসময়টায় কমে যায়। আবার দেওয়ালির মুখে দিন দুই-তিন।

দেওয়ালি আসছে। সুখির এক মক্কেল আছে মাল খরিদ করে আনার। সে বেরিয়ে গিয়েছে পাটনা মজঃফরপুর এলাহাবাদ দিল্লি। দু-চার গাঁঠরি মাল এসে পড়বে দেওয়ালির আগে। কলকাতার বড়বাজারের মুখেই একটা দোকান আছে সুখির জানা। তারা গুজরাতের মাল আনে। দামি খদ্দর।

সুখি দেখলাম, তার ছোটখাটো দোকান নিয়ে ভালই আছে।

বিকেলে সামান্য ঘোরাঘুরি হয়। কাছেই। আমার হাঁটার শক্তি কমে গিয়েছে। বেশি এগুতে পারি না। নদীর দিকে যাই। সঙ্গে অনিলা। সুবর্ণরেখার জল এখনও শুকোবার মতন হয়নি। সেভাবে প্রবল না হলেও বেগ আছে। পাথরে আছড়ে পড়ে কোথাও কোথাও পাক খায়। পাহাড়ি নদীর যা ধরন। সূর্যাস্তের সময়টি বড় ভাল লাগে নদীর ধারে বসে থাকতে।

সকালে বারান্দায় বসে আছি রোজই যেমন থাকি। বেতের একটি চেয়ার থাকে বসার। পাশে একটি টুল। সামান্য তফাতে মোড়া পড়ে থাকে।

রোজকার মতন অনিলা স্নান সেরে, বেশবাস পালটে কাচের প্লেটে কয়েকটি তাজা ফুল রেখে আমার টুলের ওপর নামিয়ে রাখল।

"বসো।"

অনিলা নিজের জায়গাটিতে গিয়ে বসল। বারান্দার ধার ঘেঁষে।

ও যে কেন কয়েকটি ফুল এনে আমার পাশে টুলের ওপর রাখে বুঝি না।

হাতে একটা বই ছিল। সুখি পশুপাখির বই পড়তে ভালবাসে। সেই ধরনের বই। আমি নিতান্ত সময় কাটাবার জন্যে বইটার পাতা ওলটাচ্ছিলাম। ছবি দেখা ছাড়া অন্য উদ্দেশ্য ছিল না।

অনিলাকে দেখে বই রেখে দিলাম।

শীত শীত হাওয়া। মনে হল, যে কোনও সময়ে মেঘলা হতে পারে। আকাশ অন্য দিনের মতন পরিষ্কার নয়, রোদও চাপা, প্রখর বা উজ্জ্বল কোনওটাই নয়। কেমন

একটা ধোঁয়াটে ভাব রয়েছে।

অনিলার পোশাকের বদল নেই। একই রকম।

বললাম, "তোমাদের শীত করে না! আজ আবহাওয়াটা অন্যরকম।"

অনিলা বলল, "আমাদের অভ্যেস আছে। আপনি ঠান্ডা লাগাবেন না।"

"না; আমি সাবধানে থাকি। বয়েস অনেক হল।"

"এইসময় এক-আধ দিন বৃষ্টিও হয়। হয়তো বিকেলে দেখলেন হঠাৎ বৃষ্টি হয়ে গেল। কাল আবার পরিষ্কার।"

"তোমার তো আন্দাজ আছে দেখছি..." আমি হাসলাম, "ছেলেবেলায় আমি এমন লোক দেখেছি, যে-লোক আকাশ দেখে বলে দিতে পারত, বৃষ্টি একটানা হবে, চলবে দু-তিন দিন, না এক বেলা দু বেলার খেলা...।"

অনিলা একটু হাসল। বুঝল আমি ঠাট্টা করছি।

অল্পসময় চুপচাপ। আমার চোখ পড়ল কাচের প্লেটে টুলের ওপর রাখা প্লেটে আজ শিশিরভেজা একটি হলুদ জবাও রয়েছে। হলুদ জবা সচরাচর চোখে পড়ে না।

কী মনে হল, সহজভাবেই বললাম, "তুমি রোজ আমার সামনে ফুলের ওই প্লেটটা নামিয়ে রাখ কেন?"

টুলের ওপর অবশ্য একটা কাপড়ের টুকরো থাকে। সাদাটে কাপড়, কাপড়ের ধারগুলিতে মামুলি সুতোর কাজ।

অনিলা বলল, "কেন! ফুল আপনার ভাল লাগে না!"

"আরে না, ফুল ভাল লাগবে না কেন? কার না লাগে! তবে রোজ ফুল দেখলে মনে হয়, তুমি বুঝি আমার দাম বাড়িয়ে তুলছ।"

"দাম!"

ঠাট্টা করেই বলেছিলাম কথাগুলো। বোধ হয় বোঝাতে চেয়েছিলাম, লোকে ঠাকুর দেবতা পটের পায়ের তলায় ফুল রেখে প্রণাম সারে সকালে, তুমিও কি আমায় পটের ছবি ভেবেছ!

সেভাবে দেখলে এ-কথার কোনও অর্থ হয় না, নেহাত পরিহাস ছাড়া।

অনিলাকে বললাম, "এমনি বললাম, কিছু মনে কোরো না।"

"মনে করব কেন! তবে ভাল লাগে বলে দিই। আপনি একা বসে থাকেন বারান্দায়, দুটো ফুল পাশে থাকলে ভালই লাগে। লাগে না?"

"তা লাগে।"

"আপনাকে এইভাবে দেখলে আমার যে একজনকে মনে পড়ে।"

অনিলার দিকে তাকালাম। আঙুল দিয়ে মাথার চুলের জট ছাড়াল বোধ হয়। বলল, "আপনি কি আমার বড়দাদার কথা শুনেছেন?"

আমি চুপ করে থাকলাম। অনিলার কথা আমার মোটামুটি জানা। সুখি যা বলেছে, যতটা বলেছে— জানি। বাকিটা জানি না। মনে হয়, সুখি যতটা জানে সব হয়তো আমায় বলেনি। প্রয়োজন মনে করেনি।

বললাম, "তোমার বড়দা!... তোমরা তো চারজন ছিলে না!"

"হ্যাঁ। দুই দাদা, দিদি আর আমি।"

"সুখির মুখে শুনেছি, তোমার এক দাদা রেলে কাজ করতেন। টিকিট চেকার।"
"আমার ছোড়দা। ...ওরা আলাদা হয়ে গিয়েছিল। পূর্নিয়ার দিকে থাকত।"
"তিনি তো মারা গিয়েছেন!"
"শরীর সয়নি। নানা অত্যাচার করত। ছোড়দার বউ যতটা পারে গুছিয়ে নিয়েছিল আগেই। ওদের পথে বসতে হয়নি।"
সুখিও আমাকে প্রায় একই কথা বলেছিল। পকেটে হাত ডোবালেই যেখানে টাকা উঠে আসে সেখানে খানিকটা অত্যাচার তো থাকা স্বাভাবিক।
"তোমার বড়দা?"
"আমাদের বাড়ি কোথায় ছিল জানেন?'
"জানি। মালদার দিকে।"
"শহরে নয়, ছোট মফস্‌সলে। স্কুলের মাস্টার ছিল বড়দা। অ্যাসিসটেন্ট হেড মাস্টার। শান্তশিষ্ট মানুষ। গান্ধীজির অন্ধ ভক্ত। পাড়ার লোক স্কুলের ছেলেমেয়ে সবাই পছন্দ করত, শ্রদ্ধা করত। স্কুলের মুরুব্বিরা পর্যন্ত।" অনিলা সিঁড়ি থেকে পা সরিয়ে নিল। আকাশের ফিকে রোদ গাঢ় হল সামান্য, বাগানে মউমাছি উড়ছে। শালবন কাঁপিয়ে হাওয়া আসছিল।
অনিলা বলল, "ওখানে তখন কলেজ ছিল না। অনেকের মাথায় ঢুকল কলেজ খুলবে। স্কুলের চৌহদ্দি তো অনেকটা। ঘরদোর বাড়িয়ে ধাপে ধাপে আই.এ, বি.এ পড়ানো শুরু করা যাক। কর্তাদের রাজি করানো অসম্ভব হবে না। তা বড়দাকে স্কুলেই রাখা হল। কিন্তু সদ্য খোলা কলেজেও পড়াতে হত অল্পস্বল্প। ...ওইরকম অগোছালো অবস্থা, বড়দার চাকরিও শেষ হয়ে আসছে, হঠাৎ আমাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।"
অনিলার কথা শুনতে শুনতে আমি অন্যমনস্কভাবে একটা সিগারেট ধরালাম। সচরাচর এইসময় আমি সিগারেট খাই না। সুখির মুখে শুনেছি, অনিলার বড়দাদা অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।
অনিলা বলল, "কী হল জানি না, বড়দা চোখের অসুখে ভুগতে লাগল। প্রথম প্রথম বোঝা যায়নি, মাস কয়েকের মধ্যে সেটা অন্যরকম হয়ে গেল। শহরের ডাক্তার বদ্যি থেকে কলকাতা পর্যন্ত ছুটতে হল। লাভ হল না কিছুই। বড়দা অন্ধ হয়ে গেল। তবে একেবারে অন্ধ বলব না। চোখে যেটুকু দেখত তাতে কাছে দাঁড়ালে মুখটা আন্দাজ করতে পারত।"
"ছোড়দা?"
"সে তো আলাদা হয়ে গিয়েছিল। থাকত দূরে। বিয়ে বউ ছেলেমেয়ে— সে তার নিজের মতন ছিল।"
"তারপর?"
"বড়দা বিয়ে-থা করেনি। আমাদের দুই বোনকে নিয়েই বড়দার সংসার। চাকরি থেকে অবসর নেবার বয়েস হয়ে গিয়েছিল এমনিতেই। চোখ চলে গেলে কাজকর্ম টিকিয়ে রাখা যায় না। বড়দা সব ছেড়ে দিল। উপায়ও ছিল না।"
"তা ঠিকই।"

"শেষের দিকে বড়দার কাজ হয়েছিল— সকাল হলে বারান্দায় এসে বসে থাকা। আর পায়ের শব্দ শুনে লোক আন্দাজ করা, কোথাও থেকে কোনও গন্ধ ভেসে এলে ঠিক ঠিক ধরে ফেলা, কীসের গন্ধ, সে ফুল হোক, ফল হোক, হোক না কেন ধূপধুনোর...।"
"শুনেছি একটা ইন্দ্রিয় নষ্ট হয়ে গেলে অন্যটা আরও তীক্ষ্ণ হয়ে যায়।"
"বড়দার আর একটা ঝোঁক বেড়ে যায়।"
"কী!"
"আমাদের পাশে পেলেই শুধু পুরনো কথা। এ-গল্প সে-গল্প। কত যে স্মৃতি...! শান্তশিষ্ট মানুষটিকে তখন থামানো যেত না।"
"ও!"
"আপনার মতনই না?"
"আমার মতন!... আমি তো অন্ধ নই; আর তোমায় বোন এমন কিছু কি শুনিয়েছি যাতে..."
মাথা নাড়ল অনিলা। "আমার কাছে না বলুন, তবে অভ্যেসটা আপনার ভালই আছে। দাদা বলে।"
"সুখি!" প্রথমে চুপ, তারপর হেসে ফেললাম, "আমার দুর্নাম করে।"
"তাই নাকি!"
কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললাম, "এটা বুড়ো বয়েসের দুর্বলতা। পুরনো কথা বলতে ভাবতে ভাল লাগে।"
"মনে হয় অনেক সুখে শান্তিতে ছিলেন, তাই না!" অনিলা যেন আমায় ঠাট্টা করল।
কী বলব! বললেই যে বুঝবে এমন তো কথা নয়।
"ও-ভাবে কিছু বলা যায় না। বিচার করাও উচিত নয়," আমি বললাম থেমে থেমে। "তবু যদি বল, সুখ শান্তি দুঃখ অশান্তি এগুলো মানুষের জীবনে সবসময় জড়ানো থাকে। আগেও থাকে পরেও থাকে। ওরই মধ্যে একটা সময় যদি আমার কাছে তুলনায় বেশি সুখের মনে হয়, তবে আপত্তি কোথায়?"
অনিলা শুনছিল। অন্যদিন সে বেশিক্ষণ বসে না এইভাবে; কিছুক্ষণ বসে উঠে যায় ঘরের অন্য পাঁচটা কাজ সারতে। একটিমাত্র কাজের লোক ছাড়া তার দ্বিতীয় কেউ নেই যে সাহায্য করবে সংসার সামলাতে।
আজ অনিলা উঠল না। সে মুখরা নয়, বেশি কথা বলতে ভালও বাসে না। যখন যা বলে, ছোট করে বলে, চুপ করে থাকে বেশির ভাগ সময়ই। আমায় দেখে। কথা শোনে আমার। ওর চোখ দেখে বরং আমার সন্দেহ হয়, অনিলা যেন কিছু বলতে চায় আমায়, পারে না।
অনিলা বলল, "আপনার ঠাকুমা, মা বাবার কথা আমি শুনেছি। দাদা— আপনার সুখি আমায় বলেছে। ওর মধ্যে খুব আলাদা কী আছে!"
"আলাদা যা তা আমি বুঝি; তুমি বুঝবে না। আমি সাধারণ ঘরের ছেলে, সাধারণভাবে মানুষ, আলাদা আর কী থাকবে! তবু ওই সাধারণের মধ্যে অনেক

জিনিস দেখেছি যাতে মন ভরে গিয়েছে। সাহস, ধৈর্য, তেজ, দুঃখের মধ্যেও নিজেকে সামলে রাখতে দেখেছি, বোন। এটা কথার কথা নয়। সত্যি। আমার ঠাকুমা তখনকার দিনে বাড়িতে বসে হাতে-গড়া পাউরুটি তৈরি করেছে ছেলেমেয়েদের বাঁচিয়ে রাখতে, আমার জেঠাইমাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিল জেঠামশাই বিনা দোষে, আমার মা...”।

আমাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে অনিলা উঠে দাঁড়াল। ভাবল, আমি বিরক্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছি।

“যে ফল গাছ থেকে খসে পড়ে গিয়েছে,” অনিলা বলল, “মাটিতে পড়ে গিয়েছে তা আপনি কুড়িয়ে নিতে পারেন, কিন্তু মাথার ওপর গাছের ডালের দিকে তাকিয়ে কি খুঁজবেন, খসে পড়া ফলের বোঁটা! হা হুতাশ করবেন! এ তো বোকামি!” কথাগুলো এমনভাবে বলল যেন সে আমার সঙ্গে তর্ক করছে, না নিজের সঙ্গে, বুঝতে পারলাম না।

“তোমার বড়দাও বোকা ছিলেন বলছ?” আমি বিরক্ত।

“বড়দার কথা আলাদা অনেকটাই। মানুষটি দিনে দিনে অন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তার কাছে বর্তমান বলে কিছু নেই। নতুন করে দেখে না, একটা সকাল এল কি গেল। আমরা দু'জন ছাড়া পাশে কেউ নেই। ক্লান্তি, অবসাদ, একঘেয়েমি, পরের হাত ধরে ওঠা-বসা; কেমন করে বাঁচবে একটা লোক। মনে রাখবেন, বড়দার জীবনটা কিছুদিন আগেও কত মান-মর্যাদা শ্রদ্ধা ভালবাসার ছিল। সত্যি বলতে কি— আগে এক এক সময় মনে হত, বড়দা যেন রথের ঠাকুর, হইহই করে কত লোক তাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। ...একদিন সেই মানুষকে আর কেউ ঠেলতে এল না।”

অনিলা আর দাঁড়াল না। চলে যাচ্ছিল।

আমি বললাম, “তোমার বড়দার গুণ ছিল রথের ঠাকুর হবার। আমার ওসব নেই। আমাকে ঠেলবার জন্য লোক দরকার হয়নি। আর আজ আমাকে কেউ পথে নামিয়ে দিয়েও যায়নি। ...শোনো বোন, আমি শুধু আমার জীবনের সঙ্গে বোঝাপড়া করার চেষ্টা করি। পারি না। তবু করি। জীবনটা আমার; তাই নয় কি!”

অনিলা চলে গেল।

বসে থাকলাম। সামনে, বাগান পেরোলেই ফাঁকা। মাঠ বলে সমতল জমি নেই। উঁচুনিচু ঢিবি, গাছ পাথরের স্তূপ। গাছগুলোর মাথার পাতা যেন ঈষৎ বিবর্ণ। শীত আসছে বলে। নাকি হেমন্তের শিশির তাদের রং হালকা করে দিচ্ছে। কে জানে।

সূর্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আবার। রোদ গাঢ় হল। নীল আকাশের তলায় হালকা মেঘের টুকরো ভেসে যাচ্ছে।

আমার মনে হল, মেঘলার ভাবটা কেটে যাবে আরও বেলা হলে।

অনিলার ওপর আমার বিরক্তি কাটছিল না। নিজেই অপ্রসন্ন হচ্ছিলাম। কী আসে যায় অনিলার কথায়। সে তার মতন ভাবতেই পারে। ভাবতেই পারে, গাছ থেকে ফল পড়ে যাবার পর মুখ তুলে শূন্য ডালের দিকে তাকিয়ে লাভ নেই। আবার আমিও ভাবতে পারি, পড়ে যাওয়াটা মুহূর্তের ঘটনা। যদিও সত্য। কিন্তু পড়ে যাবার আগে ওই শাখা পত্রপল্লব কুসুম বৃন্তের সঙ্গে ফলের যে সম্পর্কটা ছিল তা যে অনেক দীর্ঘ।

দশ

হাতের খামটা এগিয়ে দিল সুখি। “এই নাও, তোমার শমন।”

কলকাতার চিঠি; সুখির দোকানের ঠিকানায় এসেছে। খামের মুখ না খুলেই বুঝতে পারি রমুর চিঠি। ঠিকানাটা তার লেখা।

খাম খুলতেই দেখি একই কাগজে তিন নাতিনাতনির তাগাদা। বড় করে লেখা চিঠি নয়, কয়েক ছত্র লিখেছে সব, তাও আবার মজা করে।

পলু লিখেছে রঙিন ফেল্ট পেনে, ভাষাও টেলিগ্রামের কায়দায়। দাদা, মাদার কালীস্ প্যান্ডেল অলমোস্ট রেডি। সিলভার জুবিলি ইয়ার তো। জগুদের ক্লাব মেট্রো রেল করছে, আলোয় আলোয় মাত করে দেবে। লাইট লাইট, এভরিহোয়্যার। তুমি হাঁ হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি চলে আসবে। ভাল আছ তো! পলু।

পলুর পর ছটু।

সে লিখেছে ডট পেনে। ছটুর হাতের লেখা সুন্দর। বড় বড় করে লিখেছে, 'তুমি কেমন আছ? বাড়িটা ফাঁকা ফাঁকা লাগে। গত বছর এসময় তোমার ঠান্ডা লেগে গিয়ে বেশ ভুগেছিলে। ওখানে নিশ্চয় ঠান্ডা পড়েছে। সাবধানে থাকবে। আর বেশিদিন থেকো না, কালীপুজোর আগেই চলে আসবে। সুখিদাদু কেমন আছে? ওখানে সব ঠিক তো? ছটু

ছটুর লেখার শেষ কথাটার পুরনো অর্থ বোঝা যায়। অনিলার পাগলামির প্রসঙ্গ। ওদের মাথায় কেন যে এই ভয়টা ধরিয়ে দিল বউমারা? তবে এটা ঠিক, যদি ছটুরা আমার সঙ্গে আসত, এখানে এসে স্বস্তি পেত না।

শেষ লেখাটা রমুর।

'দাদা, আমি কিন্তু ভীষণ খেপে যাচ্ছি। তুমি না-থাকায় সন্ধেবেলায় জমছে না। নো বকবক। মজা বন্ধ। তোমার ঘর গুছোতে গিয়ে সেদিন একটা ফোটো পেলাম বইয়ের মধ্যে। কোন কালের পোকা-লাগা বই। তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ। তুমি কি তন্ত্র করতে! হায় ভগবান। বইয়ের মধ্যে তোমার আর ঠাম্মির একটা ফোটো। দারুণ। তোমাকে একেবারে ফিফটি-ফিফটিফাইভ দেখাচ্ছে। আবার গোঁফের ফাঁকে মিটিমিটি হাসি। ...দাদা, আমি একদিন তেতলায় তোমার বিছানায় শুয়েছিলাম। বাড়িতে গেস্ট এসে গিয়েছিল। আমায় ওপরে পাঠিয়ে দিল। না, ভয় পাইনি। পাশেই তো নিবারণদা থাকে। তা রাত্রে মনে হল, আমার নাকে কে কাঠি দিয়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। মাস্ট বি ইয়োর ঠাকুমা বুড়ি। ভয় পাব কেন! বরং, হাঁচি শুরু হল। আর আমার হাঁচি মানে মিনিমাম্ একটা সেঞ্চুরি। হেঁচে হেঁচেই সকাল। দাদুমণি, প্লিজ এবার তুমি ফিরে এসো। কালীপুজো এসে গেল। রমু।

“কী হল?” সুখি বলল।

“ওই ওরা লিখেছে। রমুরা।”

“তাড়া দিয়েছে তো!”

“কবে ফিরব জানতে চায়।”

সুখি হাসছিল। "তোমার এত পিছুটান।"
"কী করব। ওরা সবসময় ভয় পায়। বুড়ো বয়েস যে।"
"ফিরবে। মাত্র তো দিন চারেক হল। কালীপুজোর এখনও ক'টা দিন বাকি, আমি তোমায় ঠিক সময়ে পৌঁছে দেব।"
"আমি ভাবছি না। ওরা ভাবছে।"
সুখি হাসতে হাসতেই বলল, "ও-রা ভাবছে। ...তা দাদা, তুমি এখানে এসে বাড়ির বাইরে ঘোরাফেরা তেমন করলে না। গৃহবাসী হয়েই দিন কাটাচ্ছ।"
"ঘুরছি তো! ...এর বেশি ঘোরার ক্ষমতা কি আমার আছে সুখি!"
"ইচ্ছেও করে না?"
"তেমন একটা করে না। তোমায় সত্যি বলব, এইরকম মাঠঘাট গাছপালা পাহাড়ি ঢল, পাথরের চাঁই আমি অনেক দেখেছি ছোটবেলা থেকে। মোটামুটি একই রকম। প্রকৃতি বা পরিবেশ খুব একটা আলাদা নয়। এখন তো জায়গাটা আগের মতন ফাঁকাও নয়, মফস্‌সল টাউন হয়ে গিয়েছে প্রায়।"
সুখি বলল, "থাকো আরও দিন কয়েক। আমি তোমায় সময় মতন পৌঁছে দিয়ে আসব। ...ভাল কথা, আজ বিকেলে তোমায় নিয়ে এক জায়গায় যাব।"
"কোথায়?"
"আছে। সন্ন্যাসী উপগুপ্ত।"
"সে আবার কী!"
সুখি হাসল।
অনিলা কাছে ছিল না। থাকলে হয়তো অন্য কিছু বলত। ওর সঙ্গে আমার কোনও বিরোধ হয়নি। বিরক্তিও নেই। একদিন কথায় কথায় কারও প্রতি অপ্রসন্ন হলে সেটা কেই বা মনে রাখে। কেনই বা! বরং আমার মনে হয়েছে, অনিলা নিজেই যেন কেমন এক চাপা অশান্তি নিয়ে থাকে। ফলে সে নিজেও বোঝে না কখন কী কারণে তার মধ্যে অস্বাভাবিকতা ফুটে ওঠে আচরণে, কথাবার্তায়।
সুখিকে এসব কথা আমি বলিনি। বলার দরকার কী!

বিকেলে সুখির দোকানে অল্পক্ষণ বসে থাকার পর সুখি বলল, "চলো।" বলে দোকানের কর্মচারীকে কাজের কথা বুঝিয়ে উঠে পড়ল।
বাজারের দিকটা এখন অনেক ফাঁকা। দোকানপাট, আলো সবই আছে, লোকজন তেমন নেই। পুজোর সময়কার ভিড়ের হল্লা এখন থাকার কথাও নয়।
রিকশায় চেপে সুখি বলল রিকশাওলাকে, গোলকুঠি।
রেল লাইনের ডাইনে, ক্রসিং পেরিয়ে সিকি মাইলও নয়, রিকশা ছেড়ে দিল সুখি।
সন্ধের মুখ। আলো প্রায় অস্পষ্ট। উত্তরের হাওয়া দিয়েছে। আকাশের তারা চোখে পড়ছিল।
সামনে দুটো ইউক্যালিপটাস গাছ। আধ-ভাঙা ফটক পেরিয়ে ঘাস আর আগাছা। তারপর একটা ছোট মতন বাড়ি। বাংলো ধরনের। সামনেটা গোল মতন দেখায়।
এক ভদ্রলোক ভেতর বারান্দায় বসে।

সুখি আমায় নিয়ে বারান্দায় উঠে এল।
"আরে, সুখিবাবু যে! আসুন, আসুন।"
সুখি আমাকে দেখিয়ে ভদ্রলোককে বলল, "আপনার সঙ্গে আলাপ করাতে নিয়ে এলাম।" বলে আমাকে বলল, "রাজাদা ইনিই সেই সন্ন্যাসী উপগুপ্ত।"
ভদ্রলোক ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। পরনে পাজামা, গায়ে উলিকটের শার্ট, গলায় মাফলার। তাঁর ডান পায়ের গোড়ালি জড়িয়ে ক্রেপ ব্যান্ডেজ। দেখতে অত্যন্ত শীর্ণ। মাথার চুল এত ছোট করে ছাঁটা যে মনে হয়, কিছুদিন আগে মাথা কামিয়ে ছিলেন—সবে চুল উঠতে শুরু করেছে। হাড়ওঠা মুখ। গায়ের রং অত্যন্ত ফরসা।
"কী বললে শালা, উপগুপ্ত! আমি সন্ন্যাসী!" বলে আমার দিকে তাকালেন। "নমস্কার দাদা, আসুন। আমার কী সৌভাগ্য আপনি নিজে এসেছেন। আপনার কথা আমি শুনেছি। আমারই যাওয়ার কথা আপনার কাছে, কী করব বলুন, কালই এলাম এখানে, আর ট্রেন থেকে নামার সময় পা মচকে গেল! ব্যথায় কাবু। হট অ্যান্ড কোল্ড চলছে, তার সঙ্গে আর্নিকা মন্ট। অ্যালাপ্যাথি—হ্যাঁ দাদা আমি অ্যালাই বলি—আমাদের অ্যালা ওষুধ সিস্টেমকে পয়জেন করে দিচ্ছে।... বসুন, বসুন, দাঁড়িয়ে থাকলেন কেন!"
আমার হাসি পেল। এক একজন মানুষ থাকে যারা চেনা অচেনার পরোয়া করে না, দেখামাত্র হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নেয়।
নমস্কার সেরে আমরা বসলাম। আরও চেয়ার ছিল বসার। একটা বাতি জ্বলছে বারান্দায়।
"আমার নাম উপেন গুপ্ত। বড় করে উপেন্দ্রনাথ গুপ্ত।" ভদ্রলোক বললেন, "ওই শালা আমায় উপগুপ্ত বলে।"
আমরা হাসলাম।
"বউদি কোথায়?" সুখি বলল।
"আছেন ভেতরে। ড্রেস রিহার্সাল করছেন বোধ হয়।"
"ড্রেস রিহার্সাল!"
"তুমি গর্দভ এসব কী বুঝবে! হোক না তোমার বউদি বুড়ি। তা বলে সন্ধেবেলায় গা ধুয়ে চুল বেঁধে—যদিও সেটা এখন নামমাত্র, শাড়ি জামা পালটে—ভদ্রস্থ হবে না! এ কি আমি হে, দাঁতপড়া বুড়ো, ন্যাংটা ফকির!"
আমি জোরে হেসে উঠলাম। সন্দেহ নেই মানুষটি মজার।
সুখি আমায় বলল, "গুপ্তদা সরকারি চাকরি করেছেন বরাবর। জুডিসিয়াল সার্ভিস। হাই পোস্ট।"
"হাই না ছাই। গোরুর গাড়ির চাকা দেখ না, গড়িয়ে গড়িয়ে চলে; সরকারি চাকরিও তাই, গড়ায়; গড়াতে গড়াতে একদিন স্টপ।" বলে উপেনবাবু আমার দিকে তাকালেন। "আপনার কথা আমি শুনেছি সুখির কাছে। কাল যখন ট্রেন থেকে নেমে দুর্ঘটনাটি ঘটালাম—তখন আর পা টানতে পারি না। হেঁচড়ে হেঁচড়ে সুখির দোকানে। এক টুকরো বরফও পাওয়া যায় না শালার জায়গায়। কষ্টেসৃষ্টে যা জুটল, ঘষলাম খানিকটা, তারপর পট্টি বেঁধে রিকশায়। গিন্নি তুবড়ি ছোটাচ্ছে মশাই। সুখির কথা ছিল

আজ এসে খোঁজ নিয়ে যাবে। সঙ্গে একজনকে আনবে, সেটা আপনি। আপনাদের জন্যেই ওয়েট করছিলাম।"

সুখি বলল, "পায়ের অবস্থা কেমন?"

"দু-চার দিন ভোগাবে।" বলে আমার দিকে তাকালেন উপেন, "পা না আটকালে আমিই সকালে বেড়াতে বেড়াতে আপনার কাছে গিয়ে হাজির হতাম।"

"তা কেন, আমরাই আসতাম।"

"নিশ্চয় আসতেন। তবে আমার স্বভাব কী জানেন, এখানে বছরে একবার আসি, এই সিজন্ থাকতেই, এলেই সকাল বিকেল একটু টোটো করি। আর সুখির দোকানে গিয়ে চা খাই, গল্প করি, আড্ডা মারি।...আমাদের এই ভাঙা বাড়িটা মাঠ হয়ে যেত সুখি না থাকলে। ও আছে বলেই..."

"বাড়ি আপনার পৈতৃক না?"

"পাগল! আমার পিতাঠাকুর এমন কাঁচা কাজ জীবনেও করতেন না। নেভার। এটি আমার ফাদার-ইন-ল-এর কাজ। তিনি দেহ রাখলে শাশুড়ি এসে মাঝে মাঝে থাকতেন। স্বামীর স্মৃতি।... শাশুড়ি চোখ বোজার পর—তাঁর মেয়ে, অর্থাৎ আমার স্ত্রীর ঘাড়ে বর্তাল। ওঁর সন্তান বলতে একটি মেয়ে মাত্র।"

"ও! শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তি তবে!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। গিন্নিকে কতবার বুঝিয়েছি, এইবেলা ঝেড়ে দাও, নয়ত ও আর থাকবে না। বললেই ফোঁস করে ওঠে। বাবা-মায়ের স্মৃতি। কেন বেচে দেব!"

সুখি বলল, "অন্যায়টা কী বলেন বউদি!"

"অন্যায়টা তুই কী বুঝবি!... আরে আমারটা কে খাবে তার ঠিক নেই, পরের কলার কাঁদি ঘাড়ে করে বয়ে বেড়াব! যন্ত্রণা নয় দাদা, আপনি বলুন।"

"আপনার বাড়ি..."

"ভবানীপুর। যত উকিল, অ্যাডভোকেট, সলিসিটার দেখবেন কলকাতায় তাদের ফিফটি পার্সেন্ট ওই এলাকার। জজসাহেবদেরও পাবেন। ভবানীপুর না থাকলে ওই হাইকোর্ট অন্ধকার।"

আমি হাসলাম। "আপনার বাবা—?"

"ওই একই লাইনের।... তবে আমার বেলায় সার্ভিস হয়ে গিয়েছিল।"

"ছেলেমেয়ে?"

"ছেলে অতি চতুর। আমাকে বড় বড় কথায় ভুলিয়ে বেটা বিলেতে গেল এফ আর সি এস পড়তে। সেখান থেকে ডিগ্রি বগলে করে পালাল আমেরিকায়। বড় চাকরি, বিশাল হসপিটাল, পকেট ভরতি ডলার। ও বেটা আর ফিরবে না।" বলে একটু উঁচু গলায় হাঁক মারলেন, "কই গো শোভারানি, একবার উদয় হও।" নাকের একটা অদ্ভুত শব্দ করলেন উপেন। বললেন, "আর মেয়ে রয়েছে দিল্লিতে। ডিজাইনার। করলবাগে থাকে। জামাই বম্বেতে ব্রিটিশ লাইনারের অফিসে পি. আর. ও। দুটি দু প্রান্তে। নো ইসু। টু টেল ইউ ফ্র্যাংকলি, আমার মনে হয়, ওরা সেপারেশানই প্রেফার করছে। হয়ত রিলেশান ভেঙে দেবে বরাবরের মতন।"

আমি অস্বস্তি বোধ করে বললাম, "না না, চাকরিবাকরির বেলায় অনেক সময়

তফাতে থাকতে হয়। তা বলে সম্পর্ক..."

"ধ্যুত সম্পর্ক! আপনি কিস্যু জানেন না।... দেখুন দাদা, আমরা ভাত খেতাম কাঁসার থালায়। হাত থেকে পড়লে ঝনঝন শব্দ হত, হয়তো থালার কানায় একটা টোল পড়ত। কিন্তু ভাঙত না, সার। এখন সব শৌখিন সিরামিক—মানে কাচের প্লেট। হাত ফসকে পড়লেই চৌচির। বুঝলেন?"

আশ্চর্য এক অনুভূতি আমাকে নির্বাক করে রাখল। উপেনবাবুর মতন মানুষ আগে কি আমি দেখেছি! এমন সরল, দ্বিধাহীন কথাবার্তাও কি শুনেছি? অচেনা এক মানুষের কাছে তিনি ব্যক্তিগত গোপনতা তো কিছুই রাখলেন না। প্রথম পরিচয় যেন নয়, উনি অনায়াসেই আমাকে অন্তরঙ্গ করে নিতে পারলেন।

উপেনবাবুর স্ত্রীর গলা পাওয়া গেল। উনি আসছেন। মাঝে একবার অনিলার খোঁজ নিলেন উপেনবাবু।

"বুঝলে সুখিবাবু, উপেনবাবু বললেন, "ট্রেন স্টেশনে ঢোকার আগে ডিসটান্ট সিগনালের আগে হুইস্‌ল মারে, দেখেছ তো! শোভারানি আওয়াজ মারলেন, আসছেন এবার। অ্যাপ্রোচিং...।"

আমরা হেসে উঠলাম একসঙ্গে। জোরেই।

"আপনি যেভাবে কথা বলেন", সুখি বলল, "আমরা পারব না।"

"কোথথেকে পারবে বাপ। আমরা হলাম কলকাতার বনেদি রসরাজ। হুতোমের ফোর্থ-ফিফথ্ বংশধর। রিয়েল বেঙ্গল। তোমাদের বন্ধুবাবু এসে আমাদের কাছা খুলে দিয়েছে।"

হাসির হল্লা উঠল। ওরই মধ্যে উপেনবাবুর স্ত্রী এলেন। সঙ্গে একটি কমবয়েসি মেয়ে। চা নিয়ে এসেছে।

আমি উঠে দাঁড়ালাম।

পরিচয় করিয়ে দিল সুখি। "শোভা বউদি।... বউদি, এটি আমার কলকাতার দাদা।"

নমস্কার সেরে বসতে বললেন শোভা। কর্তার সঙ্গে গিন্নির মিল নেই চেহারায়। শোভা মাথায় খাটো, গড়ন মাঝারি, গায়ের রং শ্যামলা, চোখমুখে বয়েসের ছাপ পড়া সত্ত্বেও অনুমান করা যায় উনি সুশ্রী ছিলেন। সাদা খোলের চওড়া-পাড় শাড়ি, ফিকে রঙের জামা, মাথার চুল পেকেছে, পুরোপুরি অবশ্য নয়। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা।

বিজলীর কথা আমার মনে পড়ল। বেঁচে থাকলে বিজলী হয়তো এঁর চেয়ে সামান্য বড় হতে পারত। অন্য কোনও মিল নেই। গড়নে, গায়ের রঙে, মুখের আদলেও নয়। বিজলীর মধ্যে গৃহিণীপনার আধিপত্য ছিল বেশি। তার স্বভাবে কেমন যেন অহংকার চোখে পড়ত। স্নেহ মমতা তার কম ছিল না, তবে বাড়াবাড়ি পছন্দ করত না।

"বসুন বউদি," সুখি বলল।

"দাঁড়ান, চা দিয়ে নিই আগে।"

চায়ের সঙ্গে মিষ্টি ছিল। বললেন, কলকাতা থেকে এনেছিলেন সামান্য। এখনও নষ্ট হয়ে যায়নি। নিন, একটু মুখে দিন।

এ সময় আমি কিছু খাই না। চায়ে আপত্তি ছিল না। তবু মহিলার অনুরোধে মুখে দিতে হল।

শোভা বসে পড়েছিলেন। বললেন, "এদিকে ফুলডুংরি ঘুরে আসা হল নাকি? সুখিবাবুর দেরি দেখে ভাবছিলাম..."

সুখি বলল, "না বউদি, একেবারে সোজা। ফুলডুংরি আগেই দেখা হয়ে গিয়েছে দাদার।"

উপেন বলল, "ওয়ার্থলেস! এসব দিকে ঢিবি হলেই কত ডুংরি! এই তো পুরুলিয়া যাও—ভালু ডুংরি, ঠাকুর ডুংরি... কলকাতার দাদা কি ছোটখাটো পাহাড়ও দেখেননি?" বলে আমার দিকে তাকালেন।

হেসে বললাম, "তা দেখেছি। পরেশনাথ, পঞ্চকোট..."

"তবে তো হয়েই গেল!"

"এখানকার কিছুই তোমার ভাল লাগে না?" শোভা বললেন স্বামীকে।

"কেন লাগবে না! সুখিবাবুকে লাগে, যদুর দোকানের গরম জিলিপি লাগে, তোমার এই বাড়ির আমগাছের ডালে সকাল হতে না হতেই পাখি সব করে রব—ভাল লাগে। আরও কত কী ভাল লাগে, যেমন ধর রোদই উঠল না—তুমি একেবারে বাৎসল্যরসে কণ্ঠ ডুবিয়ে ডাকলে—ওগো ওঠো, বেলা হয়ে গিয়েছে!... কী ভাব, একেবারে সেই লালাবাবুর বেলা যায় ভাব যেন..."

সুখি হোহো করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে বে-দম।

শোভা বললেন, "এ মানুষকে নিয়ে পারা যায় না।" আমার দিকে তাকিয়েও বললেন, লজ্জাও পেয়েছেন সামান্য।

উপেন বললেন, "এ-মানুষ মানেটা কী শোভারানি। আর দশটা মানুষের যদি মেজাজ না থাকে আমার কী! আই অ্যাম এ ম্যান অফ্ মেজাজ। ঈশ্বর আমার ব্রেনের মধ্যে এমন একটা কেমিক্যাল কমপাউন্ড ঢুকিয়ে দিয়েছেন যে আমি এই বয়েসেও গলা ফাটাতে পারি।"

"শুনুন কথা।" শোভা বললেন।

"শুনবে কী! হাত পা থাকলেই সবাই মানুষ হয় না। মানুষ শয়ে একজন, বাকিরা পপুলেশন। সেনসাস রিপোর্টে থাকে, ভোটের লিস্টে থাকে—, ব্যাস।"

সুখি হাসতে হাসতে বলল, "পার্টলি রাইট!"

"পার্টলি নয় সুখিবাবু, সাচ্চা বাত। আরে বাবা, নিউটন একজনই হয়, বাকি সব লণ্ঠন। গাছ থেকে আপেল পড়তে সবাই দেখে, নিউটনসাহেবও দেখেছিলেন। তবু ধরে নাও ওটা গল্প কথা, কিন্তু এটা তো ফ্যাক্ট, হাজার হাজার বছর ধরে লোকে দেখছে, ওপরের ফলপাকড়, এটা সেটা নীচে পড়ছে। পড়ছে-পড়ুক, আমরাও দেখছি, ভাবছি এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ওই একটা লোকের মাথায় ভূত চাপল। ভাবল কেন? নীচে পড়বে কেন? হোয়াট ইজ্ দ্য রিজন? ফলে জানা গেল ল অব গ্রাভিটেশন। বুঝলে নির্বোধ! এরই নাম দেওয়া হল 'ইলাটিভ সেন্স'—মানে এক ধরনের ইনটিউশান। জগতে এইভাবে এক একটা লোকই আমাদের জ্ঞানগম্যিকে সাবালক করেছে। বাকিরা ভেড়া..."

শোভা বিরক্ত হলেন। "রাখো তো তোমার লেকচার। কাজ নেই কর্ম নেই লোক দেখলেই বকবক। পাগল! যত দিন যাচ্ছে পাগলামি বাড়ছে।"

আমরা হাসছিলাম। মজা লাগছিল কর্তা-গিন্নির কথা কাটাকাটির খেলা।

আমি বিজলীর সঙ্গে বড় বড় কথা বলতাম না তেমন। ছোটখাটো কথা নিয়েই মজা হত। রাগ-অভিমানও হয়েছে। আসলে কথা বলায় আমি এতটা রপ্ত ছিলাম না। মানে বড়সড় কথায়। আমার ঠাকুমা বা বাবাকে দেখেছি, গুরু কথা লঘু করে বলতে। তুলনা দিয়ে।

চা খাওয়া শেষ হয়েছিল।

শোভা সাংসারিক কথাবার্তা তুলে নিউটনকে আপাতত হটিয়ে দিলেন। আমি কোথায় থাকি, সংসারে কে কে আছেন, নাতিনাতনিদের কত বয়েস হল ইত্যাদি।

উপেনবাবু সিগারেট ধরালেন। দিলেন আমাকে।

"কত দিন আছেন দাদা?" উনি বললেন।

"বেশিদিন নয়। কালীপুজোর আগেই ফিরব।"

"সে কী! আড্ডা মারার লোক পাব কোথায়?"

"ওরা বড় তাগাদা দিচ্ছে।"

"তা আপনি এক কাজ করুন না।.. আমার যা 'লেগি'-র অবস্থা তাতে আপাতত রেস্ট নিতে হবে, নয়তো আমিই ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে হাজির হয়ে যেতাম আপনার কাছে। বেটার আপনি একটা রিকশা নিয়ে চলে আসুন। দিব্বি আড্ডা দেওয়া যাবে সন্ধেবেলায়। সুখিবাবু দোকান থেকে ফেরার সময় আপনাকে নিয়ে যাবে। অসুবিধে হবে নাকি?"

"না। আমি তো বসেই থাকি, বইটই পড়ার চেষ্টা করি একটু। আর কী করব বলুন!"

"করার কিছু নেই দাদা; এ-শালা ধুনি জ্বালাবার জায়গা।... আর ওই যে আমাদের একটা টান তৈরি হয়েছিল বিভূতিভূষণের লেখা পড়ে। দ্যাট ঘাটশিলা ইজ ডেড, নো মোর বিভূতিবাবু, নো মোর বিউটি।... আপনি চলে আসুন। দুই বুড়োয় দিব্যি গল্পগুজব করা যাবে।... ভাল কথা, আমি কিন্তু সন্ধের পর খানিকটা জলপান করি। জল দু ধরনের। একটা নির্মল, আর-একটা সবল। আমি সবল চালাই। আপনি—?"

"না। আমার ওসবের অভ্যেস নেই।"

"বলেন কী! আপনি যে একেবারে রামকৃষ্ণ ঠাকুর।" উপেনবাবু হোহো করে হাসতে লাগলেন। "একেবারে নির্জলা সধবা। তা হোক, আপনি আসবেন। আমি জাত মাতাল নই। কী বলো গিন্নি!"

শোভা মুখ টিপে হাসলেন।

ফেরার পথে আমি সুখিকে বললাম, "ভদ্রলোক বেশ মজার মানুষ।"

"জমিয়ে গল্প করতে পারেন। লাইভলি!"

"কিন্তু সুখি ছেলে মেয়ে জামাই ছেড়ে—"

"ছেলে বছর দুই অন্তর একবার করে এ-দেশে আসে বাবাকে দেখতে। বিয়ে করেছে ও-দেশেই। গুজরাটি মেয়ে। মাইক্রো বায়োলজিস্ট।"

"বাচ্চাকাচ্চা?"
"নিজেদের নেই। একটা মেয়েকে অ্যাডপ্ট করেছে।"
শীত করছিল। রাত হয়েছে খানিকটা। আকাশের তারা কুয়াশায় ঈষৎ ম্লান।
"মেয়ে জামাই কি আলাদা হয়ে গিয়েছে?"
"শুনিনি। সরাসরি নয় বোধ হয়।"
কিছুক্ষণ আমরা দুজনেই চুপচাপ। উঁচু নিচু রাস্তা পড়ল। রিকশাটা লাফাচ্ছিল মাঝে মাঝে। রেল লাইন থেকে আমরা অনেকটা দূরে চলে এসেছি, তবু একটা ট্রেন যাবার শব্দ ভেসে এল।
"ভদ্রলোক এভাবে থাকেন," আমি বললাম, "মাত্র কর্তা গিন্নি; আত্মীয়স্বজন নেই, তবু ডিপ্রেসড্ নয়। আশ্চর্য!"
"আত্মীয়স্বজন নেই নয়, আছে অনেকেই। কলকাতার বড় পরিবারের মানুষ, নিজের ভাইপো ভাইঝিরা আছে, ভাইপোরা কাছাকাছি থাকে। এক খুড়তুতো ভাই পাশেই থাকে। রাইটার্সের বড় চাকুরে। একেবারে একা মানুষ ঠিক নয়। আপদে বিপদে পাশে পাবার মতন লোক আছে।"
"আত্মীয় আর নিজের ছেলেমেয়ে কি এক হল, সুখি!"
সুখি কোনও জবাব দিল না।
হঠাৎ আমার কী মনে হল, বললাম, "অবশ্য নিজের যারা তারাও তো বরাবর থাকে না।"
"তুমি বিজুদির কথা বলছ?"
"না। ও তো চলেই গিয়েছে। আমি অন্যদের কথা বলছি।"
"মানে?"
"মানে—," সামান্য চুপ করে থেকে বললাম, "তোমায় বলিনি। আগে নিজেই জানতাম না। হালে জানতে পারছি, আমার সংসারে ফাটল ধরেছে। তুমি জান, শিরীষ আলাদা জমিজায়গা কেনার চেষ্টা করছে। বাড়ি করবে, ক্লিনিক করবে। মানে, সে আলাদা হয়ে যাবে একদিন। বড়ছেলে খুঁজছে সল্টলেকের দিকে জমি। সেখানে হোক, আশেপাশে হোক, জমি পেলে তারও ঘরবাড়ি তৈরি হবে। আমি বেঁচে থাকতে থাকতে হয়তো এই পৃথক হওয়া দেখব না। কিন্তু বুঝতে পারছি, এক আর এক থাকবে না, দুই হবে। আবার কোনদিন দুই-ও ভাঙবে...।"
সুখি আমার কাঁধের পাশে হাত দিল। নিচু গলায় বলল, "যা হবার হবে, তুমি দেখতে আসছ না। ভেবে কী লাভ, দাদা!"

এগারো

সকালে বারান্দায় বসে একটা বই পড়ছিলাম। বিভূতিভূষণের ডায়েরি। মন আছে, আবার নেই। খানিকটা চঞ্চল। একবার কলকাতার কথা মনে পড়ছে, রমুদের চিঠির কথা, আবার কীসের ঝাপটায় রমুরা উড়ে যাচ্ছে যেন, গতকালের সন্ধেটা ভেসে আসছে, উপেনবাবু এসে পড়ছেন; আবার দেখি একটা হিসেব উঁকি দিয়ে উঠছে,

আজ আর কালকের দিনটি কাটাতে পারলেই সেই কলকাতা। নিজের বাড়ি।
আকাশ উপচে পড়া রোদ, শীতের ছোঁয়ালাগা বাতাস, বুনো পাখি—কে জানে কোথা থেকে ডেকে উঠছে।
এমন সময় অনিলা এল।
পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকালাম।
অনিলা বলল, "একটা অপকর্ম হয়ে গেছে।"
"অপকর্ম! কী?"
"আপনার ধুতি ধুতে গিয়ে ফাঁসিয়ে ফেলেছে। বালতির আংটায় আটকে গিয়েছিল। মেয়েটাকে আর কী বলব! অনেকটা ছিঁড়ে গিয়েছে। সেলাই করলে পরা যাবে, কিন্তু বিশ্রী লাগবে।"
আমি হাসলাম। "তাতে কী! অমন যায়। ধুতি তো আমার আরও আছে।"
"খারাপ লাগছে।"
"ও নিয়ে খারাপ লাগার কিছু নেই তোমার। ধুতি জামা কোনওদিন ছিঁড়বে না নাকি!... বসো।"
অনিলা বসল না। বলল, "কিছু বলবেন?"
"না, সেরকম নয়। তুমি কাজে ব্যস্ত?"
"বেলা হয়ে যাচ্ছে। কাজ বাদ দিয়ে কী করব!"
"তা ঠিক।...আচ্ছা, কাল আমরা—সুখি আর আমি—ওদিকে উপেনবাবুর বাড়ি গিয়েছিলাম। চেন তো তুমি।"
"চিনি। ওনারা এখানে এলে মাঝেসাঝে এ বাড়ি আসেন।"
"এবারে পা মচকেছেন। ক্রেপ ব্যান্ডেজ জড়িয়ে বসে আছেন ভদ্রলোক।" সাধারণভাবে বললাম। "বেশ মজার লোক! তাই না?"
অনিলা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। পরে বলল, "মজার লোকদের আপনার ভাল লাগে। তাই না?"
আমি ওর গলার স্বরে সামান্য অবাক হলাম। কানে কেমন শোনাল। অনিলার এমন কথা বলার অর্থ? ওর কি ভাল লাগে না উপেনবাবুদের? নাকি, আমার দোষ হল কোথাও?
"মজার লোককে কার না ভাল লাগে, ভাই! কথা বলেন চমৎকার, চট করে অচেনা মানুষকে বন্ধুর মতন করে নেন। ঘোরপ্যাঁচ নেই। সাদাসাপটা মানুষ!" আমি বললাম, যেন খানিকটা কৈফিয়ত দেবার ঢঙে।
অনিলা বলল, "আমি ওঁদের দুজনকেই চিনি। ভালমানুষ তো ঠিকই। আচ্ছা আমি চলি।"
চলে গেল অনিলা।
আমি দেখলাম। বুঝলাম না কিছুই। সত্যি বলতে কি, সুখির বাড়িতে আসার পর আমার থাকা খাওয়া শোওয়ার বিন্দুমাত্র অসুবিধে হচ্ছে না। এমনকী এই নিরিবিলি অবস্থাটাও সয়ে গিয়েছে। কিন্তু যা আমাকে কখনও কখনও বিরক্ত করে তোলে তা অনিলার আচরণ। মহিলা আমার চেয়ে বয়েসে অনেকটাই ছোট, সুখির চেয়েও কম

ওর বয়েস। তবে অনিলা বিগত যৌবনা; প্রায় প্রবীণা। ওর এই বয়েসে খানিকটা মানসিক সুস্থিরতা আশা করা যায়।

এমন কথা বলি না যে, অনিলার ব্যবহার অভব্য। সে যে রূঢ় তাও নয়। বরং নিচু গলায় কথা বলে, কদাচিৎ তাকে একটানা কথা বলতে শুনেছি। চুপচাপ থাকাই তার স্বভাব। তবু ও কাছে থাকলে কীসের যেন বিষণ্নতা ঘনিয়ে থাকে। অনিলার এই বিমর্ষভাব আমার ভাল লাগে না। পছন্দ হয় না তার নির্জীব অস্তিত্ব। ওর সঙ্গদান বেশির ভাগ সময়েই ক্লান্তিকর।

সুখির মুখে শুনেছি, অনিলার বড়দা প্রায় অন্ধ অবস্থায় মারা যান। তিনি মারা যাবার আগে অনিলারা বুঝে নিয়েছিল, তারা নিরাশ্রয় হতে চলেছে। দু বেলার অন্ন জোটানোও মুশকিল।

অনিলার দিদি, দাদা বেঁচে থাকতেই, ডুয়ার্সের এক মেয়েস্কুলে চাকরি জুটিয়ে নিয়েছিল। ছোট জায়গা, ততোধিক ছোট স্কুল, চা-পাতার দেশ হয়েও প্রায় পরিত্যক্ত জনপদ। সুবিধে বলতে স্কুল থেকে একটা কোয়ার্টার পাওয়া গিয়েছিল, যা টিনের আর দরমার বেড়া, সামান্য কাঠকুটো দিয়ে তৈরি। কোয়ার্টারের ভাগীদার ছিল আরেক জন। এক পাশে অনিলার দিদি; অন্য পাশে স্কুলের বয়স্কা এক দিদিমণি, অবিবাহিতা।

দাদা মারা যাবার পর অনিলার দিদির এই সামান্য চাকরির ওপর ভরসা করেই দিন কাটত দুই বোনের। যৎসামান্য মাসমাইনে, একটি-দুটি বাচ্চা পড়াবার দরুন পাঁচ-সাত টাকা, আর বাড়ির গায়ে গজিয়ে ওঠা শাকপাতা, লাউ কুমড়ো, কচু খেয়ে দুই বোনের দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। বড় নির্জন, নিরিবিলি সেই জায়গা, বাতাসে শুধু কাঁচা চা-পাতা আর গাছের গন্ধ। মদেশিয়া কুলিকামিনের বসতি থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসত মদোমাতালদের ঝগড়া, হল্লা, চিৎকার।

অনিলার দিদির শিক্ষা ছিল মাঝারি। মামুলি গ্রাজুয়েট। বয়েস হয়ে গিয়েছিল পঁচিশ-ছাব্বিশের ওপর। দেখতেও ছিল মোটামুটি। ভাল ছেলে জুটিয়ে বিয়ে-থা দেবার লোক নেই কোনও। ছোড়দা ছায়া মাড়ায় না বোনদের।

ভাল একটা চাকরির জন্যে চেষ্টাও করত দিদি। কে দেবে? কেনই বা দেবে? যদি বা কোথাও যোগাযোগ হবার অবস্থা হয়, থাকার জায়গা পাওয়া যায় না। এখানে তবু বিনা ভাড়ায় থাকা যায়। ভাড়া গুনে বাইরে বোন নিয়ে থাকার মতন উপার্জন দিদির হবার উপায় নেই।

অনিলা তখন কুড়ি-বাইশ ছাড়িয়ে গিয়েছে।

দিদির কোয়ার্টারের অন্য ভাগীদার ইতিহাসের দিদিমণি পুরনো টিচার। তিরিশের বেশি বয়েস। গোলগাল দেখতে, মোটা মোটা ঠোঁট, বড় বড় চোখ, জ্বল জ্বল করত। বাড়িতে তার গায়ে কাপড় থাকল কি থাকল না গ্রাহ্য করত না। দিদিকে ডেকে নিয়ে সন্ধের পর হয় সে তাস খেলত, না হয় হাসিতামাশার গল্প। দুজনে তাস খেলার চেয়ে হাসিতামাশা, হাসতে হাসতে গড়াগড়ি দেওয়াতেই তার ঝোঁক ছিল বেশি।

ইতিহাসের দিদিমণির বাড়িতে হঠাৎ একদিন একজনের উদয়।

কে লোকটি।

মামা।

তিরিশ বছরের দিদিমণির পঁয়ত্রিশ বছরের মামা?

নিজের ঠিক নয়। একটু দূর সম্পর্কের। তাতে আর আপত্তি কী!

মামার হল ব্যবসা। কাঠের। গোলা আছে কাঠের, কাঠ চেরাই কল আছে। বাড়ি আছে খড়্গপুরে। কাঠের কারবারে শিলিগুড়ির দিকে আসতে হয় মামাকে। ডুয়ার্সেও উঁকি মারে।

দিদিকে মন্ত্র দিল ইতিহাস দিদিমণি। দিদিও তখন এলোমেলো হয়ে গিয়েছে মনের দিক থেকে। ছোট বোনের জন্যে সারাজীবন চা-বাগানের কুঠরিতে পড়ে থাকবে নাকি?

গণ্ডি কেটে জীবনকে কত দিন আটকে রাখা যায়! আর কেনই বা আটকে রাখা! এই দাগের বাইরে পা বাড়াতে না পারলে আজীবন আবদ্ধই থাকতে হবে।

দিদি বিয়ে করে ফেলল।

বিয়ের আগে একটা ব্যবস্থা করেছিল অনিলার দিদি। ছোট বোনকে নিজের চাকরিটা পাইয়ে দিয়েছিল। অবশ্য তাতে ইতিহাসদিদির হাতই ছিল বেশি। স্কুল কমিটির রায়গুপ্তবাবু ইতিহাসদিদির কথা অমান্য করতেন না।

অনিলা তখন থেকে একা।

একা কিন্তু অশান্তিতে ভুগছে।

স্কুল তার ভাল লাগত না, বাচ্চাকাচ্চা পড়ানো, তোতাপাখির বুলি আওড়ানো, ব্ল্যাক বোর্ডে খড়ি বুলোনো আর অন্যদের সঙ্গে মাথা নাড়া তার পোষাত না। বাড়িতেও সে একা। ইতিহাসদিদির রোজ রোজ নানান বায়না, মাথাটা টিপে দে, পা-কোমরে বড় ব্যথা রে, তোর দু হাত দিয়ে যত জোরে পারিস চটকে দে...। এই দেখ, বুকে একটা গুললি হয়েছে, ক্যানসার হবে নাকি!

একদিন দুদিন রাগারাগি, ঝগড়া, এমনকী ধাক্কাধাক্কি।

ইতিহাসদিদির সঙ্গে পাকাপাকি গণ্ডগোল বাঁধার আগে খবর এল দিদি আগুনে পুড়ে মারা গিয়েছে।

অনিলা বুঝতে পারল। আগে থেকেই অনুমান করছিল;—দিদির চিঠিপত্রই বুঝিয়ে দিচ্ছিল, সে কেমন আছে। কাঠগোলার জামাইবাবু কোন জাতের মানুষ। এরাই তো আজকাল ওপরে ভাসে সমাজের, এদের গোলার কাঠই বড়দের খুঁটি। কে চায় নিজের খুঁটি নিজেই উপড়ে নিতে?

অনিলার ডাকে চমক ভাঙল।

"আপনি রাগ করলেন নাকি?"

তাকালাম অনিলার দিকে। "রাগ! না রাগ করব কেন?"

অনিলা গায়ের আঁচল আরও একটু কাঁধে তুলে নিল। কয়েক মুহূর্ত চুপ। পরে বলল, "বেলা খুব বেশি হয়নি! স্নানে যাবেন?"

"যাব। ...তার আগে একটু চা খাই।"

"আপনি তো এ সময় চা খান না!"

"আজ খেতে ইচ্ছে করছে। তোমার হাত খালি আছে।"

"কী যে বলেন! আমি করে আনছি।"

অনিলা চা করে আনতে চলে গেল।

অনেক মানুষ আছে যাদের সংস্পর্শ বিরক্তিকর, অনেককে আবার মন মেনে নিতে চায় না। কেউ কেউ আচার-আচরণে চতুর, অহংকারী। ঘৃণা করার মতন লোকও আছে। অনিলাকে এর কোনওটারই মধ্যে ফেলা যায় না। সে কাছে থাকলে এমন এক বিষণ্ণতা এবং দূরত্বের পরিবেশ সৃষ্টি হয়, মনে হয় কাছাকাছি থেকেও আমরা পরস্পরকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছি। কেন? হয়তো ঠিক এই কারণেই খানিকটা বিরক্তি আসে, তবে রাগ বা ঘৃণা নয়। নিজের অক্ষমতাও অনেক সময় বিরক্তির কারণ হয়ে ওঠে। মনে মনে আমি লজ্জা পাই। ভাবি, মানুষ যেমন কোনও সংক্রামক ব্যাধির কাছাকাছি যেতে অস্বস্তি বোধ করে, আমি সেই কারণে মেয়েটির বিষণ্ণতাকে ভয় পেয়ে এড়িয়ে যেতে চাই নাকি? তার নির্জীব, নিস্পৃহ উপস্থিতি আমার পছন্দ হয় না। আমার সাংসারিক জীবনের সঙ্গে যারা জড়িয়ে আছে নিত্যদিন তারা কেউই এমন নিষ্প্রাণ নয়। ছেলেরা বউমারা, নাতিনাতনি কেউ নয়।

অনিলা ফিরে এল। চা এনেছে।

"নিন।"

চায়ের কাপ নিলাম। "বসো।"

অনিলা দাঁড়িয়ে থাকল।

তাকে দেখছিলাম। একই রকম বেশভূষা। সরু নীলপাড় সাদা শাড়ি, সাদা জামা। পায়ে চটি নেই। মাথার এলোচুল শুকিয়ে এসেছে। কপালে সেই একই রকম চন্দনের ছোট টিপ।

"তোমার হাতে কাজ আছে?"

"কাজ তো থাকেই। তবে এখন তাড়া নেই।"

"তা হলে বসো। দুটো কথা বলি।"

রোদ সিঁড়ি ছাড়িয়ে অর্ধেক বারান্দা পর্যন্ত গড়িয়ে এসেছে। বেলা হয়ে যাওয়ায় তার পক্ষে তপ্ত সিঁড়িতে বসা সম্ভব নয়। আমার চেয়ার ছায়ায় সরিয়ে এনেছিলাম আগেই। অনিলা কী ভেবে আমার কাছাকাছি মাটিতে বসে পড়ল। মেঝের ধুলোও মুছল না হাতে। মোড়ায় সে বসবে না।

অল্প সময় চুপ করে থেকে নরম গলায় বললাম, "তখন তুমি বলছিলে, মজার লোক আমার পছন্দ। উপেনবাবুকে তাই ভাল লেগেছে। রাগ করে বলছিলে?"

অনিলা আমায় দেখল। মাথা নাড়ল। "না। উপেনদার জন্যে বলিনি। ওঁরা ভালমানুষ। আমাকেও স্নেহ করেন।"

"তবে?"

"এমনি বলছিলাম। হাসিখুশি, হইহই করা মানুষকে কার না ভাল লাগে! তবে সবাই তো মজার মানুষ হয় না।"

"তা ঠিক।"

"আপনি ভাল করেই জানেন, গাছের ফলমাত্রই মিষ্টি হয় না। টকও হয়, মুখে দিলে বিস্বাদ লাগে। তবু জগতে তেমন ফলও আছে। নেই?"

"কে বলেছে নেই!... আমি কিন্তু তোমায় ভেবে কিছু বলিনি, বোন।...দেখো, আমার বয়েসের বেলা গড়িয়ে গিয়েছে। জীবনে কিছুই দেখলাম না, জানলাম না, তা তো হতে পারে না। এ-সংসারে আমাকেও অনেক বিস্বাদ, টক ফল খেতে হয়েছে। সুখির কাছে হয়তো তুমি আমার কথা কিছু শুনেছ। তা সেকথা যাক। আজ তোমার কিছু হয়েছে?"

"না। কেন?"

"সকালে আজ ফুল রাখলে না; টুলটা খালি পড়ে থাকল।"

"কাচের প্লেটটা হাত ফসকে পড়ে ভেঙে গিয়েছে।"

"ও! তা অন্য প্লেট!"

"ইচ্ছে হল না।" স্পষ্ট উত্তর।

আমি অপ্রস্তুত। অস্বস্তি বোধ করলাম। আমার মনে হল, অনিলা আর ফুল রেখে দিতে আগ্রহী নয়।

"একটা কথা জিগ্যেস করি। রাগ করবে না তো?"

"না।"

"তুমি কপালে ওই চন্দনের ফোঁটাটি পর কেন? টিপের মতন ওই ফোঁটাটি তোমার কপালে মানায় ভাল। কিন্তু পর কেন? আমি তো তোমায় পুজোটুজোও করতে দেখিনি।"

মাথার এলানো চুল আঙুল দিয়ে চিরে দিতে দিতে অনিলা বলল, "আমি একজনের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলাম।"

"দীক্ষা?" আমি যেন চমকে উঠলাম। "কার কাছে? কে তোমার গুরু?"

অনিলা যেন হাসল। অত্যন্ত ম্লান হাসি। বলল, "আমার গুরুর আশ্রম নেই, মন্দির নেই, মঠ আখড়া নেই।"

"কে তিনি?"

"আপনি জেনে কী করবেন দাদা? তিনি তো আর নেই। উনি ছিলেন রেলের সামান্য একজন কেবিনবাবু। কেবিন বোঝেন নিশ্চয়।"

কেবিনবাবু! মানে কেবিনে বসে রেলের লাইন অদলবদল করাতেন নাকি! এমন গুরুর কথা আমি জীবনে শুনিনি। অবিশ্বাস্য। "উনি, মানে তোমার গুরু কি বৈষ্ণব!"

"বৈষ্ণব। এমনি বৈষ্ণব নন। পট্ট বৈষ্ণব।"

"পট্ট বৈষ্ণব! সেটা কী?"

"আমাদের আরাধ্য শুধু ওই দেবতা, চৈতন্যপুরুষ, যিনি ভিক্ষুক, যিনি আত্মাকে দুঃখ দেন, আনন্দ দেন, বসুন্ধরার জলেস্থলে লীলাময় করে তোলেন।"

আমি বুঝলাম না। অনিলা হয়তো শিক্ষিতা কিন্তু এমন করে কথা বলতে পারে স্বপ্নেও ভাবিনি। আমাকে হতবাক বিমূঢ় করে রাখল অনিলা।

বিস্ময়ের এই ঘোর যেন আমার কাটে না। শেষে বললাম, "বড় সুন্দর করে বললে তো কথাগুলো। তোমার গুরু কি সাধক?"

"তিনি তো আর নেই। কী হবে জেনে?... মরমি যিনি তিনি সাধক ছাড়া আর কী হবেন!"

“বেশ। তা ওই চন্দনের ফোঁটাটি...।”

“আপনি কি জলে ভিজিয়ে রাখা চন্দনগাছের কাঠ দেখেছেন? আমি দেখিনি। শুনেছি যারা চন্দন কাঠের ব্যবসা করে তারা গাছ কেটে কাঠগুলো জলে ফেলে রাখে। ঘেরা জায়গায়। জলে পড়ে থাকতে থাকতে সেগুলোর গায়ের ছাল, কাঠ পচে দুর্গন্ধ বেরোয়।”

“জানি না। হতেই পারে।”

“সেই কাঠ আবার যখন জল থেকে উঠিয়ে রোদে ফেলে রেখে শুকিয়ে নেওয়া হয়—তখন কোথায় তার দুর্গন্ধ! এক টুকরো শুকনো কাঠেই চন্দনের সুগন্ধ। পাথরে ঘষলে আরও সুগন্ধ। আমার গুরু বলেছিলেন, জীবনও ওইরকম। পচা জলে ডুবিয়ে রাখলে নোংরা, রোদে আলোয় তাঁর চরণে নিবেদন করলে জীবন সুগন্ধে ভরে ওঠে।”

“ও! তোমার কপালে আঁকা চন্দনের ফোঁটাটি তবে...”

আমায় কথা শেষ করতে না দিয়ে মাথা নেড়ে অনিলা বলল, “হ্যাঁ, ওটি আমার গুরুর কথায় কপালে পরে থাকি। তাঁকে মনে করিয়ে দেয়।”

“তোমার কোনও পুজোপাঠ নেই!”

“সেভাবে নেই। গৌরাঙ্গর পটের সামনে একটি-দুটি ধূপ জ্বালা, আর ক'টি টাটকা তুলসীপাতা পটের সামনে ছোট বাটিতে রেখে দেওয়া।”

চায়ের কাপ নামিয়ে রাখলাম। অনিলা বসে আছে আসন-পা করে। রোদ আরও এগিয়ে এল। পাখি ডাকছিল।

হঠাৎ আমার কেমন ইচ্ছে হল, অনিলাকে একটা কথা জিগ্যেস করা দরকার। বললাম, “তোমায় একটা কথা বলি, রাগ কোরো না। তোমার গুরুর আমি নিন্দে করছি না। তোমারও নয়। এত জেনে বুঝে, গুরুর কথা মান্য করেও—তুমি কি শান্তিতে আছ? তোমাকে দেখলে তা মনে হয় না। মনে হয়, তুমি বড় অশান্ত চঞ্চল মন নিয়ে আছ!”

ক'মুহূর্ত অপেক্ষা করে অনিলা বলল, “আমি যে এখনও পচা জলে পড়ে আছি।”

বারো

আমরা মুখোমুখি বসে, আমি আর উপেনবাবু।

শোভাও ছিলেন এতক্ষণ। গল্পগুজব হচ্ছিল। কথার স্রোত নদীর মতন, কোন পথ দিয়ে কোথায় যে গড়িয়ে যায়। আমাদের গল্পও গড়িয়ে গড়িয়ে অনেকটা চলে যাবার পর শোভা উঠে গেলেন।

রাত বেশি হয়নি। তবু কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার চতুর্দিক কালো করে রেখেছে। শীতের হাওয়া। কুয়াশা নামছে গাছের মাথায়। ফটকের সামনে ইউক্যালিপটাস গাছের ডালপালা আর দেখা যাচ্ছে না।

সুখি এখনও আসেনি। সে আসবে রিকশা নিয়ে। দেরি আছে খানিকটা। আমার চিন্তা করার কোনও কারণ নেই।

উপেনবাবুর পায়ের ব্যথা কমেছে অনেকটা। মাঝে মাঝে তিনি পা ছড়িয়ে আরাম করে নিচ্ছিলেন।

শোভা উঠে যাবার পর একটা বিরতি এসেছিল। স্বাভাবিক।

উপেনবাবু সিগারেট ধরালেন। দিলেন আমায়। বললেন, এবার তিনি অভ্যাসমতন কিঞ্চিৎ জলপান করবেন। ভেতর থেকে কাজের লোক নিমিয়া এসে যা যা দেবার দিয়ে যাবে। তিনি খাবেন, আমি দর্শক।

ঠাট্টার কথাবার্তা হল দু-চারটি। তারপর চুপচাপ।

শেষে আমি বললাম, “আমি তো পরশুদিন ফিরে যাব। কালীপুজোর আগেই।”

“ফ্যামিলির জন্যে মন কেমন করছে?” উপেন হাসলেন।

“বাইরে তো আমি থাকি না অনেককাল। অভ্যেস নষ্ট হয়ে গিয়েছে।”

“বুঝতে পারছি।...আড্ডাটা জমতে না জমতে ভেঙে গেল মশাই।”

আমি হাসলাম। “সুখি তো আছে।”

“তা আছে। তবে ওঁর তো বাঁধা টাইম। তাও রোজ আসতে পারেন না বাবু। শালা বড় কাজের লোক।”

সুখিকে উনি নানা বিশেষণে ডাকেন সে বুঝতে পেরেছি। অথচ আমার অনুমান দুজন প্রায় সমবয়েসি হলেও উপেন বোধ হয় বয়েসে সামান্য ছোট।

কথাটা আমার মনে হচ্ছিল মাঝে মাঝেই। বললাম, “একটা কথা আমার জানতে ইচ্ছে করে।”

“বলুন?”

“এই যে আপনারা বুড়োবুড়ি এখানে পড়ে আছেন, মানে কলকাতায়; ছেলে ছেলের বউ বিদেশে, মেয়ে জামাইও এক এক জায়গায়, এসব আপনাদের ভাল লাগে!”

উপেন সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিলেন। চুপ করে থাকলেন অল্প সময়। পরে বললেন, “মিথ্যে কথা বলে লাভ নেই। ভাল লাগার কথা নয়। বিশেষ করে উনি—শোভারানির দুঃখটাই বেশি। তবে কী জানেন, আমি হা-হু করি না। করি না কারণ, প্রত্যেকটি মানুষের জীবন আলাদা, তার অ্যাটিচিউড্ আলাদা, অ্যামবিশান তার মতন। আমি তাদের দড়ি বেঁধে নিজের খোঁয়াড়ে আগলে রাখব কেন? আমার সে অধিকার নেই।”

“তবু আপনাদের এই বয়েস...”

“তাতে কী! আমরা বুড়ো হয়েছি, আমাদের বুড়ো হবার সঙ্গে ওদের জীবনের বুড়ো হবার তো কারণ নেই। ওরা যে যার নিজের মতন বাঁচুক, ইচ্ছে মতন থাকুক, ভাল থাকলে ভাল, না থাকলে সেটা ওদের দায়িত্ব। আমি সোজা কথা জানি, প্রতিটি মানুষ নিজেকে নিয়ে বাঁচে, তার বাঁচাটা তার মতন হবে।... ফিডিং বোতল মুখে গুঁজে দেবার বয়েস তারা কোন কালে পেরিয়ে এসেছে। ঠিক কি না?”

আমাকে নীরব থাকতেই হল। কী বলব? এই কথার উলটো কোনও যুক্তি আমার মাথায় এল না।

ততক্ষণে নিমিয়া এসে গিয়েছে। কাঠের সাধারণ ট্রে হাতে। নেশার বোতল, গ্লাস,

জলের পাত্র।

নিমিয়া চলে যাবার পর গ্লাসে পানীয় ঢাললেন আন্দাজ মতন, জল মিশিয়ে নিলেন। গন্ধ উঠল হুইস্কির।

"দাদা! এই একটা রস থেকে আপনি বঞ্চিত থেকে 'গুড ম্যান' হয়ে রইলেন।" ঠাট্টা করে বললেন উপেন।

হেসে ফেলে বললাম, "না। গুড ম্যান আমি নই। ওটা খাই না— এই যা!"

"এ তো দেবভোগ্য পদার্থ দাদা!" উপেন হাসতে হাসতে বললেন, গ্লাসটা তুলে নিয়ে আমায় দেখালেন একবার। "স্বর্গ থেকে আমদানি। মর্তে এর ভীষণ ডিমান্ড। কে না খায়! আপার, মিডল, লোয়ার— সব ক্লাসের লোকই বোতল টানে। কেউ বিদেশি, কেউ দেশি না হয় চুল্লু।"

আমি হাসছিলাম। উপেন তামাশা করছেন আমার সঙ্গে। তা করুন। কথাটা তো মিথ্যে নয়। এখন যে নেশা করার মাত্রা বা ঝোঁকটা অনেক বেড়ে গিয়েছে সন্দেহ নেই। আমি জানি, আমার বড় ছেলে, তার অফিসঘরে, মক্কেলরা বিদায় নেবার পর নিজের ড্রয়ার খুলে মদের বোতল বার করে। খায় অল্পস্বল্প, তারপর ওপরে আসে। বড় বউমা ছাড়া অন্যদের তখন খাওয়াদাওয়া শেষ, ঘুমোতে যাচ্ছে।

"উপেনবাবু?"

"বলুন দাদা! আপনি আমার বয়োজ্যেষ্ঠ, আজ্ঞাও করতে পারেন।"

"আমাকে কয়েকটা কথা বলুন!"

"যেমন!"

"আপনি দেখেছেন অনেক, অভিজ্ঞতাও কম নয়। আমার বয়েস আপনার চেয়ে বেশি। কিন্তু ইদানীং আমি একরকম ঘরকুনো হয়ে আছি। বাইরের জগৎ বলতে ওই খবরের কাগজ..."

"বোগাস! জগৎটা যেভাবে যত তোড়ে বয়ে যাচ্ছে তার সেই গতির কাছে খবরের কাগজের দু-দশটা খবর জলবিন্দু। কাগজ পড়ে কি আর সেটা ধরা যায়...!"

"তা সে যাই হোক, আজকালকার এই দিনগুলো আমি বুঝতে পারি না। সমাজ সভ্যতা মানুষ—আমার কাছে বড় হেঁয়ালি হয়ে যায়।"

উপেন আরও এক চুমুক খেলেন। বললেন, "এসব ভাবেন কেন? ভেবে লাভ কী! আমার অল্প বিদ্যেয় যদি আপনার চলে যায়, তা হলে বলব, 'আজকাল' চিরকালের নয়। 'ইন লিটল লাইট অ্যান্ড ন্যারো রুম, দে ইট ইট ইন দ্যা সাইলেন্ট টম্ব।' কোনও সভ্যতাই চিরদিনের নয়। বইপড়া বিদ্যে থেকে বলছি, পৃথিবীর সেই আদি মানব সভ্যতা থেকে এ-যাবৎ পঁচিশ-তিরিশটি সভ্যতা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, আবার একদিন হারিয়ে গিয়েছে। গ্রীক, রোমান, মিশরীয় থেকে এই প্রাচ্য সভ্যতা— কোনওটাই বরাবর টিকে থাকেনি। কেউ কেউ বলেন, প্রত্যেকটি সভ্যতা যেমন সৃষ্টি হয়, বেড়ে ওঠে, তেমনই সে নিজে থেকে নিঃশেষ হয়ে যায়।"

আমি উপেনবাবুকে দেখছিলাম। না, তিনি আমার সঙ্গে তামাশা করছেন না; নিজের যা বলার স্পষ্ট করেই বলছেন, আমি মানি বা না-মানি।

"কেন?" আমি বললাম।

"বলতে পারব না। সহজ জবাব হল, মানুষ যেমন জন্মায়, বড় হয়, জরায় ভোগে তারপর চোখ বোজে। এও সেই একই নিয়ম। ...গ্রীকরা একদিন কী না দিয়েছিল সভ্যতাকে, আজ ম্যাপ খুলে গ্রীস খুঁজতে হয়। রোম দিয়েছিল রক্তের ঔদ্ধত্য, বীর্য, রোমান ল! আজ বেটারা দিয়েছে মোটর গাড়ির রেস। ছো ছো!"

"আপনার মনে হয় না, আজ আমরা ক্ষয়ে যাচ্ছি!"

"না মশাই, আমি এসব নিয়ে ভাবি না। আমার ভাবনায় জগৎ চলবে! এই সভ্যতার জয় হোক, ক্ষয় হোক— আমার কিছুই আসে যায় না। আমাদের তো দিব্যি চলে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ছেলে আবার ওল্ড ফাদার মাদারকে টাকা পাঠায়। বলেছি, তোর টাকা আমায় পাঠাস কেন! আমি শালা কি ভিখিরি!... কিন্তু ওই যে গিন্নি, বলেন— ছি, ছেলে পাঠিয়েছে, অমন করে বোলো না।" উনি কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে গ্লাস শেষ করছিলেন।

"আপনি কি সত্যিই এই সময়টাকে পাত্তা দিতে চান না!"

"এই তো মুশকিলে ফেললেন। কাকে পাত্তা দেব! চাঁদে পা দিয়েছে বলে পাত্তা দেব? না, যে পেরেছে ওই অ্যাটম হাইড্রোজেন পকেট পুরে রেখেছে বলে পাত্তা দেব? উঁহু, ওসবে পাত্তা দিলে তো আদ্যিকালের মানুষ, যে-বেটা তির ধনুকটি বার করেছিল তাকেও পাত্তা দিতে হয়। আমার পক্ষে, এর কোনও জবাব বার করা সম্ভব নয়।"

"তা হলে আমাদের এই দুঃখ কষ্ট, এই যে নিজেদের আত্মা!"

"আত্মাটা কী? কোথায় থাকে?... আরে না না, আপনাকে ঠাট্টা করছি না। যতদূর মনে পড়ে, বারনার্ড শ' একটা নাটকে লিখেছিলেন, মানে নাটকের একটা চরিত্র বলেছে, গাড়ি পোষার চেয়ে আত্মা পোষার খরচটি বেশ বেশি।" উপেন হাসতে লাগলেন।

আমি অপ্রস্তুত বোধ করলাম। বিরক্তিও হচ্ছিল। বললাম, "ওসব চটকদারি কথা। শুনতে ভাল লাগে। ব্যাস!"

"আমার দাদা আত্মা নেই।"

"কী আছে?"

"মন আছে, চেতনা আছে। যদি সেটা আত্মা হয়। ও. কে।"

"আপনার চেতনা কী বলে?"

উপেনবাবু ধীরেসুস্থে দ্বিতীয় বার গ্লাস ভরে নিলেন। সিগারেট ধরালেন। তারপর বললেন, "মশাই, আমার চেতনা বলে, উপীন তুমিই তোমার পরিত্রাতা। তোমার হিসেবের খাতা তোমারই হাতে। বেশি গোঁজামিল দিয়ো না।... ওই যে সন্ত পল— সেন্ট পল— স্যালভেশানের স্বপ্ন ফেঁদে যিশুখ্রিস্টকে ডুবিয়েছেন, আমি সেই পথে হাঁটি না। যিশুর কথা ছিল, তুমি নিজেকে চেনো, নো দাইসেলফ্। আমার চেতনা বলে, মরালিটি অ্যান্ড উইল ছাড়া মানুষের আর কিছু রাখার নেই। যতদিন তুমি বেঁচে আছ, ওইদুটি স্তন থেকেও দুগ্ধ পান করবে বৎস! ...এই সভ্যতার দোষ হল, চোদ্দোআনা মানুষই ভেজাল দুধ খায়।"

মনে হল, উপেনের নেশা তাঁকে— তাঁর মনকে হয়তো সামান্য অসংলগ্ন করেছে।

কিন্তু তিনি মিথ্যা বলতে চাননি।
সুখির রিকশা আসছিল। ফটকের সামনে এসে দাঁড়াল।
"সুখি আসছে।" আমি বললাম।
উপেন সামান্য ঝুঁকে পড়ে বললেন, "আর-একটা কথা আপনাকে বলি। বৃক্ষদেবতার প্রাণ আছে, মন নেই, ইচ্ছাশক্তি নেই। জামগাছ চিরকাল জামগাছ থাকবে, আমগাছ হতে পারবে না। মানুষ নিজেকে বদলাতে পারে, দস্যু রত্নাকর হয় মহাকবি বাল্মীকি, রাজপুত্র সিদ্ধার্থ হন গৌতম বুদ্ধ, চণ্ডাশোক হতে পারেন রাজর্ষি অশোক। ...শুনুন দাদা, সভ্যতা মরে— কিন্তু তার অবশিষ্ট গুণগুলি রেখে যায়। নয়তো আমরা লোপাট হয়ে যেতাম।"
সুখি এসে পড়ল।
উপেন সামান্য জড়ানো গলায় ডাকলেন। "এসো শ্যালক। ...বসো। ...একপাত্র চলবে নাকি! ...তুমি বেটা মাল খেলে টাল হয়ে যাও বুঝি।"
সুখি হাসল।
আজ বেশিক্ষণ বসা যাবে না। রাত হচ্ছে। রিকশাটা দাঁড় করানো আছে বাইরে। দু-পাঁচটা সাধারণ কথা বলে সুখি উঠে পড়ল।
"চলি আজকে।"
"এসো। তোমার অতিথি তা হলে পরশু ফিরে যাচ্ছেন?"
"হ্যাঁ। আর রাখা গেল না।"
আমি উঠে দাঁড়িয়েছিলাম।
উপেন বললেন, "ঠিক আছে; কলকাতার লোক তো। আবার দেখা হবে।" বলে আমার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ার ভঙ্গি করলেন। "একদিন চলে যাব মশাই আপনার বাড়ি গিন্নিকে নিয়ে। ফোনটোনেও কথা হবে।...সুখিবাবুর কাছ থেকে আমি সব জেনে নেব।...আসুন তবে।"

রিকশায় পাশাপাশি বসে আমরা, আমি আর সুখি। শীত পড়েই গেল বুঝি। কুয়াশাও ঘন হচ্ছে। এদিকে ঘরবাড়ি কম। বাতির আলোর চেয়ে অন্ধকার বেশি। রেল ক্রশিং পেরিয়ে এলাম।
" সুখি!"
"বলো?"
"উপেনবাবু ভদ্রলোক কি একটু ইয়ে...! মানে সিনিক গোছের?"
সুখি আমার দিকে মুখ ফেরাল। দেখছিল আমাকে। "সিনিক! কই না। আমি সেরকম কিছু দেখিনি।... কেন?"
"আমারই ভুল। মাঝে মাঝে এমনভাবে কথা বলেন—!"
"ওটা উপেনবাবুর স্টাইল। মজাও করেন, খোঁচাও মারেন। তোমাকে থতমত খাইয়ে দেন। আদতে মানুষটি ভাল, যা মনে করেন সোজাসুজি বলে দেন। আমি অনেকদিন ধরে ওঁদের দেখছি, ওপরচালাকি একেবারেই নেই।"
"নেই হয়তো। আবার যেন মনে হল, ভদ্রলোকের মধ্যে দুঃখও নেই।"

"দুঃখটা কি বাইরে থেকে বোঝা যায়, দাদা। একটা মানুষকে বাইরে থেকে দেখে কতটা বোঝা যায়! আমরা মুখের সামনে আয়না ধরলে নিজেদের মুখ দেখতে পাই। ভেতর দেখার জন্যে কী আছে? মানুষের বেলাতেও তাই। তুমি ওঁর মুখটাই দেখেছ।"

তেরো

রোজকার মতন বাইরেই বসেছিলাম সকালে। রোদে যেন পা কোমর ডুবিয়ে রেখেছি। এই উষ্ণতা ভাল লাগছিল। বোধ হয় আমার সামান্য ঠান্ডা লেগে গিয়েছে। অল্প ব্যথা গায়ে হাতে। জ্বরো ভাব নেই, গলার কাছে খুসখুসে কাশি আসছিল এক-আধবার। হাতে আজ কোনও বই নেই। অন্যমনস্কভাবে সামনের দিকে তাকিয়ে আছি। বাড়ির পাঁচিলের ওপাশে কলকে ফুলের গাছের মাথায় একটা পাখি এসে বসে আছে অনেকক্ষণ। সামান্য তফাতে বিশাল একটা পাথর। তার গায়ে গায়ে ফুলের ঝোপ।
হঠাৎ দেখি অনিলা আমার সামনে এসে হাত বাড়িয়ে দিল।
"কী?"
"ফুল। হাতেই নিন।"
নিলাম। অল্প কয়েকটি ফুল। টাটকা। গাছ থেকে তুলে আনা।
আমার হাতে ফুল দিয়েই অনিলা আচমকা নিচু হয়ে প্রণাম করল আমায়। পা ছুঁয়ে।
অবাক হয়ে বললাম, "এ কী! প্রণাম কেন?"
"আগেও কি করিনি?"
করেছে বই কি। আমি এখানে আসার দিনই করেছে।
"করেছ! কিন্তু আজ হঠাৎ—?"
"কাল তো আপনি চলে যাচ্ছেন।"
"সে তো কাল। কালকেরটা আজই সেরে রাখলে?" আমি হাসলাম।
অনিলা কোনও জবাব দিল না।
"বসো।"
দু মুহূর্ত অপেক্ষা করে অনিলা আমার পায়ের কাছে মাটিতে বসে পড়ল।
যেভাবে ও বসে তাতে আমার অস্বস্তি হয়। কিন্তু ও যে কিছুতেই আমার সামনে মোড়ায় বসবে না। আমি আর কী করতে পারি। তবে আজ একেবারে পায়ের সামনে!
পা টেনে নিতে নিতে বললাম, "রোদ লাগবে মাথায়।"
"এখন বসি, পরে সরে বসব।"
হাতের ফুল নাকের সামনে তুলে গন্ধ নিলাম। একটি গোলাপও আছে। বৃন্তের কাঁটা আঙুলে লাগল।
"আপনি তো আর আসবেন না এখানে—!" অনিলা বলল।

"আর কি আসা হবে। এই তো কত দিন ধরে সুখি তাগাদা দিচ্ছে; এবার ধরে বেঁধে নিয়ে এল। আমার এখন অনেক বয়েস হয়ে গিয়েছে, কোথাও বেরোতে পারি না। অশক্ত শরীর, রোগব্যাধি যে একেবারে নেই, তাও নয়। তবে অনেককাল পরে বাইরে বেরোনোর জন্যে নয়, তোমাদের কাছে এসে বড় ভাল লাগল।"

অনিলা বলল, "আপনাকে আরও যত্ন করা আমার উচিত ছিল।"

"আরও—! বল কী?"

অনিলা তার পায়ের দিকের শাড়ি টেনে নিয়ে আঙুল ঢাকল। "আপনার কথা দাদার মুখে অনেক শুনেছি। পুরনো গল্প।"

"আমিও তোমার কথা শুনতাম সুখির মুখে।"

"স-ব?"

তাকালাম। অনিলা স্থিরভাবে তাকিয়ে আছে। পলক পড়ছে না চোখের। মনে হল, ওর যেন কোথাও সন্দেহ রয়েছে।

সত্যি কথাই বললাম, "অনেকটা— সবটা হয়তো নয়। সুখি যা দরকার মনে করেছে বলেছে, যা বলতে চায়নি, বলেনি।"

"তাই হবে।"

দু জনেই চুপ। অনিলা নিজের ডান হাত বুকের কাছে তুলে আঙুলের ডগা দেখছিল। অন্যমনস্ক।

আমি বললাম, "তোমায় দেখে আমি বোন খানিকটা অবাক হয়েছি। তুমি যে এত রোগা, দুর্বল— তা আন্দাজ করতে পারিনি। না, ঠিক এভাবে পারিনি। শুনেছিলাম তোমার শরীর-স্বাস্থ্য তেমন ভাল নয়। তা ভাল জায়গায়, এমন জল-হাওয়ার মধ্যে থেকেও যে কেন এমন থেকে গেলে ধরা মুশকিল। এখানে আর আমার আসা হবে না। তোমাকেও যে দেখব আবার তাও নয়। তা হলেও বলি, তোমার ভেতর হয়তো কোনও অশান্তি আছে, দুঃখ আর ক্ষোভ আছে। ওসব ভুলে যাবার চেষ্টা করো, শান্ত করো মনকে। দেখবে, ধীরে ধীরে ভাল লাগবে, ভাল থাকবে।"

অনিলা একই রকম মাথা নিচু করে বসে থাকল।

আমি রোদ থেকে কয়েক পা পিছু সরে এলাম। অনিলাকে ইশারায় বললাম, মাথা বাঁচিয়ে রোদ থেকে তফাতে আসতে।

সরে এসে, আমার পায়ের কাছেই বসল অনিলা। বলল হঠাৎ, "আমার কথা আপনি জানেন? দাদা বলেছে?"

"সব যে জানি বলতে পারব না। সুখি যা বলেছে জানি।"

"আমার বড়দার কথা সেদিন আপনাকে বলছিলাম না?"

"হ্যাঁ, শুনেছি। তোমার দিদির কথাও সুখি আমায় বলেছে। ডুয়ার্সের কোথায় যেন স্কুলে পড়াত। তুমিও থাকতে সঙ্গে। পরে তোমার দিদি বিয়ে করে খড়্গপুরে চলে আসে। তুমি তার চাকরিটা পেয়ে গিয়েছিলে।"

"জানেন তবে। দিদি যে আগুনে পুড়ে মারা যায়..."

"তাও জানি।"

"তারপর আর কী জানেন?"

"সুখি ভাসা ভাসা বলেছে, বোধ হয় পুরো বলেনি। আমি ঠিক জানিও না।"

"আমিই তা হলে বলছি।"

আমার কোলের ওপর ফুলগুলো রেখে অনিলার দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

মুখ তুলে অনিলা বলল, "দিদির আগুনে পুড়ে মরাটা আমার বিশ্বাস হয়নি। ও নিজের দোষে, অসাবধানে গায়ে আগুন ধরিয়ে ফেলেছিল, নাকি সেটা বানানো গল্প আমার সন্দেহ হত। ভীষণ সন্দেহ।... এমন সময় একটা ঘটনা ঘটল। দিদির বর— জামাইবাবু, যার নামটি বেশ, ধূর্জটি, আমায় চিঠি লিখল, শোক যেন উথলে উঠছে। চিঠির শেষে জানাল, দিদির কিছু নিজের জিনিস পড়ে আছে ওখানে— আমি যেন সময় মতন গিয়ে নিয়ে আসি।"

"আচ্ছা!"

"গা করিনি প্রথমে, পরে আমার মাথায় দুর্বুদ্ধি চাপল। চলে গেলাম ওদের ওখানে। গিয়ে দেখি, দিদির গায়ের সামান্য সোনাদানা, খুচরো ক'টা জিনিস আর একটা ইনসিয়োরেন্সের কাগজ। চাকরি করার সময় কারও তাগাদায় পড়ে অল্প ক'টা টাকার ইনসিয়োরেন্স করেছিল দিদি। হাজার চারেক টাকার। তার 'নমিনি' ছিলাম আমি। ওটা তখনও খারিজ হয়ে যায়নি।"

আমি চুপ করে শুনছিলাম। অনিলা বলে যাচ্ছিল।

ওর জামাইবাবুর হাবভাব দেখে অনিলার মনে হল, ছোট শালিকে কাছে পেয়ে যেন সে স্ত্রীর শোকে-দুঃখে আরও কাতর হয়ে উঠেছে। একদিকে আদর-যত্নের ঘটা, অন্যদিকে মনস্তাপ। শেষে তার দায়িত্ব আর কর্তব্যবুদ্ধি জেগে উঠল প্রচণ্ডভাবে। ছোট শালিকে এইভাবে সে কোথায় কোন চা বাগানের রদ্দি স্কুলে একা পড়ে থাকতে দিতে পারে না। সারাটা জীবন নষ্ট হয়ে যাবে অনিলার।

তা হলে কী করা যায়? চাকরি তো অনিলাকে করতেই হবে।

ধূর্জটি— মানে জামাইবাবু, না হয় কাঠের ব্যবসা করে, তা বলে তার কি অন্য গুণ নেই! তার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি যে কতটা জানে না অনিলা। ওর হাত ধরে কত কে তরে যায়! পুঁটি নেতারা তো কিছুই নয়, আমলা থেকে পুলিশ সবাইয়ের সঙ্গে তার গলাগলি।

আমি তোমায় এদিকেই কোথাও একটা স্কুলে চাকরি জোগাড় করে দেব। কোনও দুশ্চিন্তা কোরো না। আমার ওপর ছেড়ে দাও সব।

ক্ষমতা অবশ্যই ছিল ধূর্জটির। ওই লাইনে— বেশ খানিকটা তফাতে, একটা মেয়েস্কুলে চাকরি হয়ে গেল অনিলার। শহর নয়। পল্লিগ্রামও নয়। গঞ্জ মতন জায়গায়।

শুধু চাকরি নয় ধূর্জটি একটা একতলা কোঠাও জোগাড় করে ফেলল অনিলার জন্যে। কাজের মেয়েও পাওয়া গেল। সারাদিন থাকবে; বাড়ি চলে যাবে সন্ধেবেলায়।

অনিলা নির্বোধ নয়। সে বুঝতে পারছিল সবই। তবু ওপরে ওপরে তার নিশ্চিন্তভাব, জামাইবাবুর ওপর কৃতজ্ঞতায় মরে যাচ্ছে যেন, বেশ যত্ন খাতির, আবার আহ্লাদি ব্যবহার।

প্রথম দিকে ধূর্জটি মাসে দু-তিনবার খবর নিতে আসত শালির। ক্রমে ক্রমে সেটা

বাড়ল। তারপর যেদিন আসে সেদিন আর ফেরে না। অজুহাত একটা থাকত।

দুজনের অন্তরঙ্গতা অন্যদের চোখে কি পড়ত না! পড়ত। কিন্তু কার সাধ্য কিছু বলে। ধূর্জটির ক্ষমতা কে না জানত!

অনিলা জানত, এখন সে ধূর্জটির আশ্রিতা শুধু নয়, রক্ষিতা। উপপত্নী। তবে ধূর্জটি যে তাকে পত্নী করবে তার কোনও সম্ভাবনা নেই। এরা সেই জাতের পুরুষ যারা পত্নীর বেলায় সমাজ সম্ভ্রম, জাতবংশ, অর্থ সামর্থ্য হিসেব করে দেখে নেয়, আর উপপত্নীর বেলায় রাস্তাঘাট থেকে তুলে নেয় টপ করে। যদি কোনও ভুলচুক করে ফেলে— তবে পত্নীর অবস্থা হয় দিদির মতন।

একেবারে সারসত্য জানত, বুঝত অনিলা। কিন্তু বুঝতে দিত না, ধূর্জটির এই নোংরা, ইতর, ফুর্তির খেলাকে সে একদিন এমনভাবে থামিয়ে দেবে যে, জীবনে আর কখনও তার সুযোগ আসবে না খেলতে নামার।

একে শোধবোধ বা প্রতিহিংসার তীব্র আবেগ বলা যায়, বলা যায় মানসিক ভারহীনতা, অস্বাভাবিক ঘৃণা, উন্মত্ততা— তবু যাই বলা যাক অনিলা সেই পথেই এগিয়ে চলেছিল। নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাববার চিন্তা তার আসত না। সে হুঁশ ছিল না।

"তুমি দেখছি পাগল হয়ে গিয়েছিলে!" আমি বললাম।

"হ্যাঁ। হয়েছিলাম।"

"তারপর?"

"তারপর একদিন অনেক রাত্রে সে যখন আমার ঘর ছেড়ে উঠে..."

"তোমার কাছেই ছিল সেদিন।"

"দুপুরে এসেছিল। ছিল রাত্রে।"

"বুঝেছি।"

"ও নিজের ঘরে যাবার পর আমি বাইরে থেকে শেকল তুলে দিয়ে চলে আসতে গিয়েও ভুল হল। খানিকক্ষণ পরে, ও যখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে, ঘরের বাইরে থেকে, স্প্রে গান দিয়ে তেল ছড়ালাম। আধ বোতল, কি সিকি বোতল— বলতে পারব না। হুঁশ ছিল না। হাত পা কাঁপছিল থর থর করে। সব তখন তালগোল পাকিয়ে গিয়েছে। নিজেই জানি না কী করছি।"

আমি হতবুদ্ধি হয়ে অনিলার মুখ দেখছিলাম। ও যা বলছে, বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। অথচ অবিশ্বাসই বা কেমন করে করি।

"জানলা খোলাই ছিল।" অনিলা বলল, "মশারি টাঙানো। মশারির একটা খুঁট জানলার গরাদের সঙ্গে বাঁধা। হাওয়া দিচ্ছিল। তেল ছড়িয়ে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে মশারির দড়িতে আগুন ধরিয়ে দিলাম। আগুন ধরল দড়িতে।"

ভয়ে বিস্ময়ে আমার গলার স্বর যেন ফুটল না। আঁতকে উঠে বললাম, "সে কী! এ তো একজনকে পুড়িয়ে মারা?"

"আমি তো আগেই বলেছি, ওকে আমি পুড়িয়ে মারতেই চেয়েছিলাম।" অনিলা শক্ত স্পষ্ট গলায় বলল। "কিন্তু, ও পুড়ল না, মরল না। রাখে হরি মারে কে? আমার দেওয়া আগুন বিছানা পর্যন্ত পৌঁছোবার আগেই নিভে গেল। মশারি পর্যন্ত গেল না।

নাইলনের মশারি, একবার আগুন ধরলে...। যাক, তা হল না। যেটুকু পুড়েছিল— তার পোড়া গন্ধে ঘুম ভেঙে গেল ওর। বাইরের শেকল তোলা ছিল না দরজার। ও বাইরে বেরিয়ে এল লাফ মেরে।"

আমি আন্দাজ করছিলাম, এরপর কী হতে পারে! থানা পুলিশ আদালত খুনের মামলা। অনিলা এমন কাজ করল কেন? ওর কি একবারও ভয় হল না? পরিণাম না বোঝার মতন নির্বোধ তো ও নয়।

"তোমায় থানা পুলিশ..."

"না," মাথা নাড়ল অনিলা। "থানা পুলিশ হল না। আমিও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু ধূর্জটি অনেক চালাক। সে বুঝতে পেরেছিল, থানা পুলিশ কোর্ট কাছারি পর্যন্ত ব্যাপারটা গড়ালে তাকেও বিপদে পড়তে হবে। অবিবাহিতা একটি স্কুলের টিচারের বাড়িতে তোমার অত আসা-যাওয়া কেন? কেন তুমি সেখানে প্রায়ই যাও রাত কাটাতে! দু-চারটে মদের বোতলও যে ও বাড়িতে পাওয়া গিয়েছে! কেন! কে খেত?"

অনিলার কথা শুনতে শুনতে আমার ধন্ধ লাগছিল। সুখি আমায় এত কথা বলেনি। আমি জানতাম না। ওপর ওপর যা বলেছে— তাও ছাড় দিয়ে দিয়ে। সে ভেতরের ময়লা বেশি ঘাঁটতে চায়নি। তাতে অনিলার সম্পর্কে একটা খারাপ ধারণা আমার হতে পারে বলেই হয়তো।

"কী হল তারপর—?" আমি বললাম।

"নিজেকে বাঁচাতে ও আমাকেও বাঁচাল। তবে সেটা আইনের ফাঁস থেকে। কিন্তু অন্যদিক থেকে মরার ব্যবস্থা করে দিল। আমার চাকরি চলে গেল, কোন নিয়মে জানি না। ওর দয়ায় চাকরি, ওর কথায় খতম। ভাড়া বাড়িটাও গেল। বাড়ির মালিক আর থাকতে দেবে না।"

"আশ্চর্য!"

"আরও আছে। আমায় পথে নামিয়ে দেবার পর, ও হাত গুটিয়ে নিল না। ওর পোষা ক'টা গুন্ডা বদমায়েশকে আমার পিছনে লাগিয়ে দিল। কুকুরের মতন তারা আমাকে তাড়া করত।...আমার মতন একটা অসহায় মেয়ে দু-দশ দিনের বেশি কোথায় লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াবে!"

অবিশ্বাস করার কারণ ছিল না। কোথায় যাবে অনিলা! কে আছে তার! চা বাগানের সেই পুরনো জায়গাতেও ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। প্রথমত, সে তো অনেক দূর। আর ফিরে গেলেও কার দায় পড়েছে তাকে আদর করে টেনে নিতে! দ্বিতীয়ত পেট ভরাবার ব্যবস্থাই বা হবে কেমন করে?

অনিলা বলল, অনেক কষ্টে, এখানে ওখানে ভিক্ষে চেয়ে মাথা গুঁজে দশ-বারোটা দিন সে পালিয়ে পালিয়ে কাটাল। ছিল যেখানে সেখান থেকে দু-চারটে স্টেশন সরে এসেছিল। শেষে একটা মাঝারি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বসে আছে। বিকেল হয় হয়। হঠাৎ চোখে পড়ল, সেই পিছু-তাড়া করা দু-তিনটে গুন্ডা, শয়তান। অনিলা ভয়ে দিশেহারা হয়ে ছুটতে শুরু করল রেল লাইন দিয়ে। ছোট রেল ইয়ার্ড। পিছনে কুকুরের দল। মালগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে লাইনে। গাড়ি আড়াল করে ছুটতে ছুটতে

হঠাৎ চোখে পড়ল রেল কেবিন।
কিছু না ভেবেই অনিলা সিঁড়ি দিয়ে সোজা কেবিনের মধ্যে।
কেবিনবাবু ছিলেন ভেতরে, জনা দুই খালাসিগোছের লোক। কী হয়েছে গো? খালাসিদের নীচে পাঠালেন। নিজে দেখলেন দোতলার জানলা দিয়ে ঝুঁকে। বুঝতে অসুবিধে হল না তাঁর। গুন্ডাগুলো তখন পালাচ্ছে।
অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে অনিলা বলল, "ওই কেবিনবাবুই হলেন আমার আশ্রয়দাতা। ভরসা। বয়স্ক মানুষ। সরল মুখ। সুন্দর তাঁর হাসি। কপালে চন্দনের টিপ। গলায় তুলসীর মালা। বললেন, ভয় নেই গো, আমরা আছি।"
স্টেশনের কাছেই তাঁর রেলের কোয়ার্টার। বিধবা এক দিদি আছেন সঙ্গে। মানুষটি যেন দয়ায় মায়ায় ভরা। তাঁর স্বভাব সরল। চোখে শান্ত হাসি। বেশভূষা বলে বাড়িতে সামান্য ধুতি, গায়ে একটা চাদর। দিদিও বড় ভালমানুষ। রেল কোয়ার্টারের সবাই ভক্তি শ্রদ্ধা করে কেবিনবাবুকে।
"ওঁর পা ছুঁয়ে আমি এক দিন বললাম, আপনি আমার গুরু। ...উনি বললেন, আমি তোর গুরু হব কেন! আমার নিজেরই কোনও গুরু নেই। গৌরাঙ্গ প্রভুকে বুকে রেখেছি রে। আর জগতে যথার্থ গুরু বলতে কেউ কি আছে! তবে হ্যাঁ, যদি তোর বিশ্বাস থাকে তবে এই বিশ্বসংসারই আমাদের প্রাণের গুরু।"
"উনি না বৈষ্ণব ছিলেন?"
"সম্প্রদায় ওঁকে টানত না। উনি নিজেকে বৈষ্ণব বলতেন।"
"মানে?"
"মরম জানে যে, ধরম মানে সে।"
"ভগবান, ঈশ্বর এসব তো মানতেন?"
"উনি বলতেন, ফুলের রূপ চোখে দেখা যায় রে। তবে কেউ যদি তোকে বলে রূপ যখন চোখে দেখা যায়, তখন তার গন্ধটাও চোখে দেখাও। তাই কি হয়। গন্ধ শুধু ঘ্রাণের ইন্দ্রিয়ই অনুভব করিয়ে দেয়। চোখ দিয়ে গন্ধ দেখা— তা যে হয় না। অনুভবই তাঁকে বোঝায়। চোখ নয়, বুদ্ধি নয়, বিদ্যা নয়...।"
"উনি?"
"তিন বছর পরে উনি দেহ রাখলেন। তার আগের মাসে আশ্বিনে দিদি গিয়েছেন। কার্তিক মাসে তিনি। বলেছিলেন, আমাকে দাহ করার পর আর আমার নাম করবি না। দুঃখ করবি না মিছেমিছি। মানুষ আসে, যায়। নিয়ম।" অনিলার চোখদুটি জলে ভরে উঠল। ঠোঁট কাঁপছিল। ও আর কথা বলল না।
না বলুক অনিলা, আমি পরেরটুকু জানি। সুখি বলেছে।
হুঁশ নেই, উদ্দেশ্যও নেই, খেয়ালও করেনি, অনিলা একদিন, কেবিনবাবু বা তার গুরু দেহ রাখলে, একটা ট্রেনে উঠে পড়ল। সে জানে না কোথায় যাবে, কার কাছে যাবে, কোথায় তার আশ্রয়? পাগলের মতন প্রায় একবস্ত্রে উঠে পড়েছিল রেলগাড়িতে। আবার নেমেও পড়ল এখানে। কেন নামল সে জানে না। স্টেশন একটু বড়সড় বলে, না অনেকেই নামছিল বলে! কে জানে!
ময়লা কাপড়, এক মাথা রুক্ষ এলানো চুল, পায়ে সামান্য চটিও নেই। চোখের

দৃষ্টি ফাঁকা, কথাও বলে না।
লোকে ভাবল পাগল।
স্টেশনের বাইরে এসেও সে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর দোকান বাজার হইহট্টগোল, রিকশাঅলাদের চেঁচামেচির মধ্যে খেয়াল হল, তাকে কেউ কেউ দেখছে। পাগলি ভাবছে বোধ হয়। ভাবছে ভিখিরি।
একটা রিকশা পাশ কাটাতে গিয়ে ধাক্কা মেরে বসল অনিলাকে।
হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল অনিলা। রাস্তায়। সুখি তখন তার দোকান থেকে বেরিয়ে কাকে ডাকতে যাচ্ছিল।
অনিলাকে রাস্তায় পড়ে যেতে দেখে সে এগিয়ে গেল। লাগল নাকি? কেটে-ছিঁড়ে গিয়েছে?
হাত আর কনুই ছড়ে গিয়েছিল। কোমরেও লেগেছে।
নিজের দোকানে এনে বসাল সুখি অনিলাকে।
জল খেল অনিলা। হাত আর কনুইয়ের রক্ত ধুয়ে পরিষ্কার করল। সুখি খুচরো ওষুধ এনে দিল। ডেটল, মারকিওরোক্রম, দু-তিনটে ব্যান্ড এইড।
"কোথায় যাবে?"
অনিলা মাথা নাড়ল। তারপর কেঁদে উঠল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।
সুখিই সেদিন পথ থেকে তুলে এনেছিল অনিলাকে।
তারপর থেকে অনিলা এখানে। সুখির কাছে। তার যে অগাধ বিশ্বাস সুখির ওপর কেমন করে হল তাও বোঝা গেল না। একা থাকে সুখি। বয়েস হয়েছে। তবু সে তো পুরুষ। কোনও পরিচয়ই নেই। দ্বিধা থাকতে পারত।
অনিলার মন বলল, এ অন্য মানুষ! ধূর্জটি নয়। কেবিনবাবুই যেন অন্যভাবে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। রূপটি পালটে গিয়েছে।
না, অনিলা আর ভাবে না। তার আশ্রয়ে সে নিশ্চিন্ত।

চোখ মুছে অনিলা নিজেকে সংযত করল। এবার সে উঠে যাবে।
আমি বললাম, "তোমায় একটা কথা বলি বোন। সুখিকে আমি যতটা চিনি অতটা কেউ তাকে চেনে না। তুমি ওর কাছে আশ্রয় পেয়েছ, এটা ভাগ্য। কিন্তু শুনেছি, তুমি মাঝে মাঝে কেমন যেন হয়ে যাও। পাগলামি কর! কেন?"
"করি।"
"কেন?"
"আপনি বোঝেন না?"
"না। তবে মনে হয় নিজের ওপর তোমার রাগ হয়, বিরক্তি আসে। বা তোমার ধারণা হয় তুমি অন্যের গলগ্রহ হয়ে বেঁচে আছ।"
"রাগ নয় দাদা, তার চেয়েও বেশি হয় অনুতাপ। আমি লোভী, নিষ্ঠুর, হিংস্র কোনও দিন ছিলাম না। আমার ভয় ছিল, অন্য দশটা মেয়ের মতন নিজের শালীনতা নিয়ে বেঁচে ছিলাম। অথচ আমিই একদিন সব হারিয়ে ফেললাম। দিদি তো পুড়ে মারা গিয়েছিলই, আর তো ফিরত না। কিন্তু আমি বোকার মতন একটা প্রতিশোধ নিতে

গিয়ে সবই হারালাম। আমার সাধারণ জীবন, সরল সুখ, নীতি, পরিচ্ছন্নতা। কাকে পোড়াতে গেলাম, আর কে পুড়ল। কেউ জানুক না-জানুক, আমি তো ভেতরে ভেতরে দুর্গন্ধে ভরে থাকলাম।"

সামান্য বসে থেকে অনিলা এবার উঠে দাঁড়াল। চলে যাবে।

ও পা বাড়িয়েছিল, হঠাৎ আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল। অনিলাই বলেছিল। বললাম, "তুমি তো এখন নোংরা জলে পড়ে থাকা ভিজে চন্দন কাঠ নও যে দুর্গন্ধ ছড়াবে। তুমি বোন এখন রোদে শুকিয়ে শুকনো চন্দন কাঠ। তোমার সুগন্ধ কে ঘোচাবে আর!"

অনিলা শুনল। চলে গেল।

চৌদ্দ

কালীপুজোর দিন সকালে আচমকা ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয়ে গেল।

বেলায় আর বৃষ্টি নেই। খটখটে রোদ। আকাশ গাঢ় নীল। দু-এক টুকরো সাদা মেঘ, হালকা, পেঁজা তুলোর মতন স্তূপ হয়ে ভেসে যাচ্ছে। আকাশে চিল উড়ছে, পাখি।

কলকাতায় নিজের ঘরটিতে ফিরে এসে আমার যেন অন্য এক স্বস্তি লাগছিল। এ বড় আপনার ; এই ঘরের দেওয়াল, আসবাব, বিছানা আমার, আমাদের—। আমার সেই বিজলীর ছবিটি দেওয়াল থেকে আমাকে দেখে। তার পিতলের কৃষ্ণ বিগ্রহটি সাজানো আছে সযত্নে। বিজলীর গন্ধ নিয়েও পূর্ণ হয়ে আছে এই ঘর।

সুখি গতকাল এসেছিল আমায় নিয়ে। আবার কালই ফিরে গিয়েছে। আসা আর যাওয়া।

আমার ঘরটি এরা বিন্দুমাত্র এলোমেলো হতে দেয়নি। যেমন থাকে বরাবর সেইরকম। বরং আরও তকতকে করে রেখেছে।

কালীপুজোর সকালটা কাটল। স্নান খাওয়াদাওয়ার পর বুঝতে পারলাম, আমার কাশির ভাবটা আর নেই। ওই এক-আধবার খুসখুস করে উঠছে। হয়তো কাল যে ওষুধটা খেয়েছিলাম, আমার ধাতের ওষুধ, সেটা চমৎকার কাজ দিয়েছে। কলকাতায় এখনও শীত আসেনি। আবার গরমও নয়।

বিকেলে একবার নীচে নামলাম। বউমারা ব্যস্ত, নাতিনাতনি হললা করছে। পাড়ার পুজো বোঝা যায়, প্যান্ডেলে কে বুঝি ঢাক পিটিয়ে দিল, আচমকা মাইক বেজে উঠেই থেমে গেল। এ সবই বোধ হয় রাত্রের রিহার্সাল।

শুনলাম কালীপুজোয় এবার মধুসূদন পালিত পঞ্চাশটা কম্বল বিতরণ করবে। লটারিতে নাম ওঠানোর জন্যে প্যান্ডেলের সামনে গরিবগুর্বের প্রচণ্ড ভিড় হয়েছিল। হাতাহাতি লেগে যাওয়ার উপক্রম।

বড় নাতির কারখানা আজ বন্ধ। পর পর দুদিন। পলু— বড় নাতি এক দফা একটা শপিং ব্যাগ ভরতি করে বাজি কিনে এনেছিল কাল। আজ আবার আনল। ছোট নাতি একটা ইলেকট্রিক মিস্ত্রি ধরে এনে আলোর মালা সাজাচ্ছে। নাতনি তার দুই বন্ধু নিয়ে

ব্যস্ত। ছোট ছেলের আজ ছুটি। বড় তার নিজের অফিসঘরে বসে পাড়ার ব্লক সেক্রেটারির সঙ্গে গল্পগুজব করছে।

বড় নাতি পলু আর ছোট নাতি ছট্টুর মধ্যে একদফা খোঁচাখুচি হয়ে গেল সকালেই। দাদার বাজি কেনার পাগলামি দেখে ছট্টু বলেছিল, কী করছিস! এত বাজি! এভাবে পয়সা নষ্ট করার মানে হয়!

জবাবে পলু বলল, আর তুই যে মিস্ত্রি এনে আলোর ঝরনাধারা করছিস তাতে পয়সা নষ্ট হচ্ছে না!

তোর বাজি এক মিনিটেই ফু-স!

তোর আলো লোডশেডিং হলেই হু-স!

দু জনেই সমানে খানিকক্ষণ চালিয়ে গেল কথা কাটাকাটি। তারপর চুপ।

সকাল দুপুর এইভাবেই কাটল। বাড়ির মুখরতা, সাড়াশব্দ, হাঁকডাক। সাত-আট দিনের নির্জনতা, নীরবতার পর এ যেন আমার অভ্যস্ত জীবনকে ফিরিয়ে দিল আবার।

সন্ধেবেলায় ছাদে পায়চারি করছিলাম। অন্ধকার হয়ে গিয়েছে কখন। তবে সেটা বোঝা যাচ্ছিল না চারপাশে তাকালে। আলো জ্বালানো হয়ে গিয়েছে সব বাড়িতেই। বাকিগুলোতেও জ্বলে উঠছে একে একে। তবে এ আলোর আয়ু বড় জোর ঘণ্টা দেড়-দুই। মোমের আলো কতক্ষণ আর জ্বলতে পারে। তার আগেই বাতাসের ঝাপটায় নিভে যাবে। এক ওই টুনি বালবের আলোগুলোই জ্বলবে সারা রাত। তবে সে আর ক'টা বাড়িতে।

আমাদের এই পাড়া পঁচিশ-তিরিশ বছর আগেও কত ফাঁকা ছিল। তখনও ফাঁকা মাঠ, জলাজমি, ছোটখাটো পুকুর, শালুক ফুল, শ্যাওলা, জল-লতা দেখেছি। এখানে ওখানে মাঠে কাশফুলও ফুটত শরৎকালে। এখন সেসব কিছু নেই। বাড়ি আর বাড়ি, পাকা রাস্তায় খোঁড়াখুড়ি, কাঁচা রাস্তাও আছে এখনও। এত বাড়ি, যার যেমন ছাদ, মাথায় উঁচু কোনও বাড়ি, কোনওটা নেহাত একতলা। বাতি যেমনই জ্বলুক, চারপাশে তাকালে মনে হয়— এ যেন অনেকটা সেই সার্কাসের তাঁবুর মাথায় ঝোলানো আলোর মতন দুলছে।

ছেলেবেলার কথা মনে পড়ল। আমরা তখন মাটির প্রদীপ জ্বালাতাম। প্রদীপ কেনা হত আগেই। দিনদুই সময় হাতে রেখে প্রদীপগুলো একবার বালতির জলে ডুবিয়ে রেখে পরে শুকিয়ে নেওয়া হত। নয়তো প্রদীপের মাটি যে সব তেল শুষে নেবে। ঠাকুমা বলত, পিদ্দিম শুকিয়ে নে, তেল নষ্ট করিস না।

প্রদীপ জ্বালানো ছিল এক উত্তেজনা। আর আমাদের বাড়িও তো গায়ে গায়ে নয়। একটা এখানে তো আরেকটা ওখানে। অন্ধকারের মধ্যে আলোগুলো টিপটিপ করে জ্বলত। মাঠময় অন্ধকার, বুনো তুলসীর আর পলাশের ঝোপ। ইঞ্জিনিয়ার কস্তুরীসাহেবের বাংলোর মাথা থেকে ফটক পর্যন্ত অত আলো— তবু সেই গভীর তমসা যেন ঘুচত না।

আমার বাবার শখ ছিল চিনে লণ্ঠন বানানোর। রঙিন কাগজ, কাঠি, আঠা নিয়ে সে

কী কাণ্ড বাবার। দশ-পনেরোটা দিন বাবার ওই লণ্ঠন বানানোর নেশায় কেটে যেত।

ঠাকুমার ভয় ছিল ছুঁচোবাজিতে। আমাদের আবার ওতেই আনন্দ। মা আবার কালী পটকা ফাটালেই দৌড়ে পালাত। জেঠাইমার ভয়ডর ছিল না। উঠোনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখত সব, আর বলত, এবার একটা তুবড়ি জ্বালা তো দেখি!

"দাদা!"

তাকিয়ে দেখি রমু।

"একবার নীচে যাবে?"

"নীচে! কেন?"

"তোমাকে দিয়ে উদ্‌বোধন করানো হবে!" রমু হাসতে হাসতে আমার হাত ধরে টানল।

"কীসের উদ্‌বোধন? নীচে ..."

"ছাদে এসে বাজি পোড়ানো হবে না। বারুদ আর ধোঁয়ায় তোমার কষ্ট হবে। হাঁপ উঠবে আবার ..."

"তা আমি! আমি কি বাজি পোড়াব?"

"একটা পোড়াবে! ... তুমি না বল, ছেলেবেলায় তুমি তুবড়ি এক্সপার্ট ছিলে। নিজের হাতে তুবড়ি বাঁধতে। ফুল তুবড়ি, তারা তুবড়ি, ঝাউ তুবড়ি!"

"বাঁধতাম," আমি হাসলাম।

"তবে কাম অন ...! চলে এসো, দাদা। ডোন্ট বি নার্ভাস! আমি তোমার হাত ধরে থাকব। তুমি শুধু একটা ফুলঝুরি জ্বালিয়ে আমাদের বাজি পোড়ানোর মহোৎসবের উদ্‌বোধন করে দেবে।" হাসতে হাসতে রমু আমার গায়ে গড়িয়ে পড়ল।

"এসব কার মাথা থেকে বেরিয়েছে?"

"মাই ব্রেইন। তারপর ভোট নেওয়া হল। আমরা তিন ভাইবোন, মা কাকিমা, বাবা কাকুমণি ..., সব ভোট তোমার বাক্সে!" বলে রমু আমায় আবার টানল। "তোমার বাক্স এখন ভরতি। চলে এসো। প্লিজ দাদুমণি ...!"

হাসতে হাসতে আমি বললাম, "বাইরে কখন থেকে দুমদাম শুরু হয়ে গেছে। তোরা এখনও—!"

রমু আমার হাত ধরে নীচে নিয়ে গেল।

নীচের তলার ঢাকা বারান্দা আর সামনের জমিটুকুতে বাজি পোড়ানো হবে। ডাকাডাকির দরকার হল না। ছেলেরা, বউমারা, নাতিনাতনি দাঁড়িয়ে।

আমার হাসি পাচ্ছিল। এ এক বেশ ছেলেমানুষি খেলা মাথায় এসেছে রমুর। মেয়েটা পারেও দেখছি।

পলু একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে দিল। দিয়ে হাতখানেক লম্বা এক বড়, মোটা ফুলঝুরি বার করে রমুর হাতে দিল।

আমাদের সময়ে এত বড় ফুলঝুরি দেখিনি। লম্বায় বড়, গায়ের মশলাও পুরু। এ জিনিস এখন দেখছি।

রমু মোমবাতির জ্বলন্ত শিখায় ফুলঝুরির মুখটা ধরে রাখল।

সতীশ বলল, "কী রে জ্বলবে তো?"

শিরীষ বলল, "দাঁড়াও, এ হল রাম ফুলঝুরি, টাইম লাগবে।"

ছট্টু পলুকে খোঁচা মেরে বলল, "একটা স্টপ ওয়াচ আনলেই হত, দেখা যেত টাইমটা।"

পলু বলল, "চুপ কর। বকবক করিস না।"

ফুলঝুরি ফুলকি দিয়ে উঠল।

রমু সরে এল। "এই নাও দাদা। ধরো।"

আমি ফুলঝুরি হাতে নিলাম।

একটু পোড়ার পর ফুলঝুরির গা থেকে যেন আলো, রোশনাই, রং আর রুপোলি চুমকি ছিটকে উঠতে লাগল। বাঃ!

রমু পাশে এসে দাঁড়াল প্রায়। "দাদা, ঘোরাও ...। ঘোরাও। আরতি করার মতন ঘোরাও। দারুণ জ্বলছে।"

আমি হাত ঘোরাচ্ছিলাম। আলোয় সকলকেই দেখতে পাচ্ছি : বড় ছেলে, ছোট ছেলে, বড় বউমা, ছোট বউমা। নাতি, নাতনি।

হাত ঘোরাতে ঘোরাতে রমুর কাছাকাছি নিয়ে গেলাম আলোর শিখা। ফুলকিগুলো তারার চুমকির মতন ছড়িয়ে পড়ছে।

হঠাৎ আমার মনে হল, রমু যেন আমার সেই ঠাকুমার কাছ থেকে তারই মতন নির্মল উজ্জ্বল হাসি নিয়ে কত দূর থেকে এত কাছে এসে দাঁড়িয়েছে!

রমু নয় শুধু, একে একে ওরাও তো এল।

নাতিনাতনিরা হাততালি দিচ্ছিল।

ফুলঝুরি নিভে আসার সময় পলকের জন্যে উজ্জ্বল হল। তারপর নিভে গেল। অন্ধকার। সেই অন্ধকারে অনিলার মুখ ভেসে এল একবার, একবার উপেনবাবুর।

খুবই আশ্চর্যের কথা, আমার সেই অতীত আর এই বর্তমানের মধ্যে কেমন একটা অদৃশ্য মিলন ঘটে যাচ্ছিল।

রমু আমার গালে গাল লাগিয়ে চুমু খেয়ে বলল, "ওটা দাও সরিয়ে রাখি।"

পুড়ে যাওয়া ফুলঝুরিটা সে আমার হাত থেকে নিয়ে এল। মশলাগুলো পুড়ে কালো ছাই হয়ে গিয়েছে, শুধু লোহার সরু শিকটাই আমার হাতে ধরা ছিল।

শীত বসন্তের অতিথি

শ্রীসুকান্ত চট্টোপাধ্যায়
কল্যাণীয়েষু

শীত বসন্তের অতিথি

"নাম?"

"সুমতি।"

খাতাকলম নিয়ে বসে থাকা মাঝারি বয়েসের মেয়েটি মুখ তুলে সুমতির দিকে তাকাল, দেখল আবার। কী বলতে যাচ্ছিল বলল না, বরং শান্তভাবেই জিজ্ঞেস করল, "পুরো নাম—?"

"সুমতি বসু।"

"ঠিকানা বলুন?"

"কাঁকুলিয়া রোড", সুমতি ঠিকানা বলল, বাড়ির নম্বর।

খাতায় ঠিকানা টুকে নিতে নিতে অন্য মেয়েটি বলল, "কত দিন থাকবেন? আমাদের এখানে সাত থেকে পনেরো দিনের বেশি কাউকে রাখা হয় না। ব্যবস্থা নেই।"

সুমতি যেন জলে পড়ে গেল। এমনিতেই সে খানিকটা দ্বিধা অস্বস্তির সঙ্গে কথা বলছিল। বাধো বাধো ভাবে। মেয়েটির কথা শুনে অবাক গলায় বলল, "তবে যে শুনেছিলাম এক-দু মাসও থাকা যায়!"

খাতা থেকে মুখ তুলে মেয়েটি তাকাল। "ভুল শুনেছেন। পাশেই আমাদের আর-একটা লজ আছে। তিনটে মাত্র ছোট কটেজ। সেখানে মাস দেড়-দুই থাকা যায়। তবে তার জন্যে মধুসূদনদাদার সঙ্গে আপনাকে দেখা করতে হবে। ওগুলো আলাদা ব্যাপার। আপনি তো একা। এখানে একটা ডরমেটারি, চারটে সিঙ্গল কেবিনঘর আছে। ক'দিন থাকবেন আপনি—?"

সুমতি ইতস্তত করে বলল, "আমার সঙ্গে লোক আছে।"

"লোক?"

সুমতি ঘাড় ঘুরিয়ে ঢাকা বারান্দার দিকে তাকাল। লম্বাটে ধরনের বারান্দা। বাইরের দিকে সবুজ রং করা কাঠের জাফরি। শেষ প্রান্তে জাফরির দরজা। শীতের রোদ আসছে বারান্দায় জাফরির নকশা তুলে। সিমেন্টের মেঝেতে পড়েছে। পরিষ্কার চকচকে মেঝে। গুটি দুই পাতাবাহারি টব সাজানো বারান্দায়। লম্বা মতন একটি বেঞ্চি, পিঠ হেলান দিয়ে বসা যায়। ভেতর-বারান্দার দেওয়ালে দু-তিনটি ছোট ছোট ছবি, ফ্রেমে বাঁধানো; দেওয়ালে গাঁথা একটি আলোদানি, রাত্রে ল্যাম্প বসিয়ে রাখা হয়।

বারান্দার বেঞ্চিতে দু-তিনটি মাত্র লোক। বয়স্কা এক মহিলা, প্রবীণা, গায়ে শাল জড়ানো, মাথার চুল এলোমেলো। কপালের তলায় সাদা চুল চোখদুটি ঢেকে ফেলেছে যেন। তাঁর পাশে হাতদুয়েক তফাতে এক শীর্ণ ভদ্রলোক। গায়ে গরম

পোশাক, মাথায় টুপি। বেঞ্চির শেষ প্রান্তে নিস্পৃহ উদাস ভঙ্গিতে বসে আছে এক যুবক। মুখে দাড়ি। চোখে চশমা। হাতে একটা বাসি খবরের কাগজ। গোল করে পাকানো।

মেঝেতে হালকা বেডিং, সুটকেস, টুকরি, কিটস্ ব্যাগ ইতিউতি পড়ে আছে। একটা ভোমরা উড়ে বেড়াচ্ছিল বারান্দায়।

খাতাকলম নিয়ে বসে থাকা মেয়েটি এবার অবাক হয়ে মুখ তুলে সুমতিকে দেখল।

"কে আপনার লোক?"

সুমতি ইশারায় তার লোককে দেখাল।

"উনি! দাড়ি রয়েছে, চশমা চোখে?"

"হ্যাঁ।"

"কে উনি?"

সুমতি বিপদে পড়ে গেল। কী বলা যায় স্পষ্ট করে?

"একটু তাড়াতাড়ি করুন। ওঁরা বসে আছেন।" মেয়েটি সুমতির কপাল দেখল। সিঁথি আছে, সিঁদুর নেই। "রিলেটিভ! দাদা..."

"না না। বন্ধু...!"

"বন্ধু!...তো আপনি কী চান? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।"

সুমতি যেন দয়া ভিক্ষে করছে, মৃদু গলায়, ইতস্তত করে বলল, "আমরা একটা কটেজ পেতে পারি না?"

"কটেজ ফ্যামিলিম্যানদের জন্যে। তা ছাড়া ওটা মধুসূদনদাদার ব্যাপার।"

সুমতি অপ্রস্তুত। খোঁচা খেল যেন। 'বন্ধু' ফ্যামিলি নয় ; 'আমার স্বামী' বললে নিয়মে আসত। বিপদে পড়ে গেল সুমতি। অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকল মেয়েটির দিকে। "আমি ঠিক জানতাম না। আপনি আমায় যদি একটু সাহায্য করতে পারেন, ভাই!"

"আমার নাম রমলা। এখানে রমা বলেই ডাকে সকলে।...আপনাকে আমি কী সাহায্য করতে পারি!"

"আসলে, আমি তা হলে আপনাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে পারতাম—।"

রমা দু মুহূর্ত দেখল সুমতিকে। তারপর বলল, "আপনি তা হলে এখন একটু অপেক্ষা করুন। বসুন গিয়ে। আমি ওঁদের দুজনের সঙ্গে কাজটা সেরে নিই। ওঁরা বসে আছেন।" বলে বেঞ্চিতে বসে থাকা প্রবীণা মহিলা ও শীর্ণ ভদ্রলোককে দেখাল।

সুমতি ফিরে এসে বসল বেঞ্চিতে।

ভোমরাটা উড়তে উড়তে জাফরির গায়ে গিয়ে বসল। বাইরে কে যেন কাকে ডাকছে—নানকু—এ নানকু। জাফরির খোলা দরজা দিয়ে গাঢ় রোদ আসছিল। একটা পাতাও উড়ে এল বাতাসে।

রমা প্রবীণার সঙ্গে কথা বলছিল। মাথা নিচু করে খাতায় লিখে নিচ্ছিল যা যা লেখার।

বেশি সময় লাগল না।

তারপর শীর্ণ ভদ্রলোক উঠে গিয়ে কথা বললেন রমার সঙ্গে। উনি যেন সামান্য বিরক্ত। হয়তো এতক্ষণ অপেক্ষা করা পছন্দ হয়নি।

রমা আর সময় নিল না। একটি মেয়েকে ডাকল। লালি। শক্তসমর্থ একটি মেয়ে, মাঝবয়েসি, ভেতর থেকে সামনে এসে দাঁড়াল। লালির রং কালো। গোল মুখ, ভোঁতা নাক, বড় বড় চোখ।

প্রবীণা মহিলা ও ভদ্রলোককে যার যার জায়গায় পৌঁছে দিতে বলল রমা। "আপনারা যান। কার কোন বিছানা ব্যাগ বলে দিন ; ও পৌঁছে দেবে।"

ওঁরা চলে গেলেন।

ইশারায় সুমতিকে আবার ডাকল রমা।

সুমতি সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

"বলুন।"

সুমতি এতক্ষণ বসে বসে যেন কথা গুছিয়ে নিয়েছিল। বলল, "আমরা পাকা খবর না নিয়েই চলে এসেছি। শুনেছিলাম এখানে শরীর স্বাস্থ্য সারানোর মতন জায়গা আছে। ওই হেলথ্ রিসর্ট, মানে স্বাস্থ্য নিবাস...। এটার নাম 'শান্তি নিবাস'।"

রমা মাথা নাড়ল। "হ্যাঁ। দু-এক হপ্তার জন্যে কেউ কেউ আসেন এখানে, শরীর মন ঝরঝরে করার জন্যেই। জায়গাটা ভাল, স্বাস্থ্যকর, একটা হট্ স্প্রিং আছে, আলো-বাতাস, শীতকালটা খুবই ভাল। আমাদের এখানে দশ-বারোজনের বেশি থাকার ব্যবস্থা নেই। যাঁরা আসেন আমরা তাঁদের যথাসম্ভব যত্নে রাখার চেষ্টা করি।"

"আপনি যে কটেজের কথা বললেন—?"

"তিনটে মাত্র ছোট কটেজ! ফ্যামিলিম্যানরা থাকতে পারেন। এখন কোনও কটেজ খালি আছে কি না বলতে পারব না। মধুসূদনদাদা দেখেন ওগুলো। হয়তো একটা খালি হয়ে থাকতে পারে দু-এক দিনের মধ্যে।...কী করবেন আপনি কটেজ নিয়ে?"

সুমতি আড়ষ্ট গলায় বলল, "আমার জন্যে ঠিক নয়। আমি হয়তো সাত-আট দিন থাকব, তারপর চলে যাব। ওই, মানে উনি, আমার বন্ধু থাকবেন। মাস দেড়-দুই ওঁকে রাখতে চাই।"

"আপনার বন্ধু?"

সুমতি কথা বাড়াল না। নিচু গলায় বলল, "সত্যি কথা বলতে কী, সামাজিকভাবে আমাদের বিয়ে না হলেও আইনত হয়েছে। রেজিস্ট্রি। এমনি কপাল, তারপরই ওঁর একটা বড় অপারেশন হয়। জোর ধাক্কা খেয়েছেন। ওঁকে কোথাও মাস দুই রাখতে চাই।"

রমা সুমতিকে আবার ভাল করে লক্ষ করল। আন্দাজে মনে হয়, তিরিশের কাছাকাছি বয়েস হবে সুমতির। দেখতে সুন্দরী নয়, তবে সুশ্রী। মুখের ছাঁদটি ভাল। চোখ বড়, টানা টানা। মাথার চুলও কম নয়। এলো করে জড়ানো খোঁপা বড়ই দেখাচ্ছিল।

কৌতূহল যতই থাকুক, রমা বলল, "আপনি এক কাজ করুন। এখানে কাছেই আরও দু-তিনটে লজ আছে। লালা সাহেবের একটা, আর দুটো : 'বীণা লজ', 'পাইন

ভিলা'।...ওরা একটা-দুটো করে কামরা ভাড়া দেয়। পার্ট করে করে। আপনি ওই একটা নিয়ে নিন। অসুবিধে হবে না।"

সুমতি বলল, "ঘর ভাড়া নিলেই হল! ওকে দেখবে কে? খাওয়াদাওয়া, যত্ন?"

রমা বারান্দার দিকে তাকাল। দেখল কমলেশকে। এতটা তফাত থেকে তেমন স্পষ্ট করে মানুষটিকে দেখা যায় না। সুমতি যেন বাড়িয়ে বলছে। অন্তত এখান থেকে দেখলেও অত দুর্বল অসহায় মনে হয় না।

রমা বলল, "আমার তো কিছু করার নেই। আপনি চাইলে মধুসূদনদাদার সঙ্গে দেখা করতে পারেন। তবে তাতে লাভ হবে না। আর একটা কথা, আমরা কোনও রোগী লোককে রাখি না। দুর্বল, বেজুত মানুষ এক, আর রোগী আলাদা। রোগীকে দেখা যত্ন করার মতন ব্যবস্থা আমাদের নেই। এখানে বাইরের কোনও বাড়িতে আপনার বন্ধু—বা স্বামীকে রাখলে তফাত কিছু হবে না। খাওয়াদাওয়া নিয়ে ভাববেন না, যেখানে থাকবেন উনি—তাঁরাই একটা ব্যবস্থা করে দেবেন।"

সুমতি হতাশ হয়ে বলল, "তা হলে?"

রমার বোধহয় কষ্টই হল বলতে, তবু বলল, "আমি আর কী বলব! আপনি একবার মধুসূদনদাদার সঙ্গে দেখা করতে পারেন।"

সুমতি সোজা হয়ে দাঁড়াল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল বেঞ্চির মানুষটিকে। কমলেশ এবার এপাশে তাকাল।

চলে আসছিল সে। রমা বলল, "আপনার অন্য কোনওরকম সাহায্য দরকার হলে আমায় বলবেন, যতটা সাধ্য করব।"

মধুসূদন মানুষটি ভদ্র, নম্র। কথায়বার্তায় আন্তরিক। বয়েস হয়েছে। পঞ্চাশের ওপারেই হবে। সাজপোশাক সাধারণ। গায়ে মোটা একটি চাদর। গোল মুখ, চোখদুটি বেশিরভাগ সময়েই স্থির হয়ে থাকে, সামান্য হাসি যেন জড়িয়ে আছে চোখে। মাথার চুল ছোট ছোট।

মধুসূদন বললেন, "একটা ঘর খালি ছিল, আজই হয়েছে; কিন্তু আজকেই আবার বিকেলে, না হয় কাল সকালে লোক আসবেন। বুক করে রেখেছেন। ওটা তো দেওয়া যাবে না।"

সুমতি নিশ্বাস ফেলল বড় করে। হতাশ গলায় বলল, "বড় বিপদে পড়ে গেলাম। এখন এতটা বেলায় আর কোথায় ঘুরব!"

মধুসূদন বললেন, "বেলা সত্যিই হয়েছে। দশটা বাজে।" বলে একটু থেমে আবার বললেন, "আমি একটা পরামর্শ দেব?"

"কী?"

"আপনারা লালাসাহেব, মেজর লালার ওখানে চলে যান। উনি অত্যন্ত ভাল মানুষ। ওঁদের বাংলোয় ওঁরা মাত্র দুজন। স্বামী-স্ত্রী। দুজনেই বুড়োবুড়ি। ওনারা গেস্ট রাখেন মাঝেসাঝে। কোনও অসুবিধে হবে না।"

"মেজর লালা?"

"রিটায়ার্ড। এখন প্রায় সত্তর বয়েস। ওঁরা বাঙালি। মহিলা বড় ভাল। ওঁদের দুটি

সন্তান ছিল। ছেলেটি এয়ারফোর্সে ছিল। অ্যাক্সিডেন্টে মারা গিয়েছে। মেয়ে ক্যান্সারে। ওঁরা খুবই নিঃসঙ্গ। বাইরে থেকে সেটা বুঝতে দেন না।...আপনারা বরং ওখানে গিয়ে থাকুন। ভাল লাগবে।"

"ভাল লাগবে!"

"দুজনেই চমৎকার মানুষ।...কী ভাবছেন, ওখানে থাকলে বুড়োবুড়ির দুঃখের কথা শুনতে হবে সারাদিন!...না, একেবারেই নয়। ওঁরা অন্যরকম মানুষ।"

সুমতি বলল, "আমাদের কি থাকতে দেবেন ওঁরা?"

মধুসূদন মাথা নাড়লেন। "চট করে কাউকে গেস্ট হিসেবে রাখতে চান না ঠিকই। পছন্দ হলে রেখে দেন। তবে আপনারা যদি থাকতে চান —আমি নিজে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

সুমতি ভাবল। কমলেশের সঙ্গে একবার কথা বললে হয়। ও এখানে নেই। বাইরে রোদে রোদে গাছের ছায়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার কোনও দায় নেই, দায়িত্বও নয়। থাকার কথাও নয়। সুমতি নিজেই যা ভাবার ভেবেছে এতদিন, মাসখানেক তো অবশ্যই, তারপর জোর করে টেনে এনেছে কমলেশকে। টেনে এনেছে মানে বুঝিয়েসুঝিয়ে রাজি করিয়েই নিয়ে এসেছে। এখন তার ঘাড়ে দায়দায়িত্ব চাপানো কেন!

আজ সকালে, ভোরে, তখনও রোদ ওঠেনি ভাল করে, কুয়াশায় চারপাশ ঢেকে রয়েছে, সাদা, গাছপালার মাথা ডুবিয়ে পাতা ভিজিয়ে কুয়াশা আর সারারাতের হিম ভেসে বেড়াচ্ছে, ছোট্ট এক স্টেশনে গাড়ি এসে দাঁড়াল। প্ল্যাটফর্ম প্রায় শূন্য, তিন খুপরির অফিসঘরের একটাতে বাতি জ্বলছে। একজন মাত্র রেলবাবু বাইরে, গায়ে ওভারকোট, মাথায় কানঢাকা টুপি, গলায় মাফলার। দুজন স্টেশনের খালাসি কম্বল মুড়ি দিয়ে নড়াচড়া করছিল।

কয়েকজনমাত্র দেহাতি নামল গাড়ি থেকে, আর সুমতিরা। গাড়ি চলে গেল।

স্টেশনের বাইরে হাতকয়েকের ছোট ঘর। একটিমাত্র জানলা আর এক পাল্লার দরজা। সামান্য তফাতে হালুইকর আর চায়ের দোকান।

ঘরের মধ্যেই অন্য দুই সহযাত্রীকে দেখল সুমতিরা। ওঁরা নাকি শেষ রাত্রের গাড়িতে এসেছেন। ডাউন ট্রেনে।

কুয়াশা আর কাটে না। শাল শিশু আর নিমের গায়ে গায়ে জড়িয়ে আছে। গাছপাতা, মাটি, ঘাস, ভিজে, যেন বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে সারা রাত। বনজ গন্ধে ভরে আছে সকাল।

'চা খাবে তো?' সুমতি বলল।

'বেশি করে। যা শীত!' কমলেশ বলল।

'শুধু মাফলারে হবে না, শালটাও জড়িয়ে নাও। ঠান্ডা লাগিয়ো না।'

'চায়ের সঙ্গে দুটো-একটা বিস্কুট... , যা পাও।'

ট্রেকার পাওয়া গেল সাতটা নাগাদ। একটাই ট্রেকার এখন, সাতটার আগে যায় না।

'বিষাণগড়! আড়হাই মাইল। পাহাড় কি রাস্তা। রেট পঁচাশ...'

পঞ্চাশ টাকা! তা হোক। যাত্রী তো তারা মাত্র চারজন। আর-একজন ছোকরা আছে, আদিবাসী, মাঝপথে নেমে যাবে। তার পরনে প্যান্ট, গায়ে ডবল সোয়েটার, মাফলার, মাথায় টুপি। গলায় ঝোলানো চেনটা মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে। ক্রশটা নিশ্চয় সোয়েটারের তলায় আড়াল পড়েছে।

ট্রেকারে আসতে আসতে হাওয়ার দাপটে শরীর ঠান্ডা কনকনে হয়ে গেল। হাতের আঙুল নীল, নাকে চোখে জল।

তবু আসা হল। কিন্তু থাকার ব্যবস্থা? সুমতি যতটা পারে খোঁজখবর নিয়েই এসেছিল, ভাবেনি ঝঞ্ঝাটে পড়তে হবে! অথচ তাই হল!

সুমতি বলল, "আমি একটু কথা বলে আসি।"

মধুসূদন মাথা হেলালেন। আসুন।

বাইরে এল সুমতি। আশপাশ দেখল। কমলেশ একটা পেয়ারাগাছের তলায় বড় পাথরের ওপর বসে আছে। এতক্ষণে কিছুটা ব্যস্ত, বিরক্ত।

সুমতি এসে বলল, "শোনো, এখানে হবে না। একটা কটেজ ফাঁকা হয়েছিল, কিন্তু সেটা বুক করা আছে, যখন তখন লোক এসে পড়বে।"

"ভাল! তা হলে?"

"ভদ্রলোক অন্য একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।"

"কী ব্যবস্থা?"

"কাছেই এক ভদ্রলোক, মেজর লালার বাংলো আছে। সেখানে গেস্ট হিসেবে থাকা যায়।"

"মেজর? মানে মিলিটারি...!"

"রিটায়ার্ড। এখন বুড়ো। উনি আর ওঁর বুড়ি থাকেন বাংলোয়। ওঁরা বাঙালি। মধুসূদনবাবু বলছেন, ওঁরা খুবই ভাল মানুষ, কোনও অসুবিধে হবে না থাকতে।"

কমলেশ যেন অধৈর্য হয়ে উঠছে। ঘণ্টাখানেকের বেশি বেডিং সুটকেশ ব্যাগ সামলে বসে থাকতে হলে কতক্ষণ আর ধৈর্য রাখা যায়। দেখল সুমতিকে। বলল, "যদি তাড়িয়ে দেয়। মিলিটারি মানুষ...!"

"ইনি বলছেন, দেবেন না। ব্যবস্থা উনি নিজেই করে দেবেন সব।"

"দেবেন! বেশ, চলো...!"

"আমি তা হলে মধুসূদনবাবুকে বলি। তুমি আর একটু বসো।"

"বলো।...আমি তোমায় আগাগোড়াই বলছি, তুমি ছেলেমানুষি করছ। তুমি কানেই তুলছিলে না।"

"পরে—! পরে বলব।" বলতে বলতে সুমতি চলে গেল মধুসূদনদাদার সঙ্গে কথা বলতে।

দুই

লালাসাহেবের বাংলোটি ছোট, কিন্তু ছিমছাম। সামনের দিকে গোল ধরনের বারান্দা। বারান্দার গা-লাগিয়ে তিনটি ঘর ভেতরের দিকে। শোয়া বসার। পিছনে রান্না স্নান। আরও পিছনে বারো-পনেরো হাত তফাতে দু-কামরার আউট হাউস। বাংলো বাড়ির সঙ্গে গা-লাগিয়ে, তবু একটু যেন পৃথক।

মধুসূদনই সব ব্যবস্থা করে দিলেন। সুমতি নিশ্চিন্ত হল।

বেলা খানিকটা গড়িয়ে গিয়েছিল। তার ওপর শীতের বেলা। ঘর পেয়ে নিজেদের থাকার মতন ব্যবস্থা করে নিতে নিতে প্রায় দুপুর। স্নান করা আর হল না, কুয়ার জলে হাত মুখের ময়লা ধুয়ে মোটামুটি পরিচ্ছন্ন হতে না হতেই একটি লোক এসে ট্রে সাজিয়ে দিয়ে গেল। দুটি প্লেট। গরম ভাত, সেদ্ধ ডিম, দু চামচ মাখন, চৌকোনো প্লেটে খানিকটা স্যালাড, টম্যাটো, পেঁয়াজকুচি, লেবুর টুকরো।

গা গড়িয়ে নিতে নিতে দুপুর শেষ।

রোদ যখন মরে আসার মতন, আলো ম্লান হয়ে এসেছে, সুমতি তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। ডাকল কমলেশকে।

"কী?"

"চলো, বাইরে গিয়ে একটু দেখি। তখন ভদ্রলোককে দেখিনি। ভদ্রমহিলার সঙ্গেও ভাল করে আলাপই হয়নি।"

"বিকেল হয়ে গিয়েছে?"

"আবার কখন হবে!...তুমি এসো, আমি যাচ্ছি।"

সুমতি বাইরে এসে একবারে বাংলোর সামনে দাঁড়াল। কাঠের ফটকের দুপাশে দুটো ইউক্যালিপটাস গাছ। কত উঁচু হয়ে মাথা ছড়িয়ে দিয়েছে। শীতের বাতাসে ডালপালা দুলছিল। ফটকের এপাশে শিউলিগাছ, পৌষের হিমশিশির যেন পাতাগুলোকে নিস্তেজ করে দিয়েছে খানিকটা। মাঝে মাঝে শাখা দুলছে, পাতাও ঝরছে দুটি চারটি করে। বাংলোর চারপাশে কম্পাউন্ড ওয়াল। অনেকটাই মেরামতি করা, প্লাস্টারের তাপ্পি। বাগানে কিছু মরসুমি ফুল, কয়েকটা গোলাপ গাছ, ফুলও ফুটে আছে দু-তিনটি। করবীর ঝোপ, জবাফুলের গাছ। ডানদিকে ইঁদারা। কাছাকাছি ছোট সবজিবাগান।

বারান্দার দিকে ঘাড় ফেরাতেই এক ভদ্রলোককে দেখতে পেল সুমতি। তিনি এপাশেই তাকিয়ে আছেন। চোখাচুখি হল। সুমতি বুঝতে পারল, উনিই লালাসাহেব। ওবেলায় ভদ্রলোককে দেখেনি সুমতিরা। মধুসূদনবাবু যখন সুমতিদের নিয়ে এবাড়ি এলেন তখন লালাসাহেব স্নানে গিয়েছেন। স্নান সেরে খাওয়াদাওয়া, তারপর বিশ্রাম। মিসেস লালের সঙ্গে কথা বলে মধুসূদনবাবু সুমতিদের তাঁর হাতে গছিয়ে দিলেন। তখনই সুমতি শুনল, লালাসাহেব ঘড়ির কাঁটা মেপে চলেন। সময়ের হিসেবে গোলমাল হয় না বড় একটা। মিলিটারি ডিসিপ্লিন হয়তো। উনি আর তখন বাইরে আসেননি অতিথিদের দেখতে।

সুমতি কয়েক পা এগিয়ে গেল। লালাসাহেব বারান্দার সিঁড়িতে এসে দাঁড়ালেন।

দেখছিল সুমতি। মাথায় লম্বা। গায়ের রং ফরসা। মাথায় টাক, ঘাড় আর কানের দিকে সামান্য চুল। সাদা। মুখের আদল অনেকটাই গোল। চোখ ছোট। চোখের পাতা মোটা, ভুরু-র কয়েকটি চুল পাকা। নাক সামান্য মোটা। গোঁফ রয়েছে, পাকা। কালচে ভাব সামান্যই।

লালাসাহেবের পরনে প্যান্ট, গায়ে পুরোহাতা পুলওভার।

সুমতি নমস্কার করল।

লালাসাহেবও হাতজোড় করে প্রতি নমস্কার করলেন।

"আমরা আজ এসেছি, অনেকটা বেলায়। আপনি তখন..." সুমতি হাসিমুখে বলল।

"শুনেছি। মিসেস লালা বলেছেন।"

"তখন আর পরিচয় হয়নি। আপনি কি বেরিয়ে যাচ্ছেন কোথাও?"

"না", হাতের ঘড়ি দেখলেন, "আধঘন্টা পর। বিকেলে খানিকক্ষণ ঘোরাফেরা করি।"

সুমতি বুঝতে পারছিল না, লালাসাহেব এমন নিখুঁত বাংলা কেমন করে বলছেন। লালা পদবিটা তার শোনা নেই বাঙালিদের মধ্যে। ওঁর কথায় আড়ষ্টতা নেই, উচ্চারণে দোষ নেই। তবে দু-একটা শব্দ ঈষৎ অন্যরকম শোনায়। খেয়াল না করলে তাও কানে লাগে না। অথচ, চেহারার মধ্যে অল্প তফাত ধরা পড়ে। চোখের মণি ধূসর, চোয়ালের হাড় প্রখর। বয়েসের জন্যে মুখের চামড়া কুঁচকে আসায় প্রখর ভাবটা ঢাকা পড়ে গিয়েছে।

সুমতি হেসে বলল, "আপনি বুঝি রোজ বিকেলে খানিকটা বেড়ান?"

"দুবেলাই। সকালে ঘণ্টা দেড়েকের মতন। বিকেলে ঘণ্টাখানেক। আজকাল তাড়াতাড়ি আলো চলে যায়, অন্ধকার হয়ে আসে।"

"এখানে রাস্তায় আলো নেই, না?"

"না। বাড়িতেও কেরোসিন ল্যাম্প। পাইন ভিলায় ওরা জেনারেটার এনেছিল। খারাপ হয়ে পড়ে আছে।"

এমন সময় কমলেশকে দেখা গেল।

সুমতি হাতের ইশারায় ডাকল তাকে। পরনে পাজামা, গায়ে পাঞ্জাবি, গরম একটা চাদর আলগা করে গায়ে জড়ানো।

কমলেশ কাছে এল।

সুমতি আলাপ করিয়ে দিল। "লালাসাহেব।"

কমলেশ হাত বাড়াতে যাচ্ছিল, কী ভেবে নমস্কার জানাল।

সুমতি কমলেশকে দেখাল। "কমলেশ।"

"কমলেশ!...কমল মুখার্জি নামে আমার এক বন্ধু ছিল। ক্লাসমেট। পরে ও চেস্ট স্পেশ্যালিস্ট হিসেবে নাম করেছিল। কলকাতায় প্র্যাকটিশ করত। ও, লাস্টলি পণ্ডিচেরী চলে যায়। প্রফেশান ছাড়েনি।"

সুমতি বলল, "আপনি কলকাতায় পড়তেন?"

"বাঃ, আমি চন্দননগরের লোক। এঞ্জিনিয়ারিং পড়েছি শিবপুরে। দু-তিন ডজন

বন্ধু ছিল কলকাতায়। আমার কলেজ কেরিয়ার হোপলেসলি ব্যাড।" লালাসাহেব হাসলেন। "ফর্টিজ ফিফটির মাঝামাঝি সময়ে একটা ডাক পেয়ে গেলাম আর্মিতে। কমিশনড়...। নট এ ডিফিকাল্ট জব...।" লালাসাহেব হাসিমুখে কথা বলতে বলতে আবার ঘড়ি দেখলেন হাতের। "ওয়েল, সন্ধেবেলায় কথা হবে। এখন আমি একবার বেরুব।" বলতে বলতে ঘরের দিকে চলে গেলেন।

সুমতি আর কমলেশ দাঁড়িয়ে থাকল।

"চন্দননগরের লোক?" কমলেশ বলল।

"তাই তো বললেন।"

"আমি অন্যরকম ভেবেছিলাম। দিল্লির ওদিককার হবে। তবে কলকাতায় দেদার না হলেও বেশ কিছু লালা পাওয়া যাবে। মস্টলি বিজনেস করে।"

"স্ত্রী শ্রীরামপুরের। নামটিও বেশ। ইন্দিরা। কী ভাল দেখতে। একেবারে যেন মাসিপিসি।"

হালকা পায়ে হাঁটছিল দুজনে। সুমতি বাংলোবাড়ির গাছপালা বাগান দেখাতে দেখাতে বলল, "সাজানো তকতকে বাগান নয়, তবু মোটামুটি পরিষ্কার। সাহেব নিজেই বোধহয় বাগান দেখেন।"

"ইউক্যালিপটাস গাছদুটো কেমন দুলছে দেখেছ?"

"শীতের হাওয়া...!"

কমলেশ আকাশের দিকে তাকাল। রং পালটে গিয়েছে আকাশের। নীল ক্রমশই হালকা হতে হতে ছায়া-জড়ানো, সূর্য এখনও ডুবে যায়নি। মরা আলোর তলায় অপরাহ্ণ ভেসে বেড়াচ্ছে যেন। পাখি গেল একঝাঁক। আকাশের পশ্চিমে গোধূলির লালচে ভাব।

"তুমি সব খুলে বলেছ?" কমলেশ বলল।

"স-ব বলার সময় হল কখন! বলব। যেটুকু বলার বলেছি।"

"ওই মধুসূদনবাবু—!"

"উনিই তো ব্যবস্থা করে দিলেন।"

"নিজেদের কটেজ তো দিলেন না?"

"সম্ভব ছিল না। বুকিং করা আছে অন্য লোকের।"

কমলেশ সুমতির দিকে তাকাল। দেখল দু পলক। বলল, "নাকি অন্য কিছু ভাবলেন!"

সুমতি অখুশি হল। "কী বলছ? ভদ্রলোক আমাদের সাহায্য করলেন, ভাল ব্যবস্থা করে দিলেন!"

"তা করলেন। তবে নিজের বেলায় একটু খুঁতখুঁতে ভাব রইল। তাই না? তুমি যদি দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে সিঁথির কোথাও একটু সিঁদুরের ছোঁয়া লাগিয়ে নিতে—উনি বোধহয়..."

"জানি না। অন্যের কথা ভেবে তোমার লাভ নেই। নিজের কথা ভাবো। আমার তো মনে হয় মধুসূদনবাবু ভাল ব্যবস্থাই করে দিয়েছেন। ওঁদের ওই কটেজের চেয়ে লালাসাহেবের বাড়িতে গেস্ট হয়ে থাকা অনেক ভাল। তুমি এখানে যত্ন পাবে, সঙ্গী

পাবে, স্নেহ পাবে।"
"দেখি।"
"আমিও নিশ্চিন্তে থাকতে পারব।"
"কবে ফিরে যাচ্ছ তুমি?"
"আগামী হপ্তায়। সাত দিনের ছুটি আমার। কাল আজ দুটো দিন তো কেটেই গেল।"
পায়ের শব্দ পিছনে। লালাসাহেব আসছেন। একই পোশাক। বাড়তির মধ্যে গলায় মাফলার, হাতে বেতের মোটা ছড়ি, টর্চ, আর টুপি। টুপিটা হাতেই আছে, মাথায় দেননি তখনও। গোর্খা টুপি। গরম কাপড়ের। পায়ে মোটা ক্যানভাস শু।
সুমতি হাসল। "বেড়াতে চললেন!"
"ঘুরে আসি।...সন্ধেবেলায় একসঙ্গে বসা যাবে।" যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়ালেন, হাতের ছড়ি তুলে পশ্চিমের কম্পাউন্ড ওয়ালের দিকে একটা গাছ দেখালেন। ঝাউগাছের মতন দেখতে। তবে ডালগুলো দু'পাশে ছড়ানো। দুটি করে ডাল। নিচের ডাল বড়, ওপরের ডাল ছোট হয়েছে ক্রমশ। পাতায় ভরা। শীতের হাওয়ায় মাথার দিকের ডাল কাঁপছে। অনেকটা ক্রিসমাস ট্রি-র মতন দেখতে।
"ওই গাছটা চেন?" লালাসাহেব বললেন।
"ঝাউয়ের মতন দেখতে।"
"হ্যাঁ, তবে ঝাউ নয়। চলতি কথায় বলে, ওয়েলকাম ট্রি। বটানিক্যাল নাম আমি জানি না।...যাই ঘুরে আসি।" লালাসাহেব ফটকের দিকে এগিয়ে গেলেন।
সুমতিরা দাঁড়িয়ে থাকল। বুঝতে পারল না, লালাসাহেব তাদের সঙ্গে হাসিতামাশা করে গাছের নামটা বললেন কিনা।
এবার দমকা বাতাস এল উত্তরের। মনে হল, দুপুরের আলস্য কাটিয়ে পৌষের বাতাস আবার শনশন করে বইতে শুরু করবে। আকাশের রং আরও ঝাপসা। এখন আর দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়। ঠান্ডা পড়তে শুরু করেছে। গরম পোশাক পালটে নেওয়া দরকার। সুমতির গায়ে মামুলি চাদর, নামেই শাল। কমলেশেরও প্রায় তাই।
"চলো, কাপড়চোপড় পালটে নিই, "সুমতি বলল, "ঠান্ডা পড়তে শুরু করেছে।"
ফিরতে গিয়ে ইন্দিরার সঙ্গে মুখোমুখি। উনি বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন। হালকা রঙের ফুলের ছাপতোলা সাদাটে শাড়ি। গায়ে ফ্ল্যানেলের ব্লাউজ। কালচে রঙের শাল। পায়ে মোজা, চটি।
মহিলার গড়ন ঈষৎ স্থূল, শিথিল। অত্যন্ত নমনীয়, কোমল দেখায়। মুখটির ছাঁদ গোল, ফোলা ফোলা। বয়েসের শিথিলতা অবশ্য লক্ষ করা যায়। নরম, সরল দুটি চোখ। বড় বড় চোখের পাতা। থুতনিটা অত্যন্ত সুন্দর। ডান গালে বড় একটি আঁচিল। মাথার চুল সবই সাদা। কাঁধের কাছে কোনওরকমে জড়ানো একটি ছোট আলগা খোঁপা।
"তোমরা এখানে! ঘরে চা দিয়েছে। যাও খেয়ে নাও।"
"পায়চারি করছিলাম", সুমতি বলল হাসিমুখে।
"চা ঠান্ডা হয়ে যাবে। আগে খেয়ে নাও। সাহেব বেড়িয়ে ফিরে এলে আবার বসব

আমরা একসঙ্গে।"
"আপনি আসুন না!"
"আমি দু-চার পা হাঁটি বাগানে। হাঁটুতে বাত ধরেছে। দেখছ না, খোঁড়াচ্ছি!"
সুমতি হাসল। "কোথায় খোঁড়াচ্ছেন! অমন একটু-আধটু আমরাও খোঁড়াই!"
"তোমাদের কী বয়েস যে খোঁড়াবে!" ইন্দিরা বললেন, "আমার বয়েস কত জান?"
"ক-ত! ষাট!"
"বাষট্টি।"
"ওঁর?"
"সাহেব আমার মাথার ওপর প্রায় আট বছর বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, সত্তর ধরল।" হাসলেন ইন্দিরা। তাঁর গালের তিলের পাশে টোল পড়ার মতন একটু ভাঁজ পড়ল। বোঝা গেল, একসময়ে মহিলার অমন ধবধবে ফরসা গালে সুন্দর টোল পড়ত।
"আপনি—" কী যেন বলতে যাচ্ছিল সুমতি, তার আগেই মাথা নেড়ে কথা থামিয়ে দিলেন ইন্দিরা। তাড়া দিলেন। "যাও যাও, আগে ঘরে গিয়ে চা খেয়ে নাও। আর শোনো, এখানকার ঠান্ডা তোমরা জানো না। বেলা ফুরোলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। গরম জামাটামা পরে নিও। ঠান্ডা লেগে যাবে।"
সুমতিরা আর দাঁড়াল না। রোদ আলো মরে যাবার পর পরই যে জঙ্গলের বাতাস উত্তরের হাওয়ার সঙ্গে শীত বয়ে আনছে বোঝা যাচ্ছিল। তা ছাড়া আজ সকালে ট্রেন থেকে নামার পরই বুঝে নিয়েছে, এখানের শীত কেমন তীব্র।

সুমতির ঘরে ছোট টেবিলের ওপর চা দেওয়া ছিল। ছোট একটা ট্রে। মাঝারি টি-পট, দুটি কাপ প্লেট। চামচ। কাচের ছোট বাটিতে বাড়তি চিনি—যদি লাগে।
ঘর এতক্ষণে অন্ধকার হয়ে আসার মতন। জানলা বন্ধ। দরজা খোলা। জানলা সুমতিই বন্ধ করে দিয়েছিল ঘুম ভাঙার পর। সে যে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিল দুপুরে তা নয়, তবে ট্রেনের রাত জাগা, সকালের ধকল, খানিকটা দুর্ভাবনার পর ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। উদ্বেগের মানসিক ক্লান্তি তো থাকবেই। গভীর ঘুম নয়, ছাড়া ছাড়া ঘুমের মধ্যে ভাঙাচোরা স্বপ্নও দেখল। কাঁকুলিয়ার বাড়ি, অফিসের অমর দত্ত, লিফট্, হাওড়া স্টেশন..., স্পষ্ট করে কিছুই দেখল না, টুকরো টুকরো দৃশ্য, যেন ঘূর্ণির মধ্যে ধুলোবালি খড়কুটো ছেঁড়া কাগজ পাক খেতে খেতে মিলিয়ে যাচ্ছে।
ঘুম ভাঙার পর সুমতি অনুভব করল, জানলা দিয়ে হাওয়া আসছে শীতের, আলোও অত্যন্ত ম্লান। জানলা বন্ধ করে দিল সে।
কমলেশ নিজেই চা ঢালছিল। দেখছিল সুমতি। ঢালছে যখন ঢালুক। ওর হাত কাঁপছে না। আঙুলগুলোও শক্ত করে ধরেছে। মাসখানেক আগে হলে কমলেশের হাত কাঁপত। দুর্বলতার জন্যে।
"নাও", কমলেশ একটা কাপ এগিয়ে দিল।
চা নিয়ে মুখে দিল সুমতি। টি-পটে চা দিল, তবু ঠান্ডা হয়ে এসেছে। দোষ

তাদেরই, আসতে দেরি করে ফেলল।

"এখানে তুমি ভালই থাকবে", সুমতি বলল।

"দেখা যাক।"

"এঁরা মানুষ ভাল। অন্য কোনও ঝঞ্ঝাট নেই। বুড়োবুড়ি। মিসেস লালা তোমায় যত্ন করবেন। মুখ দেখলেই বোঝা যায়, মায়ামমতা খুব...।"

কমলেশ চা খেতে খেতে বলল, "কীরকম টাকা লাগবে?"

"টা-কা! টাকার কথা হয়নি।" সুমতি কমলেশের মুখ দেখতে দেখতে বলল।

"বলে নিলে পারতে। আউট হাউসের ভাড়া, খাওয়াদাওয়া..."

"মধুসূদনবাবুকে আমি বলেছিলাম। উনি বললেন, পরে হবে। টাকার কথা আগে তুললে মহিলা অসন্তুষ্ট হবেন। হয়তো না করে দেবেন। এঁরা ঠিক টাকার জন্যে গেস্ট রাখেন না। প্রয়োজন হয় না সাহেবদের।"

"তবু—!"

"মধুসূদনবাবুই একসময়ে কথা বলে নেবেন।"

কমলেশ গলা পরিষ্কার করার মতন শব্দ করল। ঘাড় তুলল, নামাল। পিঠ সোজা করার চেষ্টা করে আবার সামান্য নুয়ে পড়ল। পিঠ পুরোপুরি টান করতে গেলে পেটে লাগে এখনও।

সুমতি দেখছিল। জামাটামা পরে থাকলে কমলেশকে এখন অতটা শীর্ণ মনে হয় না। তবে মুখ দেখলে অনুমান করা যায়, সজীবভাব এখনও আসেনি। চোখ অনুজ্জ্বল, দাড়ি থাকার জন্যে গালের শুষ্কতা ধরা যায় না, কপালে দাগ আছে দু-তিনটি, ঠোঁট সাদাটে, গলার কণ্ঠা উঁচু হয়ে রয়েছে।

এক দেড় বছর আগে দেখলেও কমলেশকে কেউ রুগ্ণ বলত না। তখন সে চেহারায় সুপুরুষ না হলেও, একেবারে সাধারণ, চোখে না-পড়ার মতন দেখতে ছিল না। মাথায় লম্বা, ছিপছিপে গড়ন, কাটাকাটা মুখ, দৃঢ় অথচ নি-রুক্ষ, শক্ত চিবুক। কপাল বড়। মাথার চুল লম্বা, ঘন, কালো।

কমলেশের সামনের দাঁত সামান্য বেঁকা ছিল, কিন্তু তার হাসি ছিল সরল। আবার এক এক সময়ে হঠাৎ বিরক্তি বড় বিসদৃশভাবে চোখে পড়ত। হয়তো কোনও কারণে সে তখন ধৈর্যহীন হয়ে পড়ত।...সুমতি কিছু বলত না, কিন্তু লক্ষ করত। সেই মানুষটি আজ কেমন নিস্পৃহ উদাসীন হয়ে উঠেছে। পুরোপুরি নয় হয়তো, তবু অনেকটাই।

কমলেশ চায়ের কাপ নামিয়ে রাখল। "আমি দীপককে বলে এসেছি, ও তোমায় কিছু টাকা দিয়ে যাবে মাসে মাসে।"

"টাকার জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না", সুমতি বলল।

"প্রথম থেকেই তুমি ব্যাপারটা এড়িয়ে যাচ্ছ! কেন? তোমার একার পক্ষে আর কত টাকা খরচ করা সম্ভব!"

"আমি একা কোথায় খরচ করলাম! তুমিও তো..."

"এখানে কতদিন থাকতে হবে?"

"মাস দুই তো থাকো। তারপর...!"

"তুমি প্রথমে দু মাসই বলেছিলে! এখন আর বাড়াবে না। ডাক্তারদের মতন ছেলে

ভোলানো কথা বলবে না।"

সুমতি হেসে ফেলল।

"হাসছ কেন! আমি দু মাসের বেশি থাকব না।"

"আজই তো এলে, এখন থেকে মাসের হিসেব—!"

"না, তোমায় বলে রাখলুম।"

"বেশ। নাও, ওঠো। জামাটামা বদলে নাও। আমি চায়ের বাসনগুলো দিয়ে আসি।"

সুমতি উঠেপড়ে চায়ের বাসন গোছাতে লাগল। এ-বাড়ির কাজের লোক পলুয়া। জোয়ান বয়েস। তিরিশ হবে। সাহেবের কাছে আট-দশ বছর রয়েছে। ঘরের কাজ, খুচরো কাজকর্ম সবই সে করে। তার কোন এক দিদি আছে সে ঘরদোর মোছা, বাসন মাজার জন্যে আসে একবেলা। বিকেলে তার ছুটি। রান্না সামলায় সাথিয়া।

সুমতি উঠে পড়েছিল, হঠাৎ কমলেশ বলল, "তুমি কিন্তু এঁদের কাছে আমার কথা কিছু লুকোবে না। কোনও কারণেই নয়।" সুমতি দাঁড়িয়ে পড়ল, শুনল কথাটা।

তিন

বসার ঘরের সামনের দিকটি আধাআধি গোল। দুটি জানলা সামনের দিকে। ঘরের মাঝামাঝি দরজা। দরজা খুললেই বাইরের বারান্দা। জানলা দরজা এখন বন্ধ। ঘরের ভেতর দিকের দরজা খোলা। পিছনের ঘরটি খাবার ঘর। লালাসাহেবের বাড়ির ধরনটিই বাংলো বাড়ির মতন। দুটি শোবার ঘর, বসার ঘরের দু'পাশে ; খাবার ঘর পিছনে। রান্নাবান্নার ব্যবস্থা একেবারে প্যাসেজের শেষপ্রান্তে।

সন্ধেবেলার চা খাওয়া হয়েছে একসঙ্গে বসে খাবার ঘরে, গোল টেবিল ঘিরে বসে। নিজের হাতেই চা দিয়েছেন ইন্দিরা, সঙ্গে কড়াইশুঁটি সেদ্ধ, পিঁয়াজ আর টম্যাটোর কুচি মেশানো, লাল আটার পাঁউরুটি। এখানকার এক রুটিঅলার, বাড়িতেই তৈরি করে।

চা খাওয়া শেষ করে গল্প করতে করতে বসার ঘরে এসে বসলেন লালাসাহেব। কমলেশ এক পাশে, অন্য পাশে ইন্দিরা আর সুমতি।

বাইরে যে এখন শীত আর হাওয়া বেড়েছে ঘরে বসেই বোঝা যায়। হাওয়ার ঝাপটায় কখনও সখনও দরজা জানলা নড়ে উঠছিল। মনে হয়, কেউ বুঝি বাইরে থেকে নাড়া দিয়ে পালিয়ে গেল।

ঘরে একটিমাত্র আলো। কেরোসিনের টেবল্ ল্যাম্প। পুরনো আমলের। দেখতে বাহারি, তবে আলো বিশেষ ছড়ায় না।

কমলেশরা আগে এ-ঘরে আসেনি ; দেখেওনি। এখন দেখছিল। সোফা, আর্ম চেয়ার, সেন্টার টেবিল, একটা উঁচু গোল হালকা স্ট্যান্ড এককোণে, ফুলদানি, কাঠের আলমারি, পাল্লার গোটাটাই কাচ-লাগানো। গোছানো বই। ওপর তাকে দু-চারটে শখের সাজানো সামগ্রী। দেওয়ালে চার-পাঁচটি ছবি। তিনটি ফটোগ্রাফ, পারিবারিক অন্য দুটির মধ্যে একটি যিশুখ্রিস্টের, অন্যটি কোনও পার্বত্য অঞ্চলের প্রাকৃতিক

দৃশ্য। পাহাড় থেকে ঝরনাধারা নেমে এসেছে।

সুমতি বলল, "আপনারা এখানে অনেক দিন আছেন?"

ইন্দিরা বললেন, "তা আছি। জীবনের প্রায় অর্ধেকটাই কেটে গেল এখানে।" বলে স্বামীকে দেখালেন।

লালাসাহেব বললেন, "এসেছিলাম যখন তখন বুঝিনি বাকি জীবনটা এখানেই কাটিয়ে যেতে হবে!" উনি হাসলেন হালকাভাবে। "চোরা বালিতে পা আটকে যায় শুনেছ তো?...এই দেখো, আবার তোমায় তুমি বললাম...।"

"বা, তুমি বলবেন না তো আবার কী বলবেন! আমরা আপনার ছেলেমেয়ের বয়েসি।"

লালাসাহেব তাকিয়ে তাকিয়ে সুমতিকে দেখলেন। হাসির প্রসন্ন ভাবটা কেমন ম্লান হয়ে এল। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপর আবার সেই হাসিহাসি মুখ। হঠাৎ তাঁর গল্প বলার ঝোঁক এসে গেল যেন।

"এখানকার গল্প শুনবে?"

"বলুন না।"

"এখানকার রেলস্টেশন দেখেছ তো! আজ তবু ওটা রেলওয়ে স্টেশন বলে মনে হয়। আগে ওটার চেহারা ছিল হল্ট-এর মতন। ওখান থেকে আবার এক সাইডিং লাইন ছিল। স্টেশন থেকে আধ মাইলটাক। ওখানে একটা প্রিজন্ ক্যাম্প। লাস্ট ওয়ারের সময়। একপাশে ক্যাম্প, অন্যপাশে ছোট হসপিটাল। প্রিজনারদের জন্যে। মোটা মোটা শালের খুঁটি, কোথাও কোথাও লোহার পোস্ট, দু-তিন দফা কাঁটাতারের আট-দশ ফুট সমান উঁচু বেড়া, ভেতরে ব্যারাক, চারপাশে ওয়াচ টাওয়ার, জেনারেটার চালানো হত রাত্রে। আমি তখন কোথায়! এর ধারেকাছেও নেই। কলেজ শুরু করব।... তারপর একদিন ক্যাম্প উঠে গেল, যাওয়ারই কথা। ওখানে আর্মির যত ভাঙা ট্রাক, অচল জিপ, লোহালক্কড়ের ডাম্পিং হতে শুরু করল। ডিজপোজাল সেন্টার। শেষে সেটাও উঠে গেল। এখনও যদি যাও—ক্যাম্পের কিছু দেখতে না পেলেও জঙ্গলের মাঠে ভাঙাচোরা লোহালক্কড় দেখতে পাবে। পড়ে আছে।"

কমলেশ বলল, "সকালে এত কুয়াশা ছিল আমরা কিছু দেখতে পাইনি।"

"না জানলে জায়গাটা লোকেট করা মুশকিল।"

"স্টেশনটা তখনই তৈরি? মানে এখন যেমন আছে?" সুমতি বলল।

"হ্যাঁ। তখন এখানে ট্রেনের আসা-যাওয়া বেড়ে যায়। গাড়ির রাস্তাও তৈরি করতে হয়। স্টেশনের সামনে যে লোকজনের বসতি, হাটবাজার যেটুকু দেখলে—সবই তখন পত্তন হয় বলতে পার।" একটু থেমে যেন পুরনো দৃশ্যটা দেখে নিলেন। বললেন, "আমি যখন এসেছি—তখন এখানে একটা ডিপো তৈরি হচ্ছে। আর্মির। সেটাও লাস্টলি উঠিয়ে নেওয়া হল।"

"আপনাদের এই জায়গাটা তো স্টেশন থেকে অনেকটা দূরে।"

"মোটরের রাস্তা ধরে আসতে হলে খানিকটা দূর। পাহাড়ি পাকা রাস্তার অসুবিধে হল, সরাসরি পথ পাওয়া যায় না, অবস্ট্রাকশানের দরুন অকারণ ঘুরতে হয়। তুমি যদি এখান থেকে হাঁটা পথে যাও—অনেক শর্টকাট হবে স্টেশন। দেড় মাইল।"

ইন্দিরা বললেন, "এখানকার লোকজন হাঁটাপথেই যায়। হাটবাজার, এটা আনো, ওটা আনো, হেঁটে হেঁটেই যাচ্ছে, বড়জোর সাইকেল। আমাদের অভ্যেস হয়ে গিয়েছে, অসুবিধে হয় না। খুব বেশি দরকার পড়লে ফিরতি ট্রেকারের জন্যে অপেক্ষা করি।...আর মধুসূদনবাবুদের ওখানে প্রায়ই এ-বেলা ও-বেলা ট্রেকার আসে। আসলে থাকতে থাকতে সবই অভ্যেস হয়ে যায়।"

কমলেশ বলল, লালাসাহেবকে, "আচ্ছা, স্টেশনের কাছে আপনারা থাকতে পারতেন না? এতটা তফাতে চলে এলেন? ওদিকে বাড়ি করা যেত না?"

লালাসাহেব মাথা নাড়লেন। পরে যা বললেন তা থেকে মনে হল, একেবারে গোড়ার দিকে সেটা সম্ভব ছিল না। ক্যাম্পের জন্যে ওদিকে পাকাপাকি থাকার সুযোগ ছিল না। ডিপো তৈরির সময় তাঁরা অফিস, অফিস কোয়ার্টার্স বানিয়ে ছিলেন। অবশ্য সেগুলো খানিকটা টেম্পরারি। সেটাও উঠিয়ে নেওয়া হল।...এসব কর্তাদের মাথায় আসে। রিজার্ভ অ্যামিউনেশান ডিপো হবে বলে কাজ শুরু হল। শেষে অ্যাবানডান, মানে বাতিল। হাঙ্গামা মিটে যাবার আগেই এপাশে দু-একটা বাড়ি তৈরি হয়। সস্তা জমি, জলের দরে ভাল কাঠকুটো, যে যার মতন ইটভাটি করে ইট পুড়িয়ে নিত—বাড়ি বানিয়ে ফেলল। জায়গাটা স্বাস্থ্যকর। নির্জন। 'মেরি কটেজ' প্রথম বাড়ি। এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সাহেব করেছিল। তার দেখাদেখি 'ইভলিন লজ', সেটাও ওর এক জাতভাইয়ের। ওরা বোধহয় ঠিক করেছিল, এখানে একটা অ্যাংলো কলোনি করবে। তা আর হল না। কেউ মারা গেল। কারও ছেলেমেয়ে চাকরিবাকরি জুটিয়ে বাইরে থেকে গেল। বাড়িগুলো বেচে দিল জলের দরে। তখন, আমাদের মতন দু-চারজন এখানে এসে বসে পড়লাম। বাইরে রটে গেল জায়গাটা খুব স্বাস্থ্যকর; স্যানাটোরিয়াম স্পট। পাঁচ-সাতটা বাড়ি—মানে কটেজ, বাংলো, লজ হয়ে গেল।

"আমাদের এখানে ক'টা বাড়ি আছে জান?" লালাসাহেব জিজ্ঞেস করলেন।

"না।"

"অনলি সেভেন। মাত্র সাতটা। মধুবাবু, আমরা ছাড়া, আর পাঁচটা। বেশিরভাগই অ্যাংলোদের কাছ থেকে কেনা। পাঁচটার মধ্যে, পাইন আর হাজরারা বাড়ি ভাড়া দেয়। আলি মারা যাবার পর ওর ছেলে আসেই না। তালা বন্ধ করে রেখেছে বাড়ি। মিসেস গুপ্তা বছরে একবার আসেন। পাঁচটার মধ্যে একটাতে থাকেন আমাদের চুনি মহারাজ, পাইনদের কেয়ারটেকার হিসেবে। বাকিটা পালের গেস্ট হাউস। দু-তিন দিন থাকা যেতে পারে কোনওরকমে।...আর কিছু নেই।"

সুমতি বলব কি বলব না করে বলল, "আপনারাই শুধু এতদিন থেকে গেলেন?"

"গেলাম। রিটায়ারমেন্টের পর কোথায় আর যাব বল?" লালা নরম গলায় বললেন।

"কেন? কলকাতায়। চন্দননগরে।"

"ওখানে কিছু নেই আমাদের।...ইচ্ছে করল না। এই জায়গাটা ভাল লেগে গেল।"

"কলকাতায় আত্মীয়স্বজন?"

"তেমন কেউ নয়। নিজেদের তো নয়ই।" বলে কথাটা আর এগুতে দিলেন না লালাসাহেব। "তোমাদের কথা বলো? তুমি—?"

সুমতি কমলেশের দিকে তাকাল। ইতস্তত ভাব। সামান্য দ্বিধা। চোখ ফিরিয়ে ইন্দিরাকে দেখল। গায়ের গরম শাল মাথার ওপর তুলে দিয়েছেন, কান ঢাকা পড়েছে। শীত বাড়ছিল।

সুমতি বলল, "আমি কাঁকুলিয়ায় আমার এক মাসির বাড়িতে থাকি।"

"কলকাতার মেয়ে তুমি?"

"না। বাইরের। মফঃস্বলের। আসানসোলের দিকেই কাটিয়েছি", সুমতি একটু থামল। আবার বলল, "বাবা নেই। মা আছে, তবে সুস্থ স্বাভাবিক নয়। আমি কলকাতায় একটা অফিসে চাকরি করি। সাত-আট বছর হয়ে গেল।"

"ও! মা..."

"সে অনেক কথা। মানে আমাদের সংসারে নিজেদের অশান্তি।" বলে ইন্দিরাকে দেখাল। "পরে মাসিমাকে বলব।"

"তুমি?" লালাসাহেব কমলেশের দিকে তাকালেন।

কমলেশ কিছু বলার আগেই সুমতি বলল, "ওর একটা বড় অপারেশান হয়েছে পেটে। হাসপাতালে ছিল দু মাসের ওপর। ছাড়া পাবার পর একটা মাস ওর নিজের বাড়িতেই ছিল। সেখানে দেখাশোনার লোকের অভাব। তা ছাড়া ডাক্তারবাবুরা বলছিলেন, বাইরে কোনও স্বাস্থ্যকর জায়গায় গিয়ে দু-এক মাস অন্তত কাটিয়ে আসতে।"

ইন্দিরা উলের গোলা হাতের কাঁটা কোলের ওপর রেখে দিলেন। কমলেশকেই বললেন, "তুমি কলকাতায় কোথায় থাক? বাড়ি?"

কমলেশ বলল, "আমি মাঝ কলকাতায়। শিয়ালদার দিকে।" চশমা খুলে নিল। চোখ রগড়াল আলগাভাবে। আবার চশমা চোখে দিতে দিতে বলল, "আমাদের বাড়ি শ্রদ্ধানন্দ পার্কের প্রায় পেছন দিকেই। অনেক পুরনো বাড়ি।"

"কে আছেন বাড়িতে?"

"বাবা। আমাদের বাড়ির ব্যাপারটা ধাঁধার মতন। একসময়ে জয়েন্ট ফ্যামিলি ছিল। বাবাদের আমলে চলে যাচ্ছিল, পরে ভাগাভাগি, যে যার মতন, সবই টুকরো টুকরো হয়ে গেল। ভাগের ঘর, বারান্দা, রান্নাবান্না। জেঠতুতো ভাইরা কেউ কেউ চলে গেল অন্য জায়গায়। যারা আছে, তারা আর আত্মীয়ের মতন থাকে না ; যেন পাড়াপড়শির লোক। আমার জেঠাইমা যতদিন বেঁচে ছিল বাবাকে তবু দেখত। এখন বাবা নিজেই একলা। মাঝে মাঝে মামাতো এক দিদি এসে খোঁজখবর করে যায়। দিদিরা থাকে বেহালার দিকে।"

সুমতি কমলেশের কথা থামিয়ে মাঝখান থেকে বলল, "ওকে দেখাশোনা করার লোকই ছিল না বাড়িতে। বুড়ো বাবা নিজেকেই সামলাতে পারেন না তো ছেলেকে কী দেখবেন!"

ইন্দিরা অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। কী ভাবছিলেন কে জানে। মৃদু গলায় বললেন পরে, "আজকাল এইরকমই হয়, যে যার মতন সরে যায়। দোষ তাদের নয়, না সরে উপায় থাকে না। পাঁচের সংসারে পনেরো হলে আলাদা তো হবেই।"

"আপনারা এখনকার..."

"আমরা কেমন করে জানলাম বলছ? জানব না কেন! আত্মীয়স্বজন তো আমাদেরও ছিল। শুনেছি কমবেশি। তা ছাড়া এখানে যারা আসে, দু-একজনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়ে যায়। কথায় কথায় খানিকটা শুনি।"

লালাসাহেব অন্য কথায় গেলেন। কমলেশকে বললেন, "তোমার ঠিক কী হয়েছিল?"

"আগে দু-একবার রক্ত বমিটমি হয়েছিল। ডাক্তাররা দেখেশুনে সন্দেহ করেছিলেন আলসার। ওষুধপত্র খেয়ে চলছিল। ভালও থাকতাম।...হঠাৎ এবার কী হয়ে গেল একদিন সিরিয়াস অবস্থা হল। তখন আর হাসপাতালে না গিয়ে উপায় থাকল না। অপারেশান করল ওরা। সেরেই উঠছিলাম। আবার গণ্ডগোল। মাসখানেক আরও হাসপাতালের বিছানায়। তারপর ছেড়ে দিল—।" কমলেশ হাসির মুখ করল, "এখন ভাল আছি।"

"ভাল থাকবে। ভেবো না। তোমায় অতটা সিক্ দেখাচ্ছে না। এখানে তোমার শরীরের উপকারই হবে।"

"দেখি।"

"দেখুন না, আমি ধরেবেঁধে নিয়ে এলাম ওকে", সুমতি বলল, "আমার অফিসের এক বন্ধু জায়গাটার কথা বলল। তার মা এখানে ছিল। বলল, রাঁচির কাছে—পাহাড়ি এলাকা।"

"রাঁচি এখান থেকে পঁয়ষট্টি কিলোমিটারের মতন। তোমাকে অবশ্য ঘুরে যেতে হবে। ট্রেকারে চামেরিয়া মোড়। সেখান থেকে বাস।"

সুমতি হাসল। "আমি রাঁচি যাচ্ছি না। এই জায়গাটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আপনাদের মতন মানুষের কাছে আশ্রয় পাওয়া ভাগ্য, মেসোমশাই।" এই প্রথম সুমতি লালাসাহেবকে সোজাসুজি মেসোমশাই বলে ফেলল। ইন্দিরাকে অবশ্য আগেই বার কয়েক মাসিমা বলে ডেকেছে।

লালা হাসলেন। মৃদু স্নিগ্ধ হাসি। "আশ্রয় বোলো না। ওটা বড় কথা। আমরা তোমাদের অতিথি হিসেবে থাকতে বলেছি।...আর একটা কথা কী জান? আমাদের এখানে সকলের জন্যে নয়, কারও কারও জন্যে জায়গা থেকে যায়।" বলেই কথা ঘুরিয়ে নিলেন উনি। কমলেশের দিকে তাকালেন, "তুমি কী কাজকর্ম করতে?"

"একটা প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করতাম। বায়োটেক ফার্ম। অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট।"

ইন্দিরা কোলের ওপর রাখা উল কাঁটা আধ-বোনা সোয়েটারটা তুলে নিলেন। "আজ শীত বাড়বে। হাওয়ার ঝাপটা দেখছ!"

"ওদের ঘরে একটু আগুনের ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল হত", লালা বললেন।

"আগুন! আগুন কী হবে।" সুমতি বলল, কথাটা সে বুঝতে পারেনি।

ইন্দিরা হেসে ফেলে বললেন, "কাঠকয়লার আগুন। মালসা দেখেছ তো! ওর মধ্যে আগুন দিয়ে ঘরে রাখলে আরাম পাবে খানিকক্ষণ। হাত-পা গরম করে নিতে পারবে।"

"ও! আপনারা রাখেন?"

"রাখি মাঝে মাঝে। আরও শীত পড়লে। মাঘ মাসে ঘরদোর কনকন করে। আমরাও কেঁপে মরি। এখনই আমাদের দরকার হয় না। এই শীত সহ্য হয়ে গেছে। তোমরা নতুন। কষ্ট হবে। একটু আগুন দিয়ে দিতে বলি ঘরে—!"

মাথা নাড়ল সুমতি। "না মাসিমা, দরকার নেই, দেখি না আজ। আমাদের কষ্ট হলে কাল বরং...; আজ থাক।"

লালাসাহেব উঠে পড়লেন। দেওয়াল ঘড়িতে আটটা বাজল।

ঘর আলাদা। পাশাপাশি।

সুমতি আলাদা ঘরেই ব্যবস্থা করেছে। দুজনের জন্যে একটা ঘর নিলে হত। কিন্তু সে নেয়নি। লুকোচুরি সে মাসিমার সঙ্গে করেনি। মধুবাবুর সঙ্গেও নয়। যা সত্য তাই বলেছে। তবু মাসিমার জন্যে নয়, নিজের জন্যে। কমলেশের সঙ্গে একই ঘরে শুতে তার অস্বস্তি হবারই কথা। আজ পর্যন্ত সে বা কমলেশ সেভাবে থাকেনি। থাকার কথাও নয়। শয্যায় ঘনিষ্ঠতা তাদের কেমন করে গড়ে ওঠা সম্ভব। সাংসারিক জীবন তো এখন পর্যন্ত তাদের শুরু হয়নি। সুমতি পড়ে আছে তার এক পাতানো মাসির বাড়িতে, কাঁকুলিয়ায়; আর কমলেশ তাদের শরিকি বাড়ির একটা ঘরে। ঘর না বলে খুপরি বলাই ভাল। ঘরটায় তার বৃদ্ধ বাবা থাকেন। সেই ঘরের জানলার পাল্লা ভাল করে বন্ধ হয় না, দেওয়ালের চুনবালি খসে পড়ে পড়ে কুৎসিত চেহারা হয়েছে, কোণে কোণে ঝুলের কালি। কোন আমলের একটা খাট, আলমারি, আলনা। খুপরিতে থাকত কমলেশ। মামুলি তক্তপোশ, বিছানা, দেওয়াল ঘেঁষে ঝোলানো র‍্যাক, একটা আয়না। সামনের এক চিলতে উঠোনের চারপাশ ঘিরে, মাথার ওপর অ্যাসবেসটাস চাপিয়ে রান্নাঘর। ঠিকে বামনি রান্না করে দিয়ে যেত। কলঘর শরিকি। সংসার পাতার কথাই ওঠে না।

আর সুমতির জীবনটা আরও ছেঁড়াখোড়া, অদ্ভুত। কাঁকুলিয়ায় মাসি বাস্তবিক তার নিজের কেউ নয়। আত্মীয়তাও নেই। অত্যন্ত দুঃসময়ে এক বান্ধবী ব্যবস্থা করে দিয়েছিল, নয়তো মাথা গোঁজার জায়গা বলতে ছিল জয়ন্তীর অতিথি হিসেবে একটা বিশ্রী ওয়ার্কিং গার্লস হোস্টেলের ঘরে ওর গা-ঘেঁষে পড়ে থাকা। প্রাইভেট গার্লস হোস্টেল, তার কোনও নিয়মকানুন রীতিনীতি নেই। মেয়েদের সকলের স্বভাবও পরিষ্কার নয়।

সুমতির ঘুম আসছিল না। রাত বোঝার উপায় নেই। ঘর অন্ধকার। শীত যে এতটা বেড়ে উঠবে সুমতি ভাবেনি। হালকা কম্বলের ওপর ইন্দিরামাসির দেওয়া আরও একটা কম্বল চাপিয়েও স্বস্তি পাওয়া যাচ্ছে না। ঘরের দরজা জানলা সবই বন্ধ। পাশের ঘরে কমলেশ ঘুমোচ্ছে। নাকি তারও ঘুম আসছে না! কমলেশকে থাকতে হবে বলে সুমতি যতটা পেরেছে তার বিছানাপত্র, জামাকাপড়, গরম পোশাকআশাক ওষুধপত্র গুছিয়ে নিয়ে এসেছিল। নিজের জন্যে সুমতি তেমন মাথা ঘামায়নি।

এক একসময় সুমতির মনে হয়, তার জীবনটাই এইরকম। জন্ম থেকেই অগোছালো। রতিপুরের যে বাড়িতে সে মানুষ, তার ধরণটাই ছিল আলাদা। অবশ্য

গোড়ায় গোড়ায় অন্যরকম ছিল। ধীরাজবাবুকে লোকে বলত, রাজাবাবু। উনি গাড়ি মেরামতির কারবার করতেন। বইপড়া বিদ্যে ছিল খানিকটা, ডিপ্লোমা পাওয়া অটো মেকানিক। হাতেকলমেও কাজ শিখেছিলেন উঁচুদরের মিস্ত্রিদের কাছে। কবে যেন কপাল ঠুকে নিজের কারবার শুরু করলেন। পরিশ্রমী মানুষ, সামান্য রগচটা, মুখের ওপর জবাব দিয়ে দেন; কিন্তু মানুষ ভাল। হপ্তার ছটা দিন যায় কালিঝুলি মেখে, খাটাখাটিতে; সন্ধের পর বাড়ি ফেরেন পাঁইট পকেটে করে। রবিবার মাছ ধরার নেশায় রেলের ট্যাংকে গিয়ে বসে থাকেন। আর না হয় বাড়িতে মেয়ে বউকে নিয়ে মেতে থাকেন হুল্লোড়ে। সুমতিকে উনি তুলে এনেছিলেন এক বন্ধুর স্ত্রীর কোল থেকে। বন্ধু মারা গিয়েছে ছুটন্ত ট্রেনের পাদানি থেকে পড়ে। বন্ধুর স্ত্রী মারা যাচ্ছিল অসাবধানে আগুনে পুড়ে। দায়দায়িত্ব কে নেয়? রাজাবাবু বরাবরই আবেগের মানুষ। তুলে নিয়ে চলে এলেন সুমতিকে। তখন তার বয়েস তিন কি চার। নাম ছিল সুমু। রাজাবাবু তার নাম করলেন সুমতি।

নতুন বাড়িতে এসে সুমতির যখন মন বসল, গোমরানো কান্না থামল— তখন সে পাঁচ-ছয় পেরিয়ে গিয়েছে। হরিসভার গলিতে তাদের ছোট বাড়ি। তার মাথার ওপর দিদি। দিদির নাম ছিল মিনতি। বাড়িতে সবাই মিনু বলে ডাকাত। রোগা, ফরসা, বরফি-ছাঁদের মুখ, সামনের দুটো দাঁত ছিল উঁচু, গালের একপাশে মস্ত একটা আঁচিল। ডান গালে। দিদি তখন বারোয় পা দিয়েছে। ওর স্বভাব ছিল চাপা। দেখলে মনে হবে নরম শান্ত মেয়ে। ভেতরে কিন্তু খুব শক্ত। জেদি। সুমতির সঙ্গে দিদির রাগারাগি ছিল না। ও যে হিংসে করত বোনকে তাও নয়। তবু দুজনের মধ্যে মাখামাখি তেমন হয়নি। একই ঘরে থাকত দুই বোন, আলাদা বিছানায় শুত, লেখাপড়া করত যে যার মতন আলাদা আলাদাভাবে বসে, কথাও হত, তবু একটা তফাত থাকত।

ওদের স্কুল ছিল মাইলটাক দূরে। একটা পুকুর, বর্মনদের কাঠগোলা, ধোপার মাঠ, হয় আকন্দ না হয় বনতুলসীর ঝোপ পাশে রেখে এ-গলি ও-গলি দিয়ে বাজারের শেষাশেষি উঠতে না উঠতেই স্কুল। তখন হরিসভার গলির দিকে ঘরবাড়ি কম। তবু স্কুল যাবার পথে সঙ্গী জুটে যেত। দিদি হাঁটত তার বন্ধুদের সঙ্গে, সুমতি সঙ্গ নিত তার বন্ধুদের।

চার-পাঁচটা বছর এইভাবেই কেটে গেল। দিদির তখন বয়েস ষোলো-সতেরো, সুমতির বারো-তেরো, বাবা মারা গেলেন। একেবারে আচমকা নয়। কীসের এক বিদঘুটে অসুখ করল, মাথার যন্ত্রণা, চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে গেল, ঘুম নেই সারা রাত, এলোমেলো কথা, কাপড়চোপড়ের ঠিক থাকে না, ডাক্তার হাসপাতাল বৃথা হল। সারাদিন ওষুধ ইনজেকশানে বেহুঁশ হয়ে থাকতে থাকতে বাবা একদিন চলে গেলেন।

বাবার কারখানা ততদিনে বেচুমিস্ত্রি হাত করে নিয়েছে। মা একেবারে অথই জলে। মায়ের নাম ছিল উমা। দুই মেয়ে নিয়ে কেমন করে সংসার টানবে মা! চোখের জল ফেললে কি পেট ভরে, না শাড়িজামা জোটে পরনের। তখন ওই পাড়ার কাছাকাছি একটা বাড়িতে জনা চারেক লোক জুটেছে অফিস কারখানার। তারা হাত পুড়িয়ে, এ-হোটেল সে-হোটেল করে খায়! লোকজন জুটিয়ে আনে যদি বা রান্নাবান্না

করার জন্যে, সে-লোক বেশিদিন টেঁকে না, চুরিচামারি করে পালায়। ওদের মধ্যে কে যেন একদিন মাকে বলল, দিদি আপনি যদি আমাদের দুবেলা দুমুঠো খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করেন— আমরা বেঁচে যাই, আপনারও একটা আয়ের ব্যবস্থা হয়।

মা প্রথমটায় রাজি হয়নি। পরে হল। নিজের বাড়িতেই মা বসল পরের জন্যে হাঁড়ি ঠেলতে। খাবার একটা জায়গারও ব্যবস্থা হল। দেখতে দেখতে ওটা হয়ে গেল উমাদির হোটেল। এবেলা ওবেলা দশ-বারোটা পাত পড়তে লাগল। মায়ের পক্ষে একা এত ঝঞ্ঝাট সামলানো সম্ভব নয়। ঠাকুর এল, এল বাজার করার লোক, ফাইফরমাশ খাটার একটা বুড়ি।

নীচের তলার অর্ধেকটা হোটেলের জন্যে রেখে মা মাঠকোটা ধরনের দোতলা করল খানিকটা। সুমতিরা উঠে এল দোতলার দুটো টালি-ছাওয়া ঘরে।

দিদির বিয়ের জন্যে মা তখন উঠেপড়ে লেগেছে। দিদি আর পড়াশোনা করে না। স্কুল থেকে উতরে গিয়ে বাড়িতে বসে থাকে। বন্ধুটন্ধুর বাড়ি যায়। সেলাইয়ের হাত ছিল দিদির। নিজের মনে ফরমাশ মতন সেলাই নিয়ে বসে থাকে বাড়িতে। ওর ভাবসাব দেখলে মনে হবে, নিজেরটুকু ছাড়া কিছু বোঝে না। মায়ের সঙ্গে ঝগড়াঝাটিও করত না। কিন্তু বেশ বোঝা যেত ও যেন নিজেকে আলগা করে নিয়েছে।

সুমতিও দিদিকে নিজের সঙ্গে আর জড়াতে চাইত না। এতকাল যখন দিদি তাকে জড়াল না, তখন আর নতুন করে কেন জড়াবে বড় বয়েসে।

বিয়ে দিদির হচ্ছিল না। কথা এগুতে না এগুতেই ছেলের পক্ষ থেকে আপত্তির কারণটা জানা যেত। মেয়ে শুধু রোগা নয়, মুখের ছাঁদ ঘোড়ার মতন, দাঁত উঁচু, গালে মাংস নেই, তার ওপর হোটেলওয়ালির মেয়ে।

সুমতির আজও স্পষ্ট মনে আছে সেই দিনটার কথা।

তখন বিকেল ফুরোয়নি। সুমতি ঘুমিয়ে পড়েছিল দুপুরে। বিকেলে ঘুম ভাঙতেই গেল কলঘরে। চোখমুখ ধুয়ে আসবে। ফেরার সময় নজর পড়ল, আকাশ একেবারে থমথমে হয়ে এসেছে। আষাঢ়ের মেঘে কালো হয়ে আসছিল উত্তরের দিকটা। বৃষ্টি এল বলে। হাওয়া দিয়েছে বাদলার। হঠাৎ শব্দ পেল পায়ের। সিঁড়ির মুখে দিদি। ঘরোয়া করে শাড়ি পরা, ছাপা শাড়ি। কাঁধে কাপড়ের ঝোলা, পায়ে চটি, বিনুনি ঝুলছে পিঠে।

দিদি ফিরে তাকাল না। দেখল না সুমতিকে। নীচে নেমে গেল।

ঝাঁপিয়ে বৃষ্টি নামবে এখুনি, এসময় দিদি কোথায় যাচ্ছে সুমতি বুঝল না। অনুমান করল পাড়ার মধ্যেই যাচ্ছে কোথাও, নয়তো শাড়িজামাটা অন্তত পালটে নিত। পাড়ার মধ্যে কারও বাড়ি গেলে সাজ পালটাবার কীইবা আছে।

একটু পরেই বৃষ্টি নামল।

মা তখন নিজের ঘরে। হয়তো ঘুমোচ্ছিল। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত মায়ের কি কম খাটুনি যায়। নিজের হাতে হাঁড়িকড়াই হাতাখুন্তি না ধরুক, হাটবাজার না করুক, কাজের লোকদের সামলাতেই তো ক্লান্ত হয়ে পড়ে মা। তার ওপর আজকাল বাতে ধরেছে। শরীর ভারী হয়েছে বয়েসে। মাঝে মাঝে হাঁপ ওঠে।

বৃষ্টি এল তো এলই। শেষ বিকেল একেবারে সন্ধে হয়ে এল। মেঘ ডাকার বিরাম নেই। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বাজ পড়ছে। জলে জলে গলি ডুবে গেল।

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পরে বৃষ্টি থামল।

দিদি ফিরল না।

রাত হল; দিদি? দেখা নেই।

মা আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করল। তারপর লোক পাঠাল পাড়ার এবাড়ি ওবাড়ি খোঁজ করতে। দিদি কোথাও নেই।

কোথায় গেল মেয়ে? মা দুর্ভাবনায় দুশ্চিন্তায় ছটফট করতে করতে নিজেই গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল সদরে। জলে কাদায় গলি তখন ডুবে যাচ্ছে।

দিদি এল না।

আর আসেনি দিদি। পরের দু-তিনটে দিন কত খোঁজাখুঁজি, চেনাজানাদের বাড়িতে লোক পাঠানো। মা নিজেও গেল খোঁজ করতে।

দিদি আর আসেনি।

পাঁচ দিনের মাথায় একটা উড়ো খবর এল, দিদি বারিক বলে একটা লোকের সঙ্গে চলে গিয়েছে। খবরটা মিথ্যে নয়। বারিককেও আর শহরে দেখা গেল না। সুমতি লোকটাকে দেখেছে। ট্যাক্সি চালাত। তার দেশবাড়ি দেওঘরের দিকে।

মা জোর ধাক্কা খেল। মেয়ে এভাবে পালিয়ে যাবে ভাবেনি। কারই বা ধারণা হবে। দিদির মতন চুপচাপ মেয়ে এমন কাণ্ড করতে পারে! পাড়ার মধ্যে হাসিঠাট্টাও হত। সুমতি নিজের কানেই শুনেছে কেউ কেউ বলত, হোটেলওয়ালির মেয়ে ট্যাক্সিঅলা ছোঁড়া জুটিয়েছে— খারাপটা কী করেছে! মায়ের মনমেজাজ তখন থেকেই চড়ে গেল। এমনিতেই হোটেল চালাতে চালাতে মা দিন দিন রুক্ষ হয়ে উঠছিল। দিদির বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারছিল না বলে সেই মেজাজ হতাশায় আরও কর্কশ হচ্ছিল। ট্যাক্সিঅলার সঙ্গে মেয়ে পালানোর পর— একেবারে আগুন হয়ে জ্বলত যেন।

সুমতি ততদিনে স্কুল শেষ করেছে। কাছাকাছি পাড়ার এক বাচ্চাদের নার্শারি স্কুলে চল্লিশ টাকা মাইনের চাকরি জুটে গিয়েছিল। দাতব্য ডিসপেনসারির মতন দাতব্য স্কুল। ওই চাকরিটা হাতে থাকায় সুমতি শহরের মেয়ে কলেজে পড়াশোনাটা করতে পেরেছে। আবার টাইপ স্কুলে টাইপটাও শিখত।

মায়ের সঙ্গে সুমতির সম্পর্কটা তো খারাপ ছিল না আগে; দুর্ব্যবহারও পায়নি মায়ের কাছে। মেয়ের মতনই থাকত। দিদি চলে যাবার পর কী যে হল, অদ্ভুত একটা চিড় ধরে গেল মায়ের মনে। আয়নায় একবার একটা বড় চিড় ধরলে যেমন অল্পস্বল্প ঠুকঠাকেও চিড় পড়তে থাকে কাঁচে, মায়ের মনেরও সেই অবস্থা হল। সুমতির চালেচলনে, কথায়বার্তায় উনিশবিশ হবার উপায় নেই— তা হলেই মা যেন রণরঙ্গিনীর রূপ ধরত।

এইভাবেই দিন কাটছিল। হঠাৎ একদিন আধবুড়ো এক ভদ্রলোক এসে হাজির বাড়িতে। উনি নাকি কোন লতাপাতার সম্পর্কে মায়ের দাদা।

এক একজনের ক্ষমতা থাকে বোধহয় উড়ে এসে জুড়ে বসার। দিবাকরমামা— মানে মায়ের সেই দাদারও দেখা গেল বেশ ক্ষমতা আছে। মাকে বশ করে ফেলল

ধীরে ধীরে। হোটেলটা যেন তাঁর। মা আলগা দিয়ে দিল, গা-ছাড়া ভাব। মামা গুণের লোক। রাত্রে মায়ের ঘরে বসে নেশা করতে শুরু করল। মাকেও ধরিয়ে দিল দোষগুণ যাই বলো। মা তখন পঞ্চাশ ছাড়িয়ে যাচ্ছে। মামা যাটের কাছাকাছি।

সুমতি তো চোখে কাপড় বেঁধে থাকত না বাড়িতে। এক এক দিন হঠাৎ তার চোখে পড়ে গিয়েছে, মায়ের ঘরে মায়েরই বিছানায় বসে দিবাকর মামা কত সোহাগভরে বোনের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, মা ডুকরে উঠলে মামা কেমন আদর করে তাকে কোলে টেনে নিয়ে শোকের কান্না সামাল দিচ্ছে।

একদিন সুমতি ওই লোকটার মুখে কলঘরের সাবান ছুড়ে মেরেছিল। বুড়ো দরজার ফাঁক দিয়ে স্নান দেখছিল সুমতির।

তারপর আর তার থাকা হয়নি ওবাড়িতে।

যতীনকাকার চিঠি নিয়ে সে কলকাতায় চলে এসেছিল।

প্রথমটায় সুমতি ভেসে বেড়িয়েছে। দয়াদাক্ষিণ্যেই দিন চলছিল তার। শেষে একটা চাকরি।

হাতের প্রথম ফল আগলে রাখতে রাখতে বরাতজোরে অন্য একটা চাকরি পেয়ে গেল।

এই চাকরিটা তার মতন মেয়ের পক্ষে যথেষ্ট। না, সুমতির এনিয়ে কোনও আপশোস নেই।

কলকাতায় আসার পর মাকে সে মাঝেসাঝে চিঠি দিয়েছে। জবাব পেয়েছে কদাচিৎ।

এখন সে স্বাবলম্বী, স্বনির্ভর। মাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, বা মায়ের মরজিতে তার দিন কাটে না। কোনও প্রত্যাশাও নেই মায়ের কাছে। তবু ওই উমামা যে তাকে মানুষ করেছিল, স্নেহযত্নও পেয়েছে যার কাছে— তাকে ভুলতে পারে না। দুর্বলতাও আছে মায়ের ওপর, এখনও। দুঃখও হয়। হয়তো মায়ের ভেতরকার ভাঙাচোরাগুলো সে অনুভব করে।

বছরে একবার কি বড়জোর দুবার সে দেখতে যায় মাকে। দু-একদিন থাকে। কলকাতা মোটেই দূরে নয়। ইচ্ছে করলে যখন তখন যেতে পারে মাকে দেখতে। যায় না। বড় কষ্ট হয় মাকে দেখলে। সেই দাদা আর নেই। মা কেমন পাগলের মতন হয়ে গিয়েছে। হোটেল আর নেই। নীচেটা মা ভাড়া দিয়ে দিয়েছে।

কমলেশ বলে একজনকে সুমতি বিয়ে করেছে মা জানে না। বিয়েটা অবশ্য বেশি দিনের নয়। যদিও কমলেশকে চিনতে বুঝতে সুমতির দুটো বছর কেটে গিয়েছিল। তা কাটুক। মানুষটাকে সে ভালবেসেই নিজের কাছে টেনে নিয়েছে। এখন তার ভাগ্য!

চার

ট্রেকার চলে যাবার পর কমলেশ একবার হাত নাড়ল।

সুমতি পিছনের সিটে ছিল। হাত নাড়তে গিয়ে তার রুমালটা পড়ে গেল কোলের ওপর।

কমলেশ সামান্য দাঁড়িয়ে থাকল।

বেলা বেশি হয়নি। সাড়ে আটটার কাছাকাছি। দশটার আগে আগেই ট্রেন চলে আসে কলকাতার। ন'টার আগেই সুমতি স্টেশনে পৌঁছে যাবে।

কমলেশ ছায়া থেকে রোদে সরে এল। ডালিমগাছের ছায়া। রোদ আড়াল করার মতন ঘন পাতা নেই গাছটায়। তবু মাথা বাঁচিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল কমলেশ। রোদে আসতেই মনে হল, পৌষের এই সকালের রোদে সে অকারণ মাথা বাঁচাচ্ছিল। এই রোদ বেশ আরামের!

ট্রেকারে মাত্র পাঁচ-ছ জন সবাই ট্রেন ধরবে না। কেউ কেউ বিকেল নাগাদ ফিরে আসবে। স্টেশনের বাজারে দরকারি কেনাকাটা সারবে। বেড়াবে এদিক ওদিক।

কয়েক পা হাঁটতেই মধুসূদনবাবুর সঙ্গে দেখা।

"উনি চলে গেলেন?" মধুসূদন বললেন।

"হ্যাঁ।"

"আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে।" বলে গায়ের চাদরটা সামলে নিলেন। মোটা গরম চাদর। খসখসে। আলগা হয়ে গিয়েছিল বোধহয়। হাসি মুখেই বললেন, "যাবার আগে বলছিলেন, আপনার সুবিধে-অসুবিধের একটু খোঁজ রাখতে। আমি বললাম, ভাববার কিছু নেই, যাঁদের কাছে আছেন তাঁরা অনেক বেশি খোঁজ রাখবেন।"

কমলেশ হাসল।

"কাল একবার ভেবেছিলাম ওবাড়ি যাব। সন্ধেবেলায়। একটা কাজে আটকে গেলাম।"

"আপনি সেদিনই তো গিয়েছিলেন। পরশুর আগের দিন।"

"যাই, প্রায়ই যাই। সন্ধেবেলায় বসে বসে দুটো গল্পগুজব হয়। লালাসাহেব জানেন অনেক, বলেনও গুছিয়ে। ...তা আপনি আছেন কেমন?"

"ভাল।"

"জায়গাটা শরীরস্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন।"

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে কমলেশ বলল, "শীতটা এখনও ঠিক সইয়ে নিতে পারিনি," বলে হাসল। কলকাতার মানুষ তো!"

কাঁচা রাস্তা। নুড়ি পাথর আর লালচে মাটি মেশানো। রোদ পড়ে খয়েরি দেখাচ্ছে। খানাখন্দ তেমন নেই। রাস্তার পাশে মাঠ। সকালে ভিজে ছিল রাতের হিম-শিশিরে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে আসছে। ধুলো এখন নেই। ঘাস শুকিয়ে গেলে শীতের বাতাসে ধুলো উড়ে যায় মাঝে মাঝে গাছের শুকনো পাতাও। এখানে গাছগাছালি চেনা মুশকিল। শাল শিশু যদি বা চেনা গেল অন্য বুনো গাছগুলো চেনা যায় না। কমলেশ যেতে যেতে গাছ দেখছিল। কদমগাছের মতন একটা গাছের মাথা থেকে এক ঝাঁক পাখি উড়ে গেল।

মধুসূদন বললেন, "চলুন, আমার ওখানে একটু বসবেন। তাড়া নেই তো?"

"আমার আবার তাড়া কীসের!"

"আসুন তবে।"

মাঠ ভেঙেই যাওয়া যেত। মধুসূদন রাস্তা ধরেই এগিয়ে চললেন।

সামান্য পথ। কাঁটাগাছের বেড়া, ছোট একটা কাঠের ফটক, দশ-বিশ পা মাঠ পেরিয়ে মধুসূদনের আস্তানা। মানে, টালি ছাওয়া দেড়-দু ঘরের একটা বাড়ি।

বারান্দা হাতকয়েক, তার গা ঘেঁষে মধুসূদনের অফিস। পাশে তাঁর শোওয়া বসার ঘর।

খোলা জানলা দিয়ে রোদ আসছিল। ছোট ছোট জানলা তবে পুব-দক্ষিণ ঘেঁষা।

"বসুন।"

কমলেশ আগে এঘরে আসেনি। সুমতি এসেছিল প্রথম দিন। আজও হয়তো এখানে এসে দেখা করে গিয়েছে যাবার আগে।

কাঠের ছোট টেবিল; দু- তিনটি সাদামাটা কাঠের চেয়ার, একটা টুল। টেবিলে দুটি মোটা খাতা, কয়েকটা কাগজপত্র, চিঠির খাম, কলম পেনসিল, একটা ক্যাশ বাক্স, ছোট মাপের। দেওয়ালের একপাশে এক আলমারি। কয়েকটা বই। হোমিওপ্যাথি ওষুধের বাক্সর মতন দুটো বাক্স।

কমলেশ আলমারির দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক পলক।

মধুসূদন নিজের জায়গায় বসেছেন। হেসে বললেন, "ওটা একটা নেশা। কয়েকটা হোমিওপ্যাথি বই আর ওষুধের শিশি। আপদেবিপদে কাজে দেয় দেখেছি।"

"ভালই তো! ...আপনি এখানে কতদিন আছেন? মানে কত বছর হল?"

মধুসূদন বললেন, "তা বছর বারো হয়ে গেল।"

"বা-রো!"

"এই যে শান্তিনিবাস দেখছেন এটি আমার পিসিমার নামে। মুখে পিসিমা, আসলে মা। পিসিমার কাছেই আমি মানুষ হয়েছিলাম। মা গত হয়েছিল একেবারেই ছেলেবেলায়।"

"ও! বাবা—?"

"বাবা জাহাজে চড়ে ভেসে বেড়াতেন। মাল-জাহাজ। চাকরি। ...আমার পিসিমার কথা বলি। আমার পিসতুতো দাদার রাজরোগ হয়। তখন রাজরোগ বলতে বোঝাত টিবি। ওষুধবিষুধ যা ছিল সেসময় তা না থাকার মতন। দাদাকে বাঁচাবার জন্যে পিসিমা তার ছেলেকে নিয়ে এখানে চলে আসে। এখন যে বাড়িটা দেখছেন ওটা গোড়ায় ছিল না। ছিল একটা কাঁচা বাড়ি। কটেজ। বুড়ি এক বিধবা থাকত, অ্যাংলো মেম। বাড়িটা সামান্য দামে বেচে দিয়ে বুড়ি চলে যায় চক্রধরপুরের দিকে। পিসিমা দাদাকে নিয়ে পড়ে থাকে এখানে। ডাক্তাররা বলেছিল ফাঁকা শুকনো স্বাস্থ্যকর জায়গায় থাকতে।"

"পিসেমশাই?"

"কারখানার চাকরি। ফোরম্যান। ...একটু চা খাবেন?"

"না, আজ থাক। আপনার পিসিমার কথা শুনি।"

"পিসিমা ছেলেকে আগলে পড়ে থাকল এখানে বছর পাঁচেক। দাদা মারা গেল এখানেই। পিসিমা তবু নড়ল না। আরও আট-দশ বছর বেঁচে থেকে এখানেই দেহ রাখল। এই কম্পাউন্ডের পশ্চিমে পিসিমাকে দাহ করা হয়েছিল। ওখানে একটা বেদি আছে সিমেন্টের। দেখবেন একদিন। হরীতকী আর কৃষ্ণচূড়ার তলায় পিসিমা শুয়ে

আছে।

কমলেশ জানলা দিয়ে অকারণে তাকাল, যেন গাছগুলো দেখতে পাবে।

"আপনার পিসেমশাই?"

"এখানেই কাটিয়েছেন জীবনের শেষের দিকটা। পিসিমা থাকতেই চাকরির পাট চুকিয়ে চলে এসেছিলেন। ওঁর হাতেই শান্তিনিবাসের প্রথম বাড়িটা গড়ে ওঠে। পিসিমার নামে নাম হয়। উনিও একদিন গত হলেন। আমার ডাক পড়েছিল আগেই এখানে। পিসেমশাই চলে যাবার পর আমাকেই সব সামলাতে হচ্ছে।"

কমলেশ প্রথমটায় কথা বলল না। এই শান্তিনিবাসের ইতিহাস এত সংক্ষিপ্ত ও সরল করে বললেন মধুসূদন যে ভাল করে বোঝাই গেল না ঘটনাগুলো। ফাঁক থেকে গেল যেন। টেবিলের একটা আলগা কাগজ বাতাসে উড়ে গেল। মধুসূদন চেয়ার ছেড়ে ওঠবার আগেই কমলেশ উঠে পড়ে কাগজটা কুড়িয়ে আনল।

মধুসূদন সামান্য অস্বস্তি বোধ করলেন। "আমিই আনতাম—!"

"তাতে কী! ...আচ্ছা, ওই কটেজগুলো আগে ছিল?"

"না। ওগুলো আমি করিয়েছি। মাত্র তিনটে। খুব যে ভাল ব্যবস্থা করতে পেরেছি— তা নয়। কোনওরকমে ছোট ফ্যামিলির চলে যায়। ...একটা ব্যাপার কী জানেন! আগে আমরা বছরে ক'টা আর লোক পেতাম! শীতের আগে পরে আসত দু-পাঁচ জন। ধীরে ধীরে জায়গাটার নাম ছড়াল। লোকে জানতে পারল। তাও এখন গরম বর্ষায় লোকজন বেশি আসে না। পুজোর পর থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত ভিড় থাকে। অন্যসময় লোক সামান্য।" বলেই মধুসূদন কেমন সংকোচের সঙ্গে বললেন, "আপনাদের আমি কটেজে জায়গা দিতে পারিনি বলে কিছু মনে করবেন না। উপায় ছিল না।"

"বা, আপনি নিজেই তো আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন লালাসাহেবের বাড়িতে।"

"সেটা ভাল হয়েছে। এখানে থাকার চেয়ে লালাসাহেবের অতিথি হয়ে থাকায় আপনি অনেক আরামে নিশ্চিন্তে থাকবেন। ওঁরা বড় ভাল। আমি ওঁদের কম দিন দেখছি না। ...সত্যি বলতে কী জানেন, আমার বড় কষ্ট হয় যখন দেখি, অমন দুটি মানুষ আজ এমনভাবে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে আছেন। না, কথাটা ঠিক হল না, ওঁরা বড় দুঃখী। দু-দুটি সন্তান হারিয়ে গেল, কীই বা বয়েস হয়েছিল তাদের। এমন দুর্ভাগ্য মেনে নিতে কষ্ট হয়। তবু ওঁরা মেনে নিয়েছেন।"

কমলেশ কথা বলল না, দেখছিল মধুসূদনকে। ভদ্রলোকের বয়েস হয়েছে। ঠিক বোঝা যায় না, আন্দাজ হয় মাঝ-পঞ্চাশ। ভাল স্বাস্থ্য। মাথায় মাঝারি। গায়ের রং তামাটে। মুখের ধাঁচটি গোল। চওড়া গাল। বসা নাক। চোখদুটি বড়। মাথার চুল ছোট ছোট, কান-ঘাড়ের বাঁয়ের দিকগুলো পেকে গিয়েছে।

কমলেশ কোনও কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। সংসারে কত মানুষের কতরকম দুর্ভাগ্য! মধুসূদনবাবুর পিসিমারই বা কোন সৌভাগ্য ছিল? তাঁরও তো একটিমাত্র সন্তান ছিল। থাকল কোথায়?

"এখানে আপনার এক যুগ হল। আগে কোথায়—?" কথাটা শেষ করল না

কমলেশ। শেষ না করলেও বোঝা যায় কী জানতে চাইছে সে।

মধুসূদন বললেন, "আগে আমি ছোটখাটো ব্যবসা করতাম। চাকরিও করেছি কিছুদিন। পোষায়নি। ব্যবসা বলতে কাঠকুটোর বাহারি জিনিসপত্র তৈরি করা, বেতের চেয়ার, টেবিল। চলে যেত একরকম। ঘরসংসার করিনি। গরজ হয়নি। আমার তখন হরদম ডাক পড়ত এখানে। পিসিমাকে কে দেখবে! তারপর এলেন পিসেমশাই। ডাক পড়ল বরাবরের মতন। এখন এই নিবাস নিয়েই রয়েছি। সবই দেখতে হয়। লোকজনের আসা-যাওয়া থেকে তাদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা পর্যন্ত। বলতে পারেন, এটাই আমার সংসার।" মধুসূদন সরল মুখে হাসলেন।

কমলেশও হাসল। "আপনি ভালই আছেন।"

"তা আছি। আমার দিনগুলো কাজেকর্মে, লোকের মুখ দেখে কেটে যায়। কতরকম লোক আসে, কত ধরনের মানুষ, তাদের সুখদুঃখ খানিকটা বুঝি, পুরো আর কেমন করে বুঝব!"

কাজের কথা বলতে লোক এল একজন।

কমলেশ উঠে পড়ল। "আমি আসি।"

"আসুন। দেখা হবে ও বাড়িতে। আপনার যখন ইচ্ছে হবে চলে আসতে পারেন এখানে। আমি চব্বিশ ঘণ্টাই আছে।"

কমলেশ উঠে পড়ল।

লালাসাহেবের বাড়ি দূরে নয়। পাঁচ-সাতশো গজ তফাতে। একটা মাঠ পড়ে, প্রায় নেড়া। নিচু হয়ে নেমে গিয়েছে। কাঁকরে মাটি। মাঠে অল্প ক'টা ঝোপ, একটা বড় কুলগাছ।

রোদ এতক্ষণে গরম হয়ে উঠেছে। সকালের শিরশিরে ভাব নেই, বাতাসও এলোমেলো নয়। দূরে শালজঙ্গল। কালচে সবুজ জঙ্গলের মাথায় নীল আকাশ রোদে গা এলিয়ে আলস্য ভাঙছে যেন। দু-চারটে চিল উড়ছিল মাথার অনেক ওপরে, মাঠের মাঝবরাবর বৃহৎ এক অশ্বত্থ।

কমলেশ হাতের ঘড়িটা দেখল। সুমতির ট্রেন চলে এসেছে বোধহয়, দশটা বেজে গেল।

সুমতি বলে গিয়েছে, দিন পনেরো-কুড়ি পরে আবার একবার আসবে। কমলেশকে দেখতে। আর চিঠি তো দেবেই। এখানে চিঠি পৌঁছোতে দেরি হয়। স্টেশনের কাছে পোস্ট অফিস। কেউ সেখানে গিয়ে ডাক না নিয়ে এলে চিঠি পড়েই থাকে ডাকঘরে। তবে রোজই তো কেউ না কেউ স্টেশনে যায়, বাজারহাটের দরকার পড়ে প্রায়ই। এখানে, মানে কমলেশরা যেখানে আছে, বাজার নেই। তবে পাইন লজের একপাশে একটা দোকান আছে ছোটখাটো। দরকারি জিনিসপত্র কিছু পাওয়া যায়।

কমলেশ এখানে আসার আগে সুমতি যতটা পারে, যা যা মনে হয়েছে, নিয়ে এসেছে কমলেশের জন্যে। আপাতত তার কিছুই দরকার নেই। এমনকী সিগারেটেরও। একসময় সে দেড়-দু প্যাকেট সিগারেট খেত। এখন খায় না। ডাক্তারের বারণ।

একটা ব্যাপারে কমলেশের অস্বস্তি যাচ্ছে না। সুমতি এখানকার খরচের জন্যে টাকা দিয়ে গিয়েছে। আরও দেবে। মানে যতদিন না কমলেশ সুস্থ হয়ে চলে যাচ্ছে এখান থেকে ততদিন— সে দুমাস হোক কি আড়াই-তিন মাস সুমতি খরচা টেনে যাবে তার।

কমলেশের এখানে আপত্তি ছিল। সুমতি এমন কোনও চাকরি করে না যে মাসে মাসে এতগুলো টাকা অনায়াসে খরচা করতে পারে। তার নিজের থাকা, খাইখরচা, অফিস আসা-যাওয়া, আরও খুচরো পাঁচটা ব্যয় রয়েছে। সে কেমন করে পারবে বাড়তি টাকার বোঝা বইতে। এমনিতেই তো কমলেশ যখন হাসপাতালে ছিল তখন সে ওষুধেবিষুধে অন্য দরকারে খরচ করেছে। কমলেশ জানতে পারত। বারণ করত। বলত, কমলেশের অফিস থেকে তার মাইনে তুলে এনে বন্ধুরা তো তাকে দিয়ে যাচ্ছে— তা হলে সুমতি কেন বাড়তি খরচ করবে! মুখে বলত, কিন্তু বুঝতে পারত, কমলেশের মাইনের টাকা থেকে বাড়িতে বাবাকে খরচখরচার জন্যে অর্ধেকটা টাকা দিয়ে বাকি যা থাকে তাতে হাসপাতালের পেয়িং বেডে, ওয়ার্ডে থাকা, গাদাগুচ্ছের ওষুধ, বাইরে থেকে আনা পথ্য, এর ওর দশ-বিশ টাকা গুঁজে দেবার পর— সেই টাকার আর কী থাকে! কাজেই সুমতিকে বাড়তি টাকা দিতেই হত।

হাসপাতাল থেকে বাড়ি আসার পরও একই অবস্থা। বরং খরচ আরও বেড়ে গেল। কমলেশের বাবার কোনও আয় ছিল না। বলার মতন তো নয়ই। বুড়ো মানুষ তিনি, ছেলের ওপরই নির্ভর করে থাকতেন। ওঁর নিজের শরীরস্বাস্থ্যও মজবুত নয়। তাঁরও ডাক্তার-বদ্যি ছিল, ওষুধ লাগত। তা সে যাই হোক, টেনেটুনে চালিয়ে যেতে হচ্ছিল।

কমলেশের অফিস এখন পর্যন্ত তার টাকা বন্ধ করেনি। যদিও পাওনা ছুটি বলে তার আর কিছু নেই, খানিকটা অনুগ্রহ করেই মাইনেটা তারা দিয়ে যাচ্ছে। তবে যদি বন্ধ করে দেয় বলার আর কী থাকবে!

এত সব ভেবে কমলেশ আরও মাস দুই বিশ্রাম নিতে, বা এখানে আসতে চায়নি। সুমতি জেদাজেদি শুরু করল। ডাক্তারও বার বার একই কথা শোনাতে লাগল : আরে চাকরি সারা জীবনই আছে, তার আগে নিজেকে একটু সামলে নিন।

বাধ্য হয়েই কমলেশকে রাজি হতে হল সুমতির কথায়। বন্ধুরাও বলল, আরে যাও না, আমরা তো আছি, চাকরি নিয়ে তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না। আর টাকাপয়সার টানাটানি পড়লে আমরা শালা কোন কর্মে আছি! কমলেশ জানে, বন্ধুরা তার অসুখের সময় যথাসাধ্য করেছে।

জীবনটা মাঝে মাঝে বড় ঝঞ্ঝাট ঝামেলায় ফেলে দেয়। দুর্ভাগ্য হয়তো। কিন্তু কী করা যাবে!

মাঠের মধ্যে অশ্বত্থ গাছটার তলায় এসে দাঁড়াল কমলেশ। ছায়া হেলে থাকলেও গাছের তলায় দাঁড়াল কমলেশ। এতক্ষণ রোদে হাঁটার দরুণ তার মাথা মুখ কান গরম হয়ে রয়েছে। পুলওভার আর মাফলারও গরম। গলা থেকে মাফলারটা খুলে নিল।

আগে একেবারেই লক্ষ করেনি। হঠাৎ চোখে পড়ল, বাঁদিকের একটা ঝোপের আড়াল থেকে কারা যেন এগিয়ে আসছে। ঝোপটা দেহাতি খেতখামারির মতন।

বেড়া দেওয়া রয়েছে। তাকিয়ে থাকল কমলেশ। দুটি মেয়ে, একটি ছেলে। যেভাবে হেঁটে আসছিল— মনে হল, হইচই করতে করতে আসছে। বেড়াতে বেরিয়েছিল সম্ভবত।

কাছাকাছি এসে তারা দাঁড়িয়ে পড়ল।

কমলেশ দেখছিল। দেখতে দেখতে সে অবাক হয়ে কী যেন বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই ছেলেটি বলল, "আরে, কমলেশদা! তুমি?"

চিনতে না পারার কোনও কারণ ছিল না। কমলেশ বলল, "উৎপল, তুই!"

"তুমি এখানে কোত্থেকে?"

"তুইও কোত্থেকে হাজির হলি!"

"আমরা কাল এসেছি। 'রেণু কুটিরে'।"

"রেণু কুটির?"

"ওই যে হনুমান মন্দিরের কাছে।"

"আচ্ছা! আমার ওদিকটায় তেমন যাওয়া হয়নি। বুঝতে পারছি!"

"তুমি এখানে হঠাৎ!! দাঁড়াও, এই দুই লেডির সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই। ও হল লতা। লতা মংগেশকার নয়। লতিকা সরকার। আমরা ওকে লতা বলে ডাকি। ...আর ওই যে ফিকে ফিকে রোদের রংয়ের মতন মেয়েটি— ওর নাম হৈমন্তী। ওকে তুমি মন্তী বলে ডাকতে পার। বা হিমু।"

"কী হচ্ছে ছোড়দা!" বলে হৈমন্তী চোখ কোঁচকাল।

"এ হল আমাদের কমলেশদা। আমার পুরনো পাড়ার লোক। একসময় আমাদের গুরু ছিল।" উৎপল হেসে উঠল। মেয়েদুটিও আলগাভাবে হাসল। "তা তুমি এখানে কেন? কতদিন পরে তোমায় দেখলাম।"

কমলেশ বলল, "আমিও তোকে দেখছি। চেহারাটা যা করেছিস— মনে হচ্ছে ওই যে পপ্ সিঙ্গার—কী নাম যেন— আজকাল এত নাম শুনি—!"

"গুলি মারো পপ্ সিঙ্গারে। আমি গানের 'গ' জানি না। তবে চেঁচাতে পারি। ফেউ ডেকে শোনাব?"

কমলেশ হাসল। হাত তুলে বলল, "থাক। তুই বাস্তবিকই আমায় চমকে দিয়েছিস। এখানে তোকে দেখব স্বপ্নেও ভাবিনি।"

"আমারও একই প্রশ্ন! তুমি এখানে কেন?"

কমলেশ মেয়েদুটির দিকে তাকাল। সমবয়সি। বাইশ-চব্বিশ হবে হয়তো। লতিকা শ্যামলা রঙের, মোলায়েম মুখশ্রী, সালোয়ার কামিজের ওপর পুরো হাতা ভেস্ট, বুক খোলা জামার ওপর উলের চাদর চড়ানো। লম্বা বিনুনি ঝুলছে পিঠের ওপর। হৈমন্তী খুবই ফরসা, রোগাটে মুখে কেমন এক লাবণ্য। টানা টানা চোখ। তার পরনেও সালোয়ার কামিজ, বাহারি পুরো হাতা সোয়েটার। মাথার চুল উসকোখুসকো। ওর চুল ঘাড় পর্যন্ত।

কমলেশ বলল উৎপলের দিকে তাকিয়ে, "কেন এসেছি বলতে হলে অনেক বলতে হবে।"

"লং স্টোরি?"

"হ্যাঁ। ...পরে শুনবি।"

"তুমি কোথায় আছ?"

কমলেশ হাত তুলে মাঠের অন্য প্রান্ত দেখাল। "লালাসাহেবের বাংলোয়।"

"কে লালাসাহেব?"

"সেটাও লং স্টোরি।" কমলেশ হাসল, "এভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে অত কথা বলা যায় না। তুই আছিস তো এখন। পরে শুনিস।"

"ও. কে। তুমি কি ফিরছ এখন?"

"হ্যাঁ। তোরা?"

"আমরা ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। আর খানিকটা ঘুরে ফিরে যাব।"

"এখন তা হলে তোরা আয়।"

"বিকেলে তোমায় কোথায় পাব?"

"কোথায় পাবি! তুই ইচ্ছে করলে আমার আস্তানায় চলে আসতে পারিস।"

"নো প্রবলেম। এইদুটোকে বাড়িতেই রেখে আসব। মাসিমার সঙ্গে বসে বসে তাস খেলবে!"

হৈমন্তী বলল, "আহা, তাস খেলবে! কেন? আমরা তাস খেলতে এসেছি!"

"কী করবি তবে?"

"বেড়াব।"

"তোদের ঠ্যাঙের জোর থাকলে বেড়াবি। কিন্তু মনে রাখিস, এ তোর কলকাতা নয়। গড়িয়াহাটার মোড় হলে সেফ্ থাকতিস। আলো দোকান লোকজন হইহট্টগোল। এখানে শেয়াল ডাকে, ঘুটঘুটে অন্ধকারে এক-আধটা বাঘের বাচ্চা..."

কমলেশ হেসে উঠল।

হৈমন্তী বলল, "সে আমরা বুঝব! আর আজ অন্ধকার কোথায় পাচ্ছ! শুক্লপক্ষ চলছে।"

উৎপল কাঁধ ঝাঁকাল। "তবে আর কী! জ্যোৎস্না রাতে করে বেড়াস...।"

কমলেশ নিচু গলায় বলল, "মাসিমা মানে?"

"মন্তী আমার মেজো মাসির মেয়ে। মাসতুতো বোন। আর লতা হল মন্তীর বন্ধু। ভাল গান গায়। সাইন্স কলেজে পড়ছে, ফিজিওলজি...।"

"ও! খুব ভাল। তোরা তবে আয়। আমি ফিরব। টায়ার্ড লাগছে।"

"এসো। আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব। টুডে অর টুমরো! ও.কে?"

ওরা আর দাঁড়াল না।

কমলেশ অল্পসময় দাঁড়িয়ে থেকে দেখল ওদের। অতি উজ্জ্বল, তপ্ত রোদ, পৌষের দমকা হাওয়ার মাঝ দিয়ে ওরা চলে যাচ্ছে মাঠ ভেঙে। ভাল লাগছিল দেখতে। হঠাৎ সে অনুভব করল, কিছুক্ষণ আগে মধুসূদনবাবুর সঙ্গে কথা বলার সময় তার মনে কেমন এক বিষণ্ণতার ভার নেমেছিল। নামারই কথা। ওঁর কাহিনীর মধ্যে যে বেদনা ছিল তা স্পর্শ করাই স্বাভাবিক। বোধহয় কমলেশ সেই বিষণ্ণতার ঘোরেই ছিল খানিকটা।

এখন তার মনোভাব হালকা হয়ে আসছে। উৎপল আর ওই মেয়েদুটি আচমকা

যেন সরল এক খুশির অনুভূতি ছড়িয়ে দিয়ে চলে গেল।

উৎপলকে কমলেশ ছেলেবেলা থেকে চেনে। কমলেশদের পাড়াতেই থাকত ওরা। উৎপলের বাবা সরকারি চাকরি করতেন। ভাল চাকরি। মা স্কুলে পড়াতেন। দুজনেই ছিলেন সামাজিক। আন্তরিক ব্যবহার ছিল দুজনেরই। উৎপলের মা বিজয়া মাসিমা ছিলেন দেখতে সুন্দর। অভিজাত চেহারা। উনি নাকি বড় বাড়ির মেয়ে—মানে কলকাতার বনেদি বংশের মেয়ে ছিলেন। তা কী ছিলেন তাতে কিছু আসে যায় না, পাড়ার মেয়েমহলে তাঁর প্রতিষ্ঠা ছিল। ওঁদের একটা সমিতি ছিল, বিজয়া মাসিমা ছিলেন সমিতির মাথা। ছোটখাটো সামাজিক কাজকর্ম করত সমিতি।

উৎপলরা পাড়া ছেড়ে চলে যায় যখন তখন সে সাবালক। কেমিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং পাশ করতে চলেছে। ওর বাবা লেক গার্ডেন্সের দিকে জমি কিনে রেখেছিলেন আগেই ; রিটায়ার করার মুখে বাড়ির কাজে হাত দেন।

কমলেশের যতদূর মনে পড়ছে, বাড়ি পুরোপুরি শেষ হবার আগেই মাসিমারা পুরনো পাড়া ছেড়ে চলে যান। অবশ্য নতুন বাড়িতে থাকার মতন ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল। উৎপল তখন পুরনো পাড়ার মায়া কাটাতে পারেনি। মাঝে মাঝেই আসত আড্ডা মারতে তার বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে। শেষে কদাচিৎ। তারপর ওকে আর দেখা যেত না।

কমলেশ উৎপলকে শেষ দেখেছে বছর তিনেক আগে। কখনও সখনও রাস্তাঘাটে ওদের দেখা হয়ে গেলেও তখন ওদের কারও হাতে অত সময় থাকত না যে কোথাও বসে দেদার গল্প করবে। কাজেই পরস্পরের সাধারণ খবর নেওয়া ছাড়া সবিস্তারে কিছু জানা হত না। তবে উৎপলের বাবা-মা তখন বেঁচে ছিলেন, বাবার যে এবার মাঝারি হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল তাও বলেছিল উৎপল।

শেষ দেখা এক বৃষ্টির দিনে। সন্ধেবেলায়। কলকাতা জলে ভাসছে। এসপ্লানেডের আশপাশে অফিসবাবুদের ভিড়। ছোটাছুটি। বাস মিনিবাস চোখে পড়লেই ঝাঁপিয়ে পড়া, ট্যাক্সি চোখেই পড়ে না। ট্রাম বন্ধ। এলাকার আলোগুলোও জল মেখে কেমন নিষ্প্রভ।

ওই অবস্থার মধ্যে উৎপলকে দেখতে পেয়েছিল কমলেশ। দু দণ্ড দাঁড়িয়ে কথা বলার অবস্থা নয় তখন। ওরই মধ্যে উৎপলের বাবার চলে যাওয়ার কথা শুনেছিল কমলেশ। আর শুনেছিল, উৎপল আগের চাকরি ছেড়ে এখন অন্য একটা কম্পানিতে চাকরি করছে।

তারপর আর দেখা হয়নি দুজনে।

আজ হল। একেবারে অন্য পরিবেশে।

কমলেশের হঠাৎ মনে হল, কী আশ্চর্য! কথাবার্তা যা হল, তার মধ্যে কমলেশ একবারও তো বিজয়া মাসিমার কথা জানতে চায়নি। তার মনেও পড়েনি। কেন? উৎপলও কিছু বলেনি।

নিজের ওপরই বিরক্ত হল কমলেশ। তারা যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে! স্বাভাবিক আচরণগুলো আর মাথায় আসে না।

তবে, কমলেশ অনুমান করল, উৎপল ভালই আছে। তাকে রীতিমতো ঝকঝকে

দেখাচ্ছিল। জীবন্ত। উৎফুল্ল। বোধহয় সংসারে আরও কোনও বড় আঘাত সে পায়নি। বিজয়া মাসিমা নিশ্চয়ই বেঁচে আছেন। থাকারই কথা। ওঁর বয়েস এখন মোটামুটি বাষট্টি-চৌষট্টি হবে। কমলেশের মা বেঁচে থাকলে আরও খানিকটা বয়েস হত। আটষট্টির মতন। বাবা পঁচাত্তর পেরিয়ে যাচ্ছে।

রোদ সরাসরি মুখে লাগায় কমলেশের কপালে কয়েক ফোঁটা ঘাম জমছিল। চশমাটা চোখ থেকে খুলে মুছে নিল একবার।

লালাসাহেবের বাংলোর কাছাকাছি চলে এসেছে সে। ফটকের বাইরে ইউক্যালিপটাসের মাথার ডালগুলো বাতাসে হেলছে দুলছে। গাছের তলায় পাতা ঝরেছে অনেক, শুকনো পাতা।

কমলেশের হঠাৎ খেয়াল হল, আজ বিকেলে যদি উৎপল আসে, আর আসার পর দেখে সে লালাসাহেবের আউট হাউসে দুটো ঘর নিয়ে রয়েছে—স্বভাবতই তার কিছু কৌতূহল হতে পারে। পাশের ঘরে এখনও সুমতির খুচরো ক'টা জিনিস, একটা-দুটো শাড়ি জামা পড়ে আছে। ঘরটা না হয় বন্ধ করেই রাখা গেল। কিন্তু লালাসাহেব আর ইন্দিরা মাসিমার মুখে সে তো সুমতির কথা জানতেই পারবে।

কোথাও যেন খানিকটা সংকোচ এবং দ্বিধা হল কমলেশের। অকারণেই। সে তো বিয়ে করতেই পারে, তার বিয়েটা সাতপাকে ঘোরা অগ্নিসাক্ষি-করা বিয়ে না হলেই বা কী! তবু যদি উৎপল শোনে, কমলেশদার স্ত্রী, স্বামীকে সুস্থ করার জন্যে ধরেবেঁধে এখানে নিয়ে এসে রেখে গিয়েছে মাস দুয়েকের জন্যে—হয়তো অবাক হবে। 'আরে সে কী! তা বউদি নিজেও তো এখানে থাকলে পারত।...কী বলছ, বউদির চাকরি! যা বাব্বা, চাকরি করলে কি ছুটি ম্যানেজ করা যায় না! না-হয় মাইনে কাটা যেত। সো হোয়াট!'

কমলেশ তখন কী বলতে পারবে, না রে টাকাপয়সারও একটা প্রবলেম রয়েছে। লজ্জা করবে অবশ্যই।

পাঁচ

লালাসাহেব আর চুনিমহারাজ বসে বসে গল্প করছিলেন। ইন্দিরা ভেতরের ঘরে কোনও কাজে ব্যস্ত।

কমলেশ এল। হাতে বাসি খবরের কাগজ। এখানে কাগজ আসার কোনও নির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেই। স্টেশনের একটা লোক, মণিহারি দোকানদার, দু-তিন দিনের কাগজ তার সুবিধে মতন ট্রেকারের ড্রাইভার বা এখান থেকে যে যায় এদের কারও সঙ্গে দেখা হলে তাদের হাত দিয়ে কাগজ পাঠিয়ে দেয় শান্তিনিবাসে। সেখান থেকে আবার কেউ দিয়ে যায়।

কমলেশ অপেক্ষা করছিল উৎপলের জন্যে। উৎপল এল না। আজ আর পারেনি ; আগামীকাল হয়তো আসবে। সে তো বলেই দিয়েছিল, আজ কিংবা কাল সে হাজির হবে।

সন্ধে হয়ে গিয়েছিল। কাগজগুলো রেখে দিল একপাশে।

লালাসাহেব কী যেন বললেন চুনিমহারাজকে। কমলেশ অন্যমনস্ক থাকায় খেয়াল করে শোনেনি।

চুনিমহারাজ হাতের লাঠিটা তুলে নিলেন মেঝে থেকে। পড়ে গিয়েছিল।

কমলেশ চুনিমহারাজকে দেখল।

চুনিবাবুকে কেন চুনিমহারাজ বলা হয় কমলেশ জানে না। মহারাজের বেশবাস তাঁর নয়। খদ্দরের ঢলঢলে এক পায়জামা তাঁর পরনে। ভেতরে হয়তো শীতের দিনে একটা ড্রয়ার্স পরেন। গায়ে ছাই রঙের মোটা খদ্দরের পাঞ্জাবি। তার ওপর খরখরে গরম কাপড়ের জহরকোট, সঙ্গে একটা মোটা চাদর। মাথায় গোল ফেটটি টুপি।

ভদ্রলোকের বয়েস ষাটের কাছাকাছি। শক্তসমর্থ চেহারা। মাথায় স্বাভাবিক, মাঝারি লম্বা। চোখদুটিও যেন কৌতুক-মাখানো। গলার স্বর মোটা। সামান্য টেনে টেনে কথা বলেন। উনি পাইন লজে থাকেন। বলেন, বাড়ির কেয়ারটেকার। ওঁর পায়ে এখন মোজা। ঘরে আসার আগে বাইরে ক্যানভাস জুতোজোড়া খুলে রেখে আসেন।

লালা বললেন, "আপনার তা হলে এ-বছরও যাওয়া হল না?"

"না—", চুনিমহারাজ বললেন, "যার জন্যে যাওয়া তিনিই থাকবেন না, গিয়ে কী করব!"

লালা মাথা নাড়লেন। "তা অবশ্য ঠিক। গিয়েছেন কোথায়?"

"আলমোড়া। চিঠি থেকে স্পষ্ট বুঝলাম না। উনি নিজের হাতে চিঠি লেখেননি, ওঁর হয়ে কেউ লিখে দিয়েছে। আলমোড়ার আশেপাশেও হতে পারে। কেন গিয়েছেন বুঝলাম না।"

কমলেশ শুনেছে, চুনিমহারাজ এখানে বেশিদিন আসেননি। বছর তিনেক আগে তিনি পাইনদের বড় কর্তার সঙ্গে এসেছিলেন বন্ধু বা সঙ্গী হিসেবে। সেবার পাইন পরিবারের আরও ক'জন ছিল। মাসখানেক পরে পাইনরা ফিরে যায় ; রেখে যায় চুনিমহারাজকে। তখন থেকেই তিনি পাইন লজের কেয়ারটেকার। দায়টা পাইনদের বড়কর্তাই তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে যায়, না, নিজেই তিনি দায়িত্বটা ঘাড় পেতে নিয়ে নেন বলা মুশকিল। পাইনদের বিশাল ব্যবসা, লোহালক্কড়ের। রোলিং মিলও ছিল এককালে পার্টনারশিপে। সেটা আগেই গিয়েছে। এখন লোহার ছড়, অ্যাংগেল, লোহার চাদর বা শিট থেকে কলের পাইপটাইপ সবই বিক্রি হয়। হাওড়ার আদি বাসিন্দে পাইনরা। ধনী লোক। তাদের কম করেও দু-তিনটে বাড়ি ছড়িয়ে আছে বাইরে, শিমুলতলায়, ঘাটশিলায়, পুরিতে। এখানকার বাড়িটা ছিল চার নম্বর। যে-কোনও কারণেই হোক, বড়কর্তা ছাড়া পরিবারের অন্যরা এখানকার বাড়ি সম্পর্কে উৎসাহহীন। নিতান্ত বড় কর্তার শখ বা সাধের বাড়ি বলে পড়ে আছে এটা। নয়তো বেচে দিত ছেলেরা। তাদের কথা হল, নিত্যপ্রয়োজনের কিছুই যেখানে পাওয়া যায় না, ফাঁকা বসতিহীন এই বুনো জায়গায় বাড়ি রেখে কী লাভ? বড়কর্তার অনিচ্ছেয় বাড়ি বিক্রি হয়নি। চুনিমহারাজ বাড়ি আগলান, আর কেউ যদি ভাড়া নিয়ে এক আধমাস থাকতে চায়—তার ব্যবস্থা করেন।

চুনি মহারাজ মানুষটি খানিকটা অদ্ভুত। পাইন লজ ছেড়ে তিনি চলে যেতে

পারতেন। কোনও বাধ্যবাধকতা ছিল না যে তাঁকে থাকতেই হবে। বন্ধুর অনুরোধ তো দাসবৃত্তি নয় যে থাকতেই হত। কিন্তু তিনি যাননি। বরং এখানে একটি জায়গা পছন্দ করে, তিনি চার-পাঁচ বিঘে জমি কিনেছেন। যদিও জমি এখানে সস্তা। জমির চারপাশে ইটের গাঁথনি দিয়ে সীমানাও ঘিরে রেখেছেন।

তাঁর সাধ বা ইচ্ছে এখানে একটি অনাথালয় বা অরফানেজ্ করবেন। সেখানে এই অঞ্চলের আদিবাসী শিশুবালকদের ঠাঁই হবে। অরফানেজ ফর ট্রাইবাল চাইল্ড। অবশ্য ছেলেদের জন্যে। ছোট একটি নিকেতন। এখানে সচ্ছলভাবে থাকা যাবে না। তবে স্বস্তির সঙ্গে থাকা যেতে পারে। দুটি অন্ন, নিশ্চিন্ত একটা আশ্রয় পেলে এদের বিড়ম্বনা কমবে ছাড়া বাড়বে না।

চুনিমহারাজ আশা করেছিলেন, বিরজানন্দ সেবাশ্রম সংঘের সাধন মহারাজের কাছ থেকে তিনি কিছু অর্থ সাহায্য পাবেন। গোড়ায় চিঠিপত্রে তেমন একটা আশ্বাসও তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু গত দেড় বছরের মধ্যে অন্য তরফের কোনও উদ্যোগ দেখেননি তিনি। এমনকী চুনিমহারাজ নিজে দেখা করতে যেতে চেয়েছিলেন বার দুই। তাঁকে সে-সুযোগও দেওয়া হচ্ছে না।

চুনিমহারাজ অবিশ্বাসযোগ্য মানুষ নন। তাঁর পরিবারগত পরিচয় উপেক্ষা করার উপায় নেই। নিজেও তিনি একসময়ে মিশন স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর সঙ্গে বনিবনা না-হওয়ায় স্কুল ছেড়ে দেন। পরে মিশনারি কলেজেও পড়িয়েছেন। সেখানে বছর দুই ছিলেন। চুনিমহারাজ ঘরসংসারও করেছেন। তাঁর স্ত্রী যে স্বাভাবিক ছিলেন না—এটা পরে বোঝা যায়। মানসিক ভারসাম্য স্ত্রীর ছিল না। আত্মহত্যার প্রবণতা ধরা পড়ত। পরে তিনি অসুস্থ হয়ে মারা যান।

সে সময় চুনিমহারাজের পরিচয় ছিল চিন্ময় মজুমদার হিসেবে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর দু-তিন বছর ঘাটে আঘাটে ঘুরে ভদ্রলোক পাইনবাবুর সঙ্গে এখানে এসে পড়েন। চিন্ময় বা চিনুবাবু বলেই লোকে তাঁকে জানত। চুনিমহারাজ নামটা বা সম্বোধনটা লালাসাহেবেরই দেওয়া, কৌতুক করে। ওটাই এখন চালু হয়ে গিয়েছে।

কমলেশ এসবই লালাসাহেব আর ইন্দিরা মাসিমার মুখে শুনেছে।

লালাসাহেব সামান্য অপেক্ষা করে বললেন, "আপনি বোধহয় বৃথা আশা করে বসে আছেন!"

"আমারও আর এই ভিক্ষে চাওয়া পোষাচ্ছে না।"

"তা আপনার বন্ধু পাইনবাবুকে বললে তিনি তো সাহায্য করতে পারতেন।"

"রমেন জানে। পাঁচ-দশ হাজার টাকা সে দিতেও পারে। আমি চাইনি কোনওদিন। নিলে বন্ধুর কাছে নয়, তার ছেলেদের কাছে আমার মাথা নিচু হয়ে থাকত।"

"হ্যাঁ, সেভাবে ভাবলে—।"

"শুনুন লালাবাবু", চুনিমহারাজ বললেন, "আমার বন্ধু আমাকে বলে, তুমি পাগল! অন্যের দুঃখ বুঝতে গিয়ে তুমি নিজে ঝঞ্ঝাট টেনে আনবে কেন? পরে এর কী হবে তুমি জান না! তোমাকেই এরা অপদস্থ করবে, চোরচামার বলবে। তুমি ভাবছ, দশ-বিশ জনের চোখের জল তুমি মুছিয়ে দেবে—দিতে পার। কিন্তু একদিন ওরাই

তোমায় কাঁদিয়ে ছাড়বে। এই সংসারের হাল তুমি কোনওদিন বুঝবে না, চিনু?"

"আপনি কী বললেন?"

"বললাম, কাঁদাবার লোক জগতে একজনই আছেন। তিনি চাইলে কাঁদব।"

কমলেশ হঠাৎ বলল, "কে একজন? ভগবান?"

"হ্যাঁ।"

"আপনি ভগবানে বিশ্বাস করেন?"

"করি", চুনিমহারাজ স্পষ্ট গলায় বললেন। "করলে কি দোষ হয়?"

কমলেশ কেমন বিব্রত হল। মৃদু গলায় বলল, "না, আমি দোষের কথা বলিনি। কিন্তু আপনার কি জপতপের অভ্যেস আছে।"

"জপতপ মানুষের নিজের ব্যাপার। তার মরজি। যে করে সে করে, যার মন চায় না সে করবে না। আমি কে যে তাঁকে হুকুম করব। শোনো, অনাথালয় না হয়ে যদি আশ্রমই হয়—, যদি হয়, সেটা হবে আমার নিজেকে গ্লানি থেকে বাঁচিয়ে রাখা, ক্ষোভ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা।... আমি জানি, খেতে পরতে পেলেই ক্ষোভ দুঃখ যায় না। কিন্তু কমলেশ, মানুষের মন শোধরানোর মন্ত্র তো আমার জানা নেই।"

কমলেশ চুপ করে থাকল।

লালা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন ইন্দিরা এসে বসলেন ঘরে। তাঁর শরীর ততটা ভাল নেই। হাঁটুর ব্যথাটা বেড়েছে। দু-একদিন ভোগাবে, কমবে, আবার একদিন বাড়বে। তাঁর বাতের ধরনই এই রকম। বাড়লে মালিশ, সেঁক, গরম কাপড়ের পট্টি জড়ানো। ওইভাবেই থাকেন, তবু শুয়েবসে সময় কাটান না। খুটখাট কাজকর্ম, হয়তো অহেতুক, হাতে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঘোরাফেরা করেন।

চুনিমহারাজ বললেন, "আসুন দিদি, আপনাকে এতক্ষণ দেখতে পাচ্ছিলাম না।"

ইন্দিরা বসলেন। গায়ের শালের খানিকটা মাথায় দিয়েছেন। কান ঢাকা পড়েছে। গায়ে উলের জামা।

লালা ঠাট্টার সুরে বললেন, "বাত ওঁর হাঁটু ধরেছে। উনি বলছিলেন, পূর্ণিমা কেটে গেলেই কমে যাবে।"

চুনিমহারাজ বললেন, "আজ যে পূর্ণিমা আমার খেয়াল ছিল না। শুক্লপক্ষ চলছে দেখলাম। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় আকাশের দিকে চোখ পড়তেই বুঝলাম পূর্ণিমা। এসময় বেশির ভাগ দিন সন্ধের আগে থেকেই কুয়াশা জমে। আজ দেখলাম তখনও কুয়াশা ঘন হয়নি। কেন কে জানে!"

ইন্দিরা বললেন, "কাল লোক পাঠাব। আপনাদের বাড়িতে বাড়তি দড়ি থাকলে দিয়ে দেবেন তো! আমাদের ইঁদারা থেকে জল তোলার দড়ির একটা জায়গা ছিঁড়ে যাচ্ছে। দেখি, কবে লোক পাঠিয়ে নতুন দড়ি আনাই।"

চুনিমহারাজ মাথা নাড়লেন। "দেবেন পাঠিয়ে।"

লালাসাহেব বললেন, "আচ্ছা মহারাজ, আপনি পাইনবাবুদের সঙ্গে একটা রফা করে নিন না।"

"রফা!"

"বাড়িটা কিনে নিন। ওঁরা তো এখানে এসে থাকবেন না। কর্তা গত হলে তাঁর

ছেলেরা বাড়িটা বেচে দেবে বলে আপনার ধারণা। তা যদি হয়, তবে কর্তা থাকতে থাকতেই বাড়িটা আপনি কিনে নিতে পারেন।"

"টাকা?"

"আপনার কেনা জমিটা বেচে দিন।"

"সে-টাকায় বাড়ি কেনা যাবে না, লালাবাবু। আর বাড়ি কিনে আমি কী করব! আমি..."

লালা বাধা দিয়ে বললেন, "বাড়িটা কিনলে হয়তো আপনি আপনার কাজটা শুরু করতে পারতেন।"

চুনিমহারাজ হাসলেন। "যা হয় না তা ভেবে লাভ নেই। পাইনের বাড়ি শখের বাড়ি। দু চারটে ঘর থাকলেও সেটা অনাথালয় করা যায় না।"

"জায়গাও তো আছে।"

"তাতে আমার লাভ!"

"তবে মশাই, আপনি শুধু জমি নিয়ে কতকাল বসে থাকবেন?"

"জানি না।" বলে চুনিমহারাজ সামান্য উদাস হয়ে বসে থাকলেন। আচমকা তাঁর কী মনে পড়ে গেল। বললেন, "আপনার কাছে সেই কাগজটা আছে না?"

"কোন কাগজ?"

"আপনার কাছ থেকে কাগজ নিয়ে গিয়ে পড়েছিলাম। মাতা অমৃতানন্দময়ী—।"

লালাসাহেব মনে করতে পারলেন না সঙ্গে সঙ্গে। মাথা নাড়লেন। "খেয়াল হচ্ছে না।"

চুনিমহারাজের চোখে যেন দপ্ করে কেমন এক আলো জ্বলে উঠল। বললেন, "মাতা অমৃতানন্দময়ী কেরলের সামান্য এক জেলের মেয়ে। গরিব, অশিক্ষিত ; তাঁর না ছিল সামর্থ্য না সহায়। ছেলেবেলা থেকে তাঁকে দুঃখদৈন্য সইতে হয়েছে, গুরুজন চেয়েছেন মেয়ে যেন অন্তত একটু লেখাপড়া শেখে। গরজ ছিল না মেয়ের। বিয়ে-থাও করেননি। শুধু একটা ধর্মবিশ্বাস ওঁকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, অবিচল রেখেছিল। একুশ-বাইশ বছর থেকে উনি সত্য অন্বেষণের পথটি খুঁজে পান নিজের মতন করে। তারপর কিছু শিষ্য জুটে যায়। সেই মেয়েটি আজ মাতা অমৃতানন্দময়ী, মানুষের কাছে 'আম্মা'। ওঁর কাজকর্মের মধ্যে এখন আছে, গরিব মানুষের জন্যে আশ্রম, মেয়েদের রুজিরোজগারের ব্যবস্থা করে দেওয়া, চিকিৎসার ব্যবস্থা, ক্যান্সার হাসপাতাল, শ' পাঁচেক রোগীর আধুনিক চিকিৎসা করার বিরাট ব্যবস্থা। আরও কত কিছু...!"

কমলেশ হঠাৎ বলল, "এটা গল্প?"

"গল্প! না। কাগজটা পড়লেই পার। তুমি তো শিক্ষিত। তুমি কি জান, ওঁকে শিকাগোয় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল টু অ্যাড্রেস পার্লামেন্ট অব রিলিজিয়ানের সভায়। ইউনাইটেড নেশনের পঞ্চাশতম বার্ষিকীতেও মা অমৃতানন্দময়ীকে সাদরে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল?"

ইন্দিরা মুগ্ধ হয়ে বললেন, "বাঃ! সামান্য একটা জেলের মেয়ে—! ভাবতেই কেমন লাগে!"

কমলেশ বলল, "এরকম একটা-দুটো হয়তো হয়, কেমন করে হয় তার সব খোঁজ আমরা রাখি না। ধরুন বিবেকানন্দ..."

"বিবেকানন্দর সঙ্গে তুলনা করো না। বিবেকানন্দর সমান শিক্ষা মেধা আর 'আম্মার' সমাজে আকাশপাতাল তফাত।"

"রামকৃষ্ণ তো লেখাপড়ার ধার ধারেননি।"

"না, উনি তোতাপাখির পাঠ নেননি। কিন্তু ওঁর ভেতরের বোধ অনুভূতি যা খুঁজে পেয়েছিল তা তো বইয়ের পাতায় থাকে না।... তোমার চোখের সামনে আকাশের কতটুকু ধরা দেয়—।"

লালাসাহেব আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে বললেন, "চুনিমহারাজ, কে কী পেয়েছেন সেকথা থাক আমরা এক-দুজনকে নিয়ে বিচার করি না, সাধারণ দশজনকে ধরে বিচার করি। আপনি এতই নিঃস্ব যে যা করতে চান তা কি করে উঠতে পারবেন?"

চুনিমহারাজ চুপ করে থেকে পরে নিশ্বাস ফেললেন বড় করে, "না পারলে কী করব বলুন! দুঃখ থাকবে। তবে জগতে দুঃখের পাল্লাটা এত বেশি যে মনকে সান্ত্বনা দেওয়া যায়।...আমি রামায়ণ মহাভারত পড়ি—তখন ভাবি এগুলো তো আসলে দুঃখেরই মহাকাব্য। আদিকাল থেকে এই দুঃখকেই আমরা বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি।"

কমলেশ অন্যমনস্কভাবে ইন্দিরার দিকে তাকাল। উনি মন দিয়ে কথাগুলো শুনছেন। চোখের পাতা আধ-বোজা। কথাগুলো তাঁর মনের মধ্যে কম্পন তুলে ছড়িয়ে যাচ্ছে কিনা বোঝা মুশকিল। হয়তো যাচ্ছিল।

লালা বললেন, যেন ক্রমশ গম্ভীর হয়ে ওঠা পরিবেশটা কাটাতেই এবং সম্ভবত স্ত্রীর মুখে ভেসে ওঠা বেদনার ছায়া লক্ষ করেই, "আপনি 'আম্মা'-টাম্মা ছাড়ুন। আমিও ওটা দেখেছি, মনে পড়ছে এতক্ষণে, খুঁটিয়ে পড়িনি। তা সে যাই হোক, একটা কথা আপনাকে বলে রাখি। পা রাখার জায়গা না পেলে আপনার পক্ষে উঠে দাঁড়ানো মুশকিল। একটু সুযোগ তো দরকার মশাই। পাইনবাবু অন্তত সেই সুযোগ করে দিতে পারতেন।"

চুনিমহারাজের মাথা নাড়া দেখে মনে হল, সে-সুযোগ তিনি নিতে চান না।

কমলেশ আপাতত আর কথা বাড়াতে চাইছিল না। চুনিমহারাজের সঙ্গে কথা বলার তর্ক করার সময় অনেক পড়ে আছে এখন। পরে আবার হবে। অন্য কথা বলাই ভাল। কী মনে করে সে বলল, "এখানে রেণু কুটির কোনটা?"

চুনিমহারাজ তাকালেন। লালাসাহেব দেখলেন কমলেশকে।

"ওই দিকটায়", বলে চুনিমহারাজ একটা দিক দেখালেন, "বালিয়াড়ির দিকে, পলাশ ঝোপ চারপাশে। এখান থেকে খানিকটা দূর। সিকি মাইল হবে। কেন?"

"ওখানে আমার চেনাজানা একটি ছেলে এসে উঠেছে। আজ হঠাৎ দেখা হল...।"

"ও! একটি ছেলে দুটি মেয়ে—! আমিও দেখেছি আজ। দূর থেকেই। সকালে বেড়াতে বেরিয়েছে বলে মনে হল।"

"হ্যাঁ। আমি সুমতিকে ট্রেকারে তুলে দিয়ে, মধুসূদনবাবুর সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করে ফিরছি, হঠাৎ মাঠের মধ্যে দেখা।"

"কবে এসেছে?"

"বলল, গতকাল।"

লালাসাহেব চুনিমহারাজের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ও বাড়িতে লোকজন তো আসে না। অনেক দিন দেখিনি।"

চুনিমহারাজ বললেন, "বাড়িটা থাকার মতন নেই আর। টালির বাড়ি, ছাদ বসে যাচ্ছে। ঘরদোর তালা বন্ধ পড়ে থাকে। কম্পাউন্ড ওয়াল ভাঙা। আগে একটা লোক দেখতাম মাঝে মাঝে বাড়িটা দেখত। আজকাল তাও দেখি না।"

"গোস্বামীর বাড়ি না? জামশেদপুরের লোক বলে শুনেছিলাম।"

"আমিও তাই শুনেছি। তবে ভদ্রলোককে দেখিনি। আপনি দেখেছেন। আমি এখানে আসার আগেই উনি মারা যান।" বলে চুনিমহারাজ কী যেন ভাববার চেষ্টা করলেন। মনে পড়ল। বললেন, "বছর তিনেক হবে। একবারমাত্র ও বাড়িতে লোক দেখেছিলাম। জনা দুই-তিন। দুটি মহিলা, বয়স্ক এক ভদ্রলোক। আলাপ হয়নি। হপ্তাখানেকও ছিলেন না।...তারপর আর কাউকে দেখিনি।"

লালা স্ত্রীর দিকে তাকালেন। "আচ্ছা, শোনো—গোস্বামী একবার আমাদের বাড়ি এসেছিল না?"

ইন্দিরা মাথা নাড়লেন। "হ্যাঁ। ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছিল। লম্বা, ছিপছিপে, গায়ের রং কালো, মাথার চুল সব সাদা, চুরুট মুখ থেকে নামে না।"

লালা বললেন, "ঠিকই বলেছ। ওঁকে আর কোনওদিন দেখিনি।"

চুনিমহারাজ বললেন, "বাড়িটা শুনেছিলাম অন্য কেউ কিনে নিয়েছে, বা নেব নেব করছে। পরের খবর জানি না।"

কমলেশ সকালের কথা ভাবল। উৎপল বলেছিল, তার সঙ্গের দুটি মেয়ের মধ্যে হৈমন্তী নামের মেয়েটি তার মাসতুতো বোন। গোস্বামীবাবু কি উৎপলের মেসোমশাই ছিলেন! তাঁর স্ত্রী, মেয়ে, মেয়ের বন্ধুকে নিয়ে উৎপল এসেছে? নাকি, বাড়ি হাতবদল হয়ে এখন অন্য কারও হাতে, তারাই এসেছে হঠাৎ বেড়াতে, সঙ্গে উৎপল।

ব্যাপারটা পরে জানা যাবে, উৎপলের সঙ্গে দেখা হলে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ, কথা বলল না কেউ।

শেষে চুনিমহারাজ বললেন, "এবার উঠি। রাত হচ্ছে।"

"আলো এনেছেন?"

"আছে", চুনিমহারাজ জামার পকেট দেখালেন। "তবে আজ পূর্ণিমা। রাস্তাঘাট চকচক করছে, আলো বোধহয় লাগবে না তেমন।"

"আপনি এখনও চোখে ভাল দেখেন। আমি সন্ধে হলেই হোঁচট খাই। চোখদুটো যাব যাব করছে", লালা হেসে বললেন।

দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন চুনিমহারাজ। তিনিও হালকা গলায়, হাসি মুখেই বললেন, "চোখ থাকলেও কি গর্তে পা পড়ে না, লালাবাবু? তাও পড়ে।"

"আপনার না পড়লেই হল।" লালাসাহেবও উঠে দাঁড়ালেন। সৌজন্য। দরজা খুলে বারান্দা পর্যন্ত এগিয়ে দেবেন।

"আসি, দিদি।"

"আসুন।"

কমলেশের দিকে তাকিয়ে ঘাড় হেলালেন। বিদায় নিলেন।

চুনিমহারাজ নিজেই দরজা খুললেন। শীতের হাওয়া আর কনকনে ঠান্ডা যেন ঘরে ঢুকল ঝাঁপ দিয়ে। চাঁদের আলো এসে পড়েছিল বারান্দায়।

ইন্দিরা অস্পষ্টভাবে কী যেন বললেন, কমলেশ শুনতে পেল না।

ছয়

পরের দিন সকালে উৎপল এল।

নিজের ঘরের বাইরে ক্যাম্বিসের ডেকচেয়ারে গা ডুবিয়ে বসেছিল কমলেশ। এক টুকরো বারান্দা। রোদ ছড়িয়ে আছে। মাথা বাঁচিয়ে বসে থাকার দরুন তার বুক পর্যন্ত রোদ, মুখ মাথায় ছায়া। হাতে একটা বই। লালাসাহেবের বইয়ের আলমারি থেকে আগেই নিয়ে এসেছিল। পুরনো বই। একনাগাড়ে পড়া হয়ে ওঠে না। মাঝে মাঝে পড়ে, আবার বন্ধ করে রেখে দেয়।

কমলেশ আধ-খোলা বইটা কোলের ওপর রেখে অন্যমনস্কভাবে সামনে তাকিয়েছিল। একটা ভোমরা উড়ে এসেছে। আপন খুশিতে উড়ছে। মৃদু শব্দ হচ্ছিল।

পায়ের শব্দে ঘাড় ফেরাল কমলেশ। উৎপল।

"তুই!"

"কাল আর আসতে পারলাম না। আজ সকালেই চলে এলাম।"

"বোস!...দাঁড়া ঘরে একটা বেতের চেয়ার আছে এনে দিই।"

"তোমায় উঠতে হবে না, আমি আনছি। ওই ঘরটা?"

কমলেশের ঘরের দরজা খোলা ছিল। ভেতরের জানলাও খোলা। উৎপল ঘর থেকে চেয়ার টেনে নিয়ে এল।

"তোমার এই আস্তানা খুঁজে পেতে আমার কোনও ট্রাবলই হল না। সোজা এলাম, পেয়ে গেলাম।"

"বাইরে কাউকে দেখলি?"

"না। কুয়াতলার দিকে একটা লোক জল তুলছে। জিজ্ঞেস করলাম। বলে দিল। দারুণ জায়গায় আছ তুমি। ফটকের বাইরে ইউক্যালিপটাস গাছ, মার্ভেলাস!"

"এটা লালাসাহেবের বাংলো বাড়ি। আমি পেছনে আউট হাউসে আছি।"

"আউট কীগো, এ তো দিব্যি ইন...! রিমেমবার অ্যান ইন মিরান্ডা...!"

"কাল তোর জন্য ওয়েট করছিলাম—!"

"আরে কী বলব! কাল বিকেলটা তো গেলই, অমন ওয়ান্ডারফুল জ্যোৎস্নার সুধাও পান করা গেল না। পদসেবা করে কেটে গেল।"

"পদসেবা—!" কমলেশ অবাক হয়ে তাকাল।

"ওই লতা! ওবেলা, কাল, বাড়ি ফেরার পথে মিস লতা পাথরে হোঁচট খেয়ে গোড়ালি মচকে এক কাণ্ড বাঁধিয়ে বসল। গোড়ালি ফুলে ঢোল। কলকাতার ডেলিকেট বডি তো, হাড়গোড় পলকা। অ্যায়সা মুখচোখ করল, যেন গোড়ালির হাড়ই ভেঙে গেছে। সিম্পল চুন-হলুদ লাগাব তার ব্যবস্থাও নেই। তখন সেরেফ, হট

অ্যান্ড কোল্ড ওয়াটার ট্রিটমেন্ট, সেইসঙ্গে হিমুর মাথা ধরার মলমের মালিশ...। রাত্রে পা খানিকটা বাগে এল।...বুঝলে কমলেশদা, এইজন্যেই বলে পথে নারী বিবর্জিতা। কারেক্ট?"

কমলেশ হেসে ফেলল। "তোর পদসেবার গুণ আছে বল।"

"শুধু পদসেবা নয়, প্রেমসেবাও—"

"প্রে-ম!"

"আছে। এখনও ফিফটি ফিফটি চলছে। বাড়তেও পারে।" উৎপল চোখ টিপল মজা করে।

কমলেশ জোরে হেসে উঠল। হেসে ওঠার পরই তার মনে হল, কত দিন পরে যেন এমন জোরে প্রাণখোলা হাসি হাসল।

"তোমার খবর বলো? তুমি এখানে এইভাবে—?" উৎপল বলল।

"তোর খবরই পুরো শোনা হল না।"

"পরে শুনবে। ইন শর্ট, আমি আমার এক মাসি—নিজের নয়, তাকে আর মাসির মেয়ে হিমু, তার বন্ধু লতাকে নিয়ে হপ্তাখানেকের জন্যে এখানে এসেছি। মাসিই আমায় ধরে এনেছে। জাস্ট বেড়াতে। মাসির অন্য একটা মতলবও আছে, তাতে আমার কোনও ইন্টারেস্ট নেই।"

কমলেশ গতকাল লালাসাহেব আর চুনিমহারাজের কাছে যা শুনেছিল সে-প্রসঙ্গে গেল না আপাতত।

"তুমি এখানে কতদিন?" উৎপল বলল।

"আট-দশদিন হতে চলল।"

"এখানে কেন?"

কমলেশ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "লম্বা ইতিহাস!"

"হোক লম্বা, বলো।"

কমলেশ জানে, উৎপলের কাছ থেকে সে কিছুই লুকোতে পারবে না। তার পাশের ঘরে সুমতি থাকত। সেই ঘরের দরজাও সকালে খোলা থাকে। জানলাও খোলা রাখতে হয়—ঘরে আলো বাতাস না ঢুকলে ঘরটা ভ্যাপসা গন্ধে ভরে যাবে। উৎপল একবার যদি ওঘরে যায়, সুমতির রেখে যাওয়া এক-আধটা শাড়ি জামা, একটা কিট্-ব্যাগ, মাথার চিরুনি, সেফটিপিন অনায়াসেই দেখতে পাবে। তা ছাড়া উৎপলের সঙ্গে লালাসাহেব ও ইন্দিরা মাসিমার আলাপ হবেই, আজ বা কাল। তখন? সুমতির সঙ্গে সে এসেছে—এর সাক্ষী তো অনেক।

মিথ্যে কথা বলবেই বা কেন কমলেশ! উৎপলকে সে চেনে, জানে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে কমলেশ ধীরে ধীরে পুরো ঘটনাই বলতে লাগল। তাদের বাড়ির কথা, তার অসুখ, হাসপাতাল, ডাক্তারদের পরামর্শ, সুমতির জেদাজেদি, এখানে নিয়ে আসা কিছুই বাকি রাখল না। এমনকী, সুমতিকে যে সে বিয়ে করেছে—তাও বলতে ইতস্তত করল না।

উৎপল মন দিয়ে শুনছিল সব। কদাচিৎ দু-একটা প্রশ্ন করেছে।

বেলা গড়িয়ে যাচ্ছিল। রোদ সরে যাচ্ছে পাশে। ভোমরাটা কখন উড়ে গিয়েছে।

একেবারে স্তব্ধ ভাব।

শেষে উৎপল নিশ্বাস ফেলে বলল, "তোমার জীবনে এত কাণ্ড ঘটে গেছে। আশ্চর্য! কিছুই জানি না। খবর রাখিনি।"

"তোর সঙ্গে তো দেখাও হয়নি।"

"তবু—!...তা বউদি আবার কবে আসবে?"

"দিন পনেরোর আগে নয়।"

"আমি তো অতদিন থাকব না। এনি ওয়ে, বউদি থাকে কোথায়? কোন অফিসে কাজ করে? ঠিকানা?"

কমলেশ বলল সব।

আউট হাউস আর ভেতর বাড়ির মধ্যে সরু একফালি ঢাকা পথ, প্যাসেজ। হাত পনেরো হবে লম্বায়। ভেতর বাড়ির পিছন দিকের দরজা খোলাই ছিল। তিন ধাপ সিঁড়ি নামলেই প্যাসেজ।

ইন্দিরাকে দেখা গেল। চোখে পড়েছিল কমলেশদের।

উনি কাছে আসার আগেই উৎপল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। কমলেশ এমনভাবে ক্যাম্বিসের চেয়ারে ডুবে বসেছিল যে তার সামান্য দেরি হল উঠতে।

ইন্দিরা দেখছিলেন উৎপলকে।

কমলেশ আলাপ করিয়ে দিল। "উৎপল। এর কথাই কাল বলছিলাম।"

"ও! তুমি...! বসো বসো।" ইন্দিরা বললেন ; হাসিমুখেই।

উৎপল বসল না। "আমরা পরশু এসেছি। কাল বেড়াতে বেরিয়ে হঠাৎ কমলেশদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।" বলতে বলতে তার চেয়ারটাই এগিয়ে দিল ইন্দিরার দিকে। আপনি বসুন না।"

"তুমিই বসো। অনেকক্ষণ এসেছ, না?"

"খানিকক্ষণ।"

"আমায় বলল সাথিয়া। কাজে ব্যস্ত ছিলাম খেয়াল করিনি।" বলে কমলেশের দিকে তাকালেন, "তুমি তো একবার খবর দেবে। তোমার বন্ধু।" এবার চোখ ফিরিয়ে নিলেন উৎপলের দিকে। "বসো তুমি। একটু চায়ের ব্যবস্থা করি।"

উৎপল হাসল, "আপনি ব্যস্ত হবেন না।"

"ব্যস্ত হব কেন! এসেছ বন্ধুর কাছে, একটু চা খাবে না?"

"খাব। নিশ্চয় খাব।"

"তবে বসো।...তুমি যে বাড়িতে এসেছ শুনলাম— সেটা এখান থেকে খানিকটা দূর। ও বাড়ির এক ভদ্রলোক একবার এ বাড়ি এসেছিলেন। অনেক দিনের কথা। তিনি আর আসতেন না। বাড়িটা খালিই পড়ে থাকত। তোমরা...!"

কথার মাঝখানে উৎপল বলল, "আমি বিশেষ কিছু জানি না। আমার এক মাসির সঙ্গে এসেছি। তবে উনি বাড়ির মালিকের একেবারে নিজের কেউ নন।"

"ও! বসো তোমরা।" ইন্দিরা হাত বাড়িয়ে উৎপলদের বসতে বলে চলে যাচ্ছিলেন।

কমলেশ বলল, "মাসিমা, উনি ফেরেননি এখনও।"

"অনেকক্ষণ।...চিঠি লিখছিলেন দেখেছি।"

"না, ভাবছিলাম—ফাঁকা থাকলে সাহেবের সঙ্গে উৎপলের আলাপ করিয়ে দিতাম।"

"পরে দিয়ো।"

ইন্দিরা চলে গেলেন। পায়ের ব্যথাটা বেড়েছে বোধহয়। খোঁড়াচ্ছেন একপাশে। শরীরে কেমন এক জড়োসড়ো ভাব। মাথার পাকা চুলগুলি উসকোখুসকো হয়ে কানে কপালে জড়িয়ে রয়েছে।

ইন্দিরা চলে গেলে উৎপলরা আবার বসল।

উৎপল বলল, "ভদ্রমহিলা বড় ভাল তো! এই বয়েসেও দেখতে বেশ লাগে। মুখে একটা বনেদি ঘরানার ছাপ। তুমি দেখছি, ভাগ্যবান। ভাল শেলটার পেয়েছ।"

কমলেশ মাথা হেলিয়ে বলল, তা পেয়েছি।"

উৎপল পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করল। কী ভেবে রেখে দিল আবার। তারপর বলল, "তোমার এই লালাসাহেবদের হিস্ট্রিটা কী? এখানে দুই বুড়োবুড়ি পড়ে আছেন? অন্য কোথাও সেটেল্ না করে এখানে—?"

কমলেশ যা জানে, শুনেছে লালাসাহেবদের সম্পর্কে বলল ছোট করে।

উৎপল আহত হল যেন। "দুটি ছেলেমেয়েই মারা গিয়েছে! স্যাড। মেয়েটি ক্যান্সারে চলে গেল। কোথায় হয়েছিল—?"

"জিজ্ঞেস করিনি।"

"ভালই করেছ! জেনে মন খারাপ। আমাদের এক বান্ধবী দু বছর লড়ল, বাড়ির অবস্থা ভাল, এখানে ওখানে নিয়ে গিয়েছিল ট্রিটমেন্টের জন্যে। আলটিমেটলি কিছুই হল না। সেই চলে গেল।"

কমলেশ অল্প সময় চুপ করে থাকল। শেষে বলল, "মেয়ের যাওয়ার তবু একটা কারণ আছে। ছেলেটার কথা ভাব। একেবারে ইয়াং। টেস্ট ফ্লাইটে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে মারা গেল। মানুষ সহ্য করতে পারে! একের পর এক...!"

উৎপল চাপা নিশ্বাস ফেলল। ফাঁকা চোখে তাকিয়ে থাকল মাঠের দিকে। মরা ঘাস, নয়নতারা গাছের একটা ঝোপ, কয়েকটা চড়ুই নেমে এসে মাঠে যেন ঘূর্ণি তুলল ছোট করে ; তারপর উড়ে গেল।

হঠাৎ কেমন মেজাজ পালটে উৎপল খানিকটা ঝোঁকের মাথায় বলল, "এইজন্যে আমি যো হোয়েগা সো হোনে দেয়ো করে দিন কাটাই।"

"মানে?"

"বেশি কিছু ভাবি না। সিরিয়াসলি নিতেও চাই না। কেন নেব!... আচ্ছা, তুমিই বলো, ম্যাথামেটিক্যাল ক্যালকুলেশান করে জীবনের রেজাল্ট পাওয়া যায়? যায় না। ক্যালকুলেটার ইজ গুড ফর অফিস, বাট ইউ ক্যান নট ইউজ ইট ইন ইয়োর লাইফ! আমি অন্তত দেখিনি। হ্যাঁ, কেউ কেউ সিঁড়ি ধরে এক ধরনের সাকসেস পেতে পারে। সাকসেস যদি রেজাল্ট হয় বলে মনে করো, ও.কে। আমি তা মানি না।...আমি বাবা হালকাভাবে থাকতে চাই।"

"যাবৎ জীবেত সুখম্ জীবেত— না কী বলে যেন—" কমলেশ ঠাট্টা করে হাসল।

"সুখটুখ বুঝি না। হাসিখুশি বুঝি। নিজের মতন করে আনন্দে থাকতে পারলেই হল।...আমার ফিলজফি একেবারে সিম্পল : ডোন্ট হার্ট এনিবডি, নেভার ডু হার্ম টু আদারস্, বি কাইন্ড অ্যান্ড লাভিং...।" বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে উৎপল নিজেই হেসে উঠল। এটা তার বরাবরের অভ্যেস।

কমলেশও হাসল।

চা এল ভেতর থেকে।

"নে, খা।"

"সত্যি ভীষণ চা তেষ্টা পাচ্ছিল। বেঁচে গেলাম।"

কমলেশও চা নিয়েছিল। বলল, "বিজয়া মাসিমার কথা বললি না?"

"মা! মাকে তুমি দমাতে পারবে না। বাবা মারা যাবার পর মাস ছয় খানিকটা গুমরে থাকত। কাঁদতে অবশ্য দেখিনি। কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে পারতাম, মা-বাবার মধ্যে একটা দারুণ ভালবাসা ছিল। অ্যাটাচমেন্ট। এমনিতে দেখেছি কর্তা যদি বলে দুধে জল আছে, গিন্নি বলবে, একফোঁটাও নয় ; বাবা যদি বলে, আজ ভীষণ গরম, মা বলবে—কই, কালকের চেয়ে কম। বাইরে দুজনে সেপারেট লাইন, ডবল লাইন রেলওয়ে ট্রাকের মতন, প্যারালাল ছুটছে। কিন্তু, ভেতরে দুজনের এগজিসটেন্স যেন এক। সত্যি কমলেশদা, আমার মা-বাবা বড় সুখী ছিল। তৃপ্ত।" একটু থামল কমলেশ, চা খেল দু চুমুক, "কাজেই বাবা মারা যাবার পর মা সামলে নিতে খানিকটা সময় নিল, উৎপল মাঠের দিকে তাকাল। চড়ুইগুলো উড়ে গিয়েছে। কাক ডাকছিল কোথাও। ইঁদারায় আবার জল তোলা শুরু হয়েছে। লাটা-খাম্বার ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ। "ব্যাপারটা কেমন জান কমলেশদা? যে কোনও বড় আঘাতই ওপরটা তোলপাড় করে দেয়। অস্থির। তারপর সেটা ধীরে ধীরে স্থির হয়ে আসে। মানে ওপরে ওপরে। ভেতরে সেটা তলিয়ে যাবে, কার কতটা তা বোঝা যায় না। মা বাইরে বাইরে সামলে নিল। বছর ঘোরার আগেই মায়ের আবার সেই খই ভাজার কাজ। খই ভাজা বলছি ঠাট্টা করে, নেই কাজ তো খই ভাজ। আসলে মা তো আগেই রিটায়ার করেছে স্কুল থেকে, তারপর বাবাও চলে গেল। মা আর কী করবে, কতকগুলো বাচ্চা ছেলেমেয়ে জুটিয়ে ছবি আঁকা, কাগজের কাটাকুটি, ফুল ফল, গান শেখানো নিয়ে মেতে গেল।"

"মাসিমা বরাবরই ওইরকম ছিল।"

"তখন মা পাড়ার বড় মেয়েদের টার্গেট করত। এখন বাচ্চাদের।"

কমলেশ হঠাৎ হেসে ফেলল।

"হাসছ?"

"তুই একটা বিয়ে করে ফেল। মাসিমার আরেকটা বাচ্চা বেড়ে যাবে।"

উৎপল হাসল। জোরেই। বলল, "করে ফেলব। কন্যাপক্ষ রাজি হলেই।"

চা খাওয়া শেষ।

বেলা বেড়ে গিয়েছে। রোদ গাঢ়। বারান্দা থেকে ঘরের দিকে সরে যাচ্ছে কয়েকটা প্রজাপতি। উড়তে উড়তে সুমতির দরজা পর্যন্ত গিয়ে আবার অন্য পাশে চলে গেল।

উৎপল উঠে পড়ার জন্যে চেয়ার সরিয়ে নিল। "এখন তা হলে চলি। আবার দেখা

হবে। আছি সাত-আট দিন।"

"বিকেলে বেরোস না?"

"কাল আর কোথায় বেরুলাম!...তুমি একদিন চলো ও বাড়িতে।"

"যাব।"

"ওঁকে বোলো আমি এখন চললাম। আবার একদিন এসে বাড়ির কর্তার সঙ্গে পরিচয় করব। লালাসাহেব!"

"চল, তোকে এগিয়ে দিই।" কমলেশও উঠে দাঁড়াল।

সাত

মধুসূদনবাবুর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ প্রায়ই ঘটে কমলেশের। সকালের দিকেই সাধারণত। দু-একদিন সন্ধের দিকে তিনি লালাসাহেবের কাছেও আসেন। কথাবার্তা গল্পগুজব হয়। মধুসূদন আর চুনিমহারাজের মধ্যে একটা চরিত্রগত পার্থক্য রয়েছে। মধুসূদন অনেকটাই মাটি-মুখো, মানে বাস্তববাদী। কমবেশি পেশাদার। শান্তি নিবাস-এর মতন একটা পান্থশালা বা আশ্রয়স্থান তাঁকে চালাতে হয়। দায়দায়িত্ব তাঁর ঘাড়ে। এখানে কতরকম লোক আসে, কেউ মাত্র কয়েকদিনের জন্যে, কেউ বা কিছু বেশিদিনের জন্যে। সব মানুষ সমান হয় না। ফলে কারও কারও অভিযোগ অনুযোগ ক্রোধ বিরক্তিও তাঁকে সামলাতে হয়। সহজে তিনি বিরক্ত অসন্তুষ্ট হন না। হলে নাকি দুর্মুখ হয়ে উঠতেও তাঁকে দেখা গিয়েছে। চুনিমহারাজ মানুষটিও ভাল। কিন্তু তাঁর বাস্তবজ্ঞান কম। সন্দেহ নেই মহারাজের আত্মমর্যাদা যথেষ্ট। তবু তিনি কখনও গ্লানি গায়ে মাখতে দ্বিধা করেন না। হয়তো তাঁর আবেগ যেমন বেশি সেইরকমই অভিমান কম। কমলেশ এঁদের দেখে, পছন্দও করে, চেষ্টা করে দুজনের মনটি অনুভব করার।

সেদিন কমলেশ সকালে মধুসূদনবাবুর কাছ থেকে ফিরছিল। সুমতির একটা চিঠি মধুসূদনবাবু তাঁকে দিয়েছেন। আসলে আগের দিন বিকেলে স্টেশন থেকে একটা ট্রেকার এসেছিল। ড্রাইভারের হাতে কয়েকটা চিঠি গুঁজে দিয়েছিল পোস্ট অফিসের বাবু। এমন হয় প্রায়ই। মধুসূদনবাবু আবার চিঠিগুলো পৌঁছে দেন যথাস্থানে।

কমলেশের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়ে চিঠিটা হাতে তুলে দিয়েছেন মধুসূদন।

চিঠি পড়া হয়নি। বাড়িতে এসে পড়বে কমলেশ। এই নিয়ে তিনটে চিঠি এল সুমতির।

ফিরে আসছিল কমলেশ। হঠাৎ এক ভদ্রলোকের মুখোমুখি।

"এই যে, নমস্কার।" ভদ্রলোক পথ আটকে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

কমলেশ তাকাল। নমস্কার জানাল। দেখল ভদ্রলোককে। স্থূলতা ছিল বোঝা যায়, এখন দেহ শুকনো, মুখের গলার চামড়া শিথিল, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, মাথার চুল পেকে এসেছে। মাঝমাথায় টাক।

"আমার নাম রাসবিহারী দাশ। রিটায়ার্ড গর্ভনমেন্ট সার্ভিস হোল্ডার। আপনার নাম?"

কমলেশ নাম বলল।
"'ল' ডিপার্টমেন্টে ছিলাম। সিনিয়ার...।"
"ও!"
"আনোয়ার শা রোডে আমার বাড়ি। আপনার? কী করেন—?"
কমলেশ ছোট করে জবাব দিল।
রাসবিহারী বললেন, "আপনাকে দেখেছি কাল। কোথায় থাকা হচ্ছে?"
কমলেশ একটা আন্দাজ দিল, দেখাল হাত দিয়ে লালাসাহেবের বাড়ির দিকটা।
"ভাল। আপনি এই বেটাদের ধর্মশালায় ওঠেননি, বেঁচে গিয়েছেন।" রাসবিহারী বিরক্ত, তিক্ত, ক্রুদ্ধ। "আমি কী ভুলই করেছি! ভাল করে খোঁজখবর না নিয়ে এসে পড়ে পস্তাতে হচ্ছে। বেটারা চোর। গলাকাটা। মশাই, আমাকে একটা বার্থ দিল, বলল—কেবিন সিঙ্গল সিটেড্। ঢুকে দেখি, হাত-পা নাড়াবার জায়গা নেই। লোহার খাট, শক্ত গদি, নো ভেন্টিলেশান। ডেলি পঁচিশ টাকা রেন্ট। খাবার জন্যে নেয় অ্যানাদার থারটি রুপিজ। কী খাওয়ায় জানেন, লালচে চালের দু মুঠো ভাত, জলের মতন ডাল, পচা আটার রুটি। সবজির মধ্যে পেঁপে, ভিন্ডি, করলা, কুমড়ো, ছোলাসেদ্ধ...। রাবিশ! নো মাছ, নো মাংস। কাল একটা ডিম দিয়েছিল।...ভাল কারবার ফেঁদেছে। আমাদের কলকাতায় হলে বেটাদের তুড়ুং ঠুকে দিতাম। চালাকি!"
কমলেশ অস্পষ্টভাবে কয়েকটা 'ও' 'তাই' 'অসুবিধে'—এইসব বলতে বলতে হাঁটতে শুরু করে দিল।
রাসবিহারী পাশে পাশে হাঁটতে লাগলেন। "কাল ওই ম্যানেজারের সঙ্গে ঝগড়াও হয়ে গেল।"
"ম্যানেজার! মধুবাবু—!"
"মধু না যদু আমার বয়ে গেছে। বললাম, মশাই থার্ড ক্লাস ধর্মশালার চেয়েও খারাপ এখানকার অবস্থা। আপনারা ভেবেছেন কী! লোকের টাকা এত শস্তা। অড়হরের ডাল আর জোয়ারের পোড়া রুটি খাইয়ে টাকা মারছেন! লোক ঠকানো চালাচ্ছেন বেশ।"
কমলেশ ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল একবার ; দেখল রাসবিহারীকে ; হাঁটতে লাগল।
রাসবিহারী নিজেই বললেন, "আমি কালই ফিরে যাচ্ছি। পরশু এসেছিলাম। সাধ মিটে গেছে।"
একটা কথা না বললেই নয় যেন, কমলেশ বলল, "বেড়াতে এসেছিলেন?"
"বেড়াতে! বেড়াবার আর জায়গা নেই! পুরিতে আমার ছোট ভাইয়ের হোটেল আছে। নিজের ভাই নয়, খুড়তুতো ভাই। সেখানে গেলে রাজার হালে থাকতে পারি..., আর সি বিচ্...।" বলে এক মুহূর্ত থেমে আবার বললেন, "বাড়ির স্ত্রীলোকের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল। আরে, আমার টাকা, আমার বাড়ি, আমি বাড়ির কর্তা ; আর ওঁর স্ত্রীলোকটির হাবভাব হল, তুমি চোরের মতন থাকো। তিনি খাবেনদাবেন, পা ছড়িয়ে বসে গন্ধ তেল মাখবেন মাথায়, মাথা ঠান্ডার তেল, প্রেশারের ওষুধ, অম্বলের ওষুধ, ঘুমের বড়ি—রোজই চলছে। আর আমার বেলায় ছড়ি হাতে মাস্টারনি

করবেন। কী, না, তোমার হাই ব্লাড সুগার, এটা চলবে না, ওটা চলবে না...সবই না। তার ওপর ছেলের বউকে নিয়ে রোজ ঝগড়া। বউমাও ত্যাড়া, ছেড়ে কথা বলে না। ছেলেটাও একটা পাঁঠা। মেরুদণ্ড নেই। বেটা সবসময় নুয়ে আছে।"
কমলেশ আন্দাজ করল ব্যাপারটা। ভদ্রলোক রাগারাগি করে চলে এসেছেন নিশ্চয়। হাসল না, বলল "মানে, আপনি রাগ করে—"
"রা-গ!" রাসবিহারী ঝাঁঝিয়ে উঠলেন।" আমি ফেড আপ হয়ে গিয়েছি। সংসার করেছেন! স্ত্রী কাকে বলে জানেন? আরে মশাই, পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের যুবতী স্ত্রী বুঝবেন না। পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছরের দাঁত-বাঁধানো সহধর্মিণী ভাবুন। তিনি ধর্ম বলতে স্বামীর ট্যাঁক বোঝেন। বেলগাছের কাঁটার চেয়েও ওই স্ত্রী ডেন্জারাস।"
কমলেশ হেসে ফেলল।
রাসবিহারী হাসলেন না। সঙ্গী পেয়ে যেন কথার তোড় এসেছে। বললেন, "টু টেল ইউ ফ্র্যাংকলি, একরোখা বলে আমার বরাবরই একটা বদনাম আছে। অফিসে যখন কাজ করেছি কোলিগরা বলত, তুমি বাঁশঝোপের বংশ হে, নুইতে শিখলে না। সত্যি, শিখিনি।...আর একটা দোষ কী জানেন, রাগটা আমাদের বংশগত ব্যাধি। দপ করে মাথায় রাগ চড়ে যায়। আবার ঠান্ডাও হয়ে যায় তাড়াতাড়ি। তা কী করা যাবে। যার যেমন নেচার।"
কমলেশের এখন আর রাসবিহারীকে খারাপ লাগছিল না। বরং কৌতুক বোধ করছিল। ইন্টারেস্টিং ভদ্রলোক।
"কালকেই আপনি ফিরে যাচ্ছেন তা হলে?" কমলেশ বলল।
"হ্যাঁ। এখানে ভাল লাগছে না।"
"কেন! জায়গাটা তো সুন্দর।"
"জায়গা সুন্দর হলে কী হবে, মন ভাল না লাগলে কিছুই ভাল লাগে না। বউমার শরীর ভাল নেই। এক্সপেক্টিং অ্যানাদার চাইল্ড। গিন্নি আমার গণেশের মা। কোনও সেন্স নেই। আর ছেলেটা স্কাউন্ড্রেল, বাঁদর। তার কোনও সেন্স অব রেসপন্সিবিলিটি গ্রো করল না। বেটা শুধু কায়দার প্যান্টজামা আর চুল আঁচড়াতে শিখল। বুঝবে ঠেলা। বাপ মরলেই চোখে সর্ষেফুল।"
কমলেশ আবার ভাল করে দেখল ভদ্রলোককে। ছেলের বউ সন্তান-সম্ভবা—তাই নিয়ে ওঁর উদ্‌বেগ।
অনেকটাই হেঁটে এসেছে ওরা। রোদের তাতে কপাল সামান্য সিক্ত। গাছের ছায়ায় দাঁড়াল দুজনে।
রাসবিহারী হঠাৎ বললেন, "আপনি ওই মেয়েটিকে দেখেছেন?"
"কাকে?"
"আমাদের সঙ্গে আছে। টল্ ফিগার, বসা গাল, কাঁধ পর্যন্ত চুল..."
"মনে করতে পারছি না। কেন?"
"মেয়েটি পাগল।"
"পাগল!"
"মাথার গোলমাল আছে। নরম্যাল নয়।"

"কেমন করে বুঝলেন।"

"বুঝলাম—!...কাল বিকেলের দিকে সামনেই ঘোরাফেরা করছি, হঠাৎ মেয়েটি এসে আমায় বলল, তার সুটকেশ থেকে টাকা চুরি হয়ে গিয়েছে। আমি তাকে পাঁচশো টাকা দিতে পারি কিনা?"

কমলেশ অবাক হয়ে তাকাল।

রাসবিহারী বললেন, "আমি বললাম, না। মানুষ চেনার চোখ আমার হয়েছে মশাই, এতটা বয়েস হল। ...তা মেয়েটি একেবারে রেগে আগুন। বলে কিনা, সে বড় ফ্যামিলির মেয়ে, কলকাতার নামকরা এক সার্জেনের বউ ছিল। এখন সে ডিভোর্সি। টাকা দিলে সেটা মার যাবে না। বাড়ি ফিরে গিয়ে আমায় টাকাটা ফেরত পাঠিয়ে দেবে।"

"আপনি—!"

"আমি বলে দিলাম, নিজেই আমি কাল ফিরে যাচ্ছি। টাকা ফেরত পাঠানোর প্রশ্নই ওঠে না।"

"মহিলার কোনও অসুবিধে হলে মধুবাবুর কাছে গিয়ে খোলাখুলি বললেই পারতেন।"

"সব বাজে কথা। পাগল! হ্যাজবেন্ড সার্জেনই হোন আর যাই হোক, যদি সত্যিই ওর হ্যাজবেন্ড থেকে থাকে, ওই খেপির সঙ্গে কেউ ঘর করতে পারে! ...যাকগে, বলে রাখলুম আপনাকে। এদিকে ঘোরাঘুরি করার সময় সাবধান।"

কমলেশ কোনও জবাব দিল না।

"আচ্ছা, চলি। আলাপ হয়ে গেল আপনার সঙ্গে। আবার কোনওদিন দেখা হয়ে যেতে পারে, বলা যায় না। নমস্কার।"

রাসবিহারী চলে গেলেন।

কমলেশ কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল।

লালাসাহেব বাগানে গোলাপ গাছের দেখাশোনা করছিলেন। গাছ বেশি নয়। কতকগুলো মাটিতে, কয়েকটা গোলমতন ফুলের টবে। শুকনো পাতা, বাড়তি ডাল কেটে একপাশে জমা করছেন। মাথায় একটা ফেল্ট হ্যাট।

দেখলেন কমলেশকে। "কত দূর...?"

"মধুবাবুদের দিকে—।"

"এবারে ভাল গোলাপ হল না," লালাসাহেব বললেন, "শীত ভালই পড়েছিল, তবু গোলাপের কোয়ালিটি হল না। লাস্ট ইয়ারেও এক একটা ফুল অ্যা-ও বড় হয়েছে। ফুল-ফল— যাই বলো, দুটো সিজিন পর পর ভাল হয় না বড় একটা। রেয়ার।"

কমলেশের চোখে— ফুল যা রয়েছে— যথেষ্ট ভাল মনে হচ্ছিল। গাঢ় লাল প্রায় কালচে রঙের গোলাপটা বেশ বড়। আশেপাশে ক'টা মৌমাছি উড়ছে। কাঠ কাটার একটা শব্দ ভেসে আসছিল দূর থেকে।

গাছের ছেঁটে-ফেলা ডাল, শুকনো পাতা একপাশে জড় করতে করতে লালা

বললেন, "তুমি ঘরে যাচ্ছ তো! পলুয়াকে পাঠিয়ে দিয়ো। এগুলো ফেলে দেবে।"

কমলেশ আর দাঁড়াল না। সুমতির চিঠিটা অনেকক্ষণ থেকে পকেটে রয়েছে। না-পড়া পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছে না।

নিজের ঘরে এসে বারান্দাতেই বসল কমলেশ। তার আগে পলুয়াকে ডেকে পাঠিয়ে দিল বাগানে।

সুমতি ছোট করে চিঠি লিখতে পারে না। পারে না, কারণ— তার উদ্‌বেগ আর উপদেশ দুটোই বেশি।

চিঠিটা পড়ল কমলেশ।

পড়ল, অপেক্ষা করল, আবার একবার চোখ বুলিয়ে নিল।

সুমতি সপ্তাহ খানেক পরেই আসছে আবার। একটা ছুটির সঙ্গে দুটো দিন বাড়তি করে নিয়েছে।

কমলেশ খুশি হল। কিন্তু তার মনে হল, সুমতি খরচাপাতি বেশি করে ফেলছে। সে আসা মানেই, ট্রেনভাড়ার সঙ্গে আরও উপসর্গ আছে। অপ্রয়োজনে দু-পাঁচটা বাড়তি জিনিস কিনে আনবে, খাওয়াদাওয়ার— মানে স্বাস্থ্য মজবুত করার ডায়েটারি সাপ্লিমেন্ট বা ওই জাতীয় কিছু। কোনও মানে হয় না। বাজারে যা চলে সেটাই যে সবসময় খুব প্রয়োজনীয় তা নয়। সুমতি এসব বোঝে না।

হঠাৎ কমলেশের মনে হল, সুমতি যদি সপ্তাহখানেক পরে আসে— তা হলে কি উৎপলের সঙ্গে দেখা হবে!

হিসেব মতন তা হবার কথা নয়। কেননা তার আগেই উৎপলরা ফিরে যাবে। যাবার কথা।

তবে উৎপলদের একটা ঝঞ্ঝাট হয়েছে। উৎপল যা বলছিল কাল, তাতে মনে হল, ওই 'রেণু কুটির' এবং তার লাগোয়া খানিকটা জমি— ওরা বেচে দিয়ে যেতে চায়। জমিটা কুটিরের মালিকেরই।

গতকাল উৎপলকে 'পাইন লজের' লাগোয়া হরিবাবুর দোকানের সামনে দেখতে পেয়ে গেল কমলেশ। উৎপলের সঙ্গে মেয়েদুটিও ছিল— লতা আর হৈমন্তী। উৎপলের মুখে সিগারেট, কাঁধে একটা কাপড়ের ব্যাগ ঝোলানো।

হরিবাবু বাঙালি নয়, বেহারি। তবে বাংলা বলতে অসুবিধে হয় না। তাঁর দোকান ছোট। সেখানে মোটামুটি প্রয়োজনীয় সবই পাওয়া যায় : চায়ের প্যাকেট, মিল্ক পাউডার, গায়ে মাখা আর কাপড় কাচা দু-রকম সাবানই, ব্লেড, নারকেল তেলের শিশি, জোয়ানের আরক, অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট থেকে খাম পোস্টকার্ড পর্যন্ত। খাম পোস্টকার্ড তিনি স্টেশনের সামনে ডাকঘর থেকে কিনে এনে রেখে দেন। এখানে হঠাৎ কিছু দরকার হলে হরিবাবুর দোকানই একমাত্র ভরসা।

উৎপল বলল, "এই তো পেয়ে গিয়েছি। চলো—!"

"তোরা এখানে?"

"শপিং। আমাদের চায়ের প্যাকেটে নেংটি ইঁদুর ঢুকে বসে আছে, গায়েমাখা সাবান ছুঁচোর পেটে। বলো না, অবস্থা কাহিল। আরও দু-একটা টুকিটাকি দরকার ছিল। চলে এলাম এখানে। লোকে বলল, হরিস্টোর্স অগতির গতি।"

"কেনাকাটা হয়ে গেছে!"

"ওরা কিনছে। ...চলো, তোমায় ওবাড়ি নিয়ে যাই।"

"এখন? বিকেল ফুরিয়ে আসছে—।"

"ধ্যুত, তোমার যত খুঁতখুঁতুনি। চলো, আমি আছি। ঘাবড়াবার কোনও কারণ নেই, তোমায় পৌঁছে দেব। এই হিমু, ক্যাচ কর কমলেশদাকে।"

বাধ্য হয়েই কমলেশকে যেতে হল 'রেণু কুটির'।

সত্যি, বাড়িটা একেবারে ধসে পড়ার মতন। থাকার ব্যবস্থাও ভাল নয়। কয়েকটা বেঢপ তক্তপোশ, একজোড়া কাঠের ছোট বেঞ্চি, একটা টুল— এইমাত্র আসবাব। রান্নাঘর আর মুরগি ঘরে কোনও তফাত নেই। জানলা নড়বড়ে, দরজায় উই ধরে গিয়েছিল। কুয়োটা বাইরে। কাজের লোক অন্য কুয়ো থেকে খাবার জল, রান্নার জল এনে দেয়।

ঘরের মধ্যে সুটকেস, ব্যাগ, ক্যানভাসের একটা বস্তা, দেওয়ালের এ-প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত নাইলনের দড়ি, নিশ্চয় সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল উৎপলরা, টাঙানো। তাতেই আলনার কাজ চলছে।

কমলেশ ভাবতেই পারেনি বাড়িটার এই অবস্থা দেখবে।

উৎপলের মাসিমা— যদিও নিজের নয়, প্রৌঢ়া। বিধবা। নাম অনুপমা।

কথায় কথায় জানা গেল, মহিলাই এখন বাড়ির মালিকানা ভোগ করছেন। মানে, জামশেদপুরের গোস্বামীবাবু বাড়ির মালিক ছিলেন আগে, তিনিই তৈরি করেছিলেন বাড়িটা, কিন্তু ভদ্রলোক এবং তাঁর স্ত্রী মারা যাবার পর অনুপমাই এর ভোগদখল পেয়ে গিয়েছেন। গোস্বামীবাবু নিঃসন্তান ছিলেন। অনুপমাই তাঁর একমাত্র বোন। তাঁর ভাইটাই ছিল না।

অনুপমা এখানে এসেছেন, বাড়ি এবং লাগোয়া অল্প জমি— যার মালিকানা আপাতত তাঁর, সেসব বিক্রি করতে।

"কে কিনবে?"

"রামগড়ের মঙ্গীলালবাবুর ফ্লাওয়ার কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট স্টাফ। এখানে কোম্পানির একটা হলিডে হোম হবে। কথা সেইরকম।"

কমলেশ বলল, "তা ভাল। বাড়ির যা অবস্থা।"

উৎপল বলল, "ওদের লোক এখনও আসেনি। আসার কথা। এমনিতে চিঠিচাপাটিতে ব্যাপারটা সেটেলড্ হয়ে আছে। তবে ওদের লোক একবার আসবে। না আসা পর্যন্ত অনুমাসি ফিরে যেতে পারছে না।"

"তার মানে তুইও—!"

"দু-চার দিন দেরি হয়ে যেতে পারে। প্যাঁচে পড়ে গিয়েছি কমলেশদা। আমার অফিসে কাজ পড়ে আছে। আটকে পড়লে ক্ষতি হবে।"

রাত হয়নি। তবু উৎপল তাকে প্রায় বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল।

কমলেশ হাতের চিঠিটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিল। সুমতিকে এই চিঠির জবাব দেওয়ার পর পরই হয়তো দেখা যাবে সে চলে এসেছে।

বাবাকেও চিঠি লেখার দরকার। আগেও একটা দিয়েছে, জবাব আসেনি।

আট

শীত মরার সময় এখন নয়। মাঘের শেষেও এখানে শীত যাবার কোনও লক্ষণ থাকে না। আর এই মাঝামাঝিতে কেমন করে যায়। তবু ঠান্ডার ভাবটা হঠাৎ কমে গেল। যেন দিবানিশি উত্তরের হাওয়া যেভাবে ছুটে যাচ্ছিল, যেতে যেতে নিজের ক্লান্তি কাটাতে তার গতি হ্রাস করল। অত জোরে আর হাওয়া আসে না, কনকনে ভাবটাও ঈষৎ কমে গিয়েছে। আকাশের চেহারায় সামান্য বাদলা ভাব। মেঘ আসে, সরে যায়; আবার আসে। দু ফোঁটা বৃষ্টিও হল একদিন। তবে বোঝা গেল, আবার হচ্ছে। মাঘের শেষে দু-একদিন বৃষ্টি হয় অবশ্য। এখানে বৃষ্টি হলেও জল শুকিয়ে যায় দেখতে দেখতে, দাঁড়ায় না, ঢালু পথে গড়াতে গড়াতে বনগুলির দিকে চলে যায়।

বৃষ্টি নেই। রোদ খানিকটা ঘোলাটে। হাওয়াই নেই কনকনে।

লালাসাহেব বারান্দায় বসে একটা ডায়েরি বইয়ের পাতায় কিছু লিখছিলেন। তাঁর চেয়ারের পাশে ছোট গোল হালকা টেবিল। চশমার খাপ, একটা কাচের গ্লাস পড়ে আছে।

ফটক খোলার শব্দে সামনে তাকালেন।

উৎপল আর চুনিমহারাজ। দুজনকে একসঙ্গে দেখা যাবে লালাসাহেব ভাবেননি। ডায়েরিটা বন্ধ করে পাশের টেবিলে রাখলেন। চশমাও খুলে ফেলছিলেন, পড়ালেখার সময় ছাড়া তাঁর চশমার দরকার হয় না।

উৎপলরা বারান্দায় উঠে এল।

"কী খবর! দুজনে একসঙ্গে? লালা বললেন, হালকাভাবেই।

উৎপল বলল, "আমি আসছিলাম; গেটের সামনে ওঁর সঙ্গে দেখা।"

চুনিমহারাজ বললেন, "আমি আপনাদের খবর নিতে আসছিলাম। ভাবলাম, বিকেলে যদি বৃষ্টি নামে আসা হবে না হয়তো। দিদি কেমন আছেন?"

লালা বুঝতে পারলেন। আলগাভাবে হাসলেন, "আপনার কানে খবর পৌঁছে গিয়েছে। কে খবর দিল।"

চুনিমহারাজ যা বললেন, বোঝা গেল, এ বাড়ির জল তোলার ভজুলাল— ভজুয়ার কাছে খবর পেয়েছেন তিনি। ভজু এদিককার দু-তিন বাড়ি জল তুলে দেয় ইঁদারা থেকে। তাতেই তার যা রোজগার। বাড়িতে পলুয়া থাকলেও ভজুকে বারণ করা যায় না। সে শুনবে নাকি! ভজুয়া অবশ্য থাকে পাইন লজে চুনিমহারাজের কাছেই।

লালা বললেন, "চিন্তার কিছু নেই। টেম্পারেচার উঠেছিল একশো এক মতন; গায়ে হাতে ব্যথা ছিল। বাতের রোগী। ব্যথা নিত্যসঙ্গী। আজ সকালে জ্বর কমে গিয়েছে।"

উৎপল জানত না। এইমাত্র শুনল। চুনিমহারাজ তাকে কিছু বলেননি। "মাসিমার শরীর খারাপ?"

"শরীর থাকলে মাঝে মাঝে খারাপ হয়," লালা হেসে বললেন, "ভাবনার কিছু নেই। বসো।"

বারান্দায় বেতের হালকা চেয়ার ছিল, এলোমেলোভাবে ছড়ানো। চেয়ার টেনে নিয়ে বসল দুজনে।

লালা উৎপলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কমলেশ বোধহয় মধুসূদনবাবুদের দিকে গিয়েছে। ফিরবে এখনই। বসো তুমি।"

উৎপলের সঙ্গে লালাসাহেবের পরিচয় আগেই হয়েছে। একদিন লতা আর হৈমন্তীকে নিয়েও এসেছিল। লালা-দম্পতি খুশি হয়েছিলেন। লতা একটা গানও শুনিয়ে ছিল— 'দাও হে হৃদয় ভরে দাও...।' মাসিমা লতার মাথায় হাত রেখে আদর করে বললেন, "বারে মেয়ে, কী সুন্দর গান, তোমার গলাটিও চমৎকার।"

উৎপল বলল, "আমরা কাল ফিরে যাচ্ছি।"

"ফিরে যাচ্ছ? তোমাদের কাজ হয়েছে, এগিয়েছে কথাবার্তা!"

"না। ওদের একজন কাল এসেছিল। পছন্দ হয়নি। কালই ফিরে গিয়েছে।"

"ও! অকারণেই তোমাদের আসা হল!"

"অকারণ কেন! একটা নতুন জায়গায় বেড়ানো হল। কমলেশদাকে পেলাম। আপনাদের দেখলাম।"

লালা একটু হাসলেন, "আমাদের আর কী দেখবে! বুড়োবুড়ি পড়ে আছি। কী বলুন চুনিমহারাজ! আপনি তবু আশায় আশায় আছেন—।"

চুনিমহারাজ উৎপলকে বললেন, "শোনো, একটা কথা তোমার আত্মীয়াকে বলে রেখো। উড়ো কথায় কান দিয়ে ছুটোছুটি করতে হবে না তাঁকে। আমি তো তোমাদের ব্যাপারটা জানলাম। যদি তেমন কাউকে দেখি, ইন্টারেস্টেড, আমি তোমাদের জানাব। অ্যাড্রেসটা রেখে যেয়ো।"

উৎপল মাথা হেলাল। তারপর বলল, "আমার নিজের কিছু না জানেন তো! অনুমাসিকে বলব। ঠিকানা দিয়ে যাচ্ছি। ...আচ্ছা, আপনি এখানে বরাবর থাকবেন? মানে কথাটা এমনি জিগ্যেস করছি।"

চুনিমহারাজ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, "থাকব। ওই যে লালাসাহেব বললেন, আশায় আশায় আছি আমি। তাই থাকব।"

লালা যেন সামান্য সংকোচ অনুভব করলেন, চুনিমহারাজকে বললেন, "আরে এমনি বললাম। ঠাট্টা করে। কিছু মনে করলেন নাকি?"

"না। আমি মনে করিনি। ...তা ছাড়া আপনি তো জানেন, আমি কেয়ারটেকার। পাইন তাড়িয়ে না দেওয়া পর্যন্ত ওখানে। তারপর আপনার এখানে ডেরা বাঁধব।" বলে হেসে ফেললেন।

লালা উৎপলকে বললেন, "ওয়েল মাই বয়। তুমি বা তোমরা যদি পরে কখনও এখানে আস, আমাদের এখানে বেড়াতে এসো। তোমাদের জন্যে হাত বাড়ানো থাকল। নিশ্চিন্তে চলে আসতে পার। ...ওই যে, তোমার বন্ধু এসে পড়েছে...।"

কমলেশ ফটক খুলে এগিয়ে আসছিল।

বাগান দিয়ে সোজা এসে কমলেশ বারান্দায় উঠল।

লালা ঠাট্টা করে বললেন, "মধুবাবুর কানে খবরটা দিয়ে এলে বুঝি? উনি নিশ্চয় দু-চারটে হোমো-পুরিয়া না হয় গুলি গুঁজে দিয়েছেন? কী, রাইট?"

কমলেশ অপ্রস্তুত। বলল, "নিজেই দিলেন..., আমি...!"

"ঠিক আছে। তোমাদের মাসিমাও গুলিভক্ত। ওঁকে দিয়ে দিয়ো। ...এদিকে তোমার বন্ধুটি উৎপল তো কাল চলে যাচ্ছে।"

কমলেশ উৎপলের দিকে তাকাল। "কালকেই যাচ্ছিস?"

"হ্যাঁ।"

"আমি ভেবেছিলাম—।"

"কালই যাচ্ছি। এখানে অনর্থক কতগুলো দিন বেশি আটকে থাকলাম। চলো তোমার সঙ্গে ক'টা জরুরি কথা আছে, বলে নিই। বিকেলে আজ আর আসা হবে না।"

কমলেশরা চলে গেলে অল্প সময় লালাসাহেব কোনও কথা বললেন না। চুনিমহারাজও চুপচাপ।

বাদলার রং ফিকে হল। চাপা রোদ। বাগানে কাক, চড়ুই বসছে, ডাকাডাকি করছে, আবার উড়ে যাচ্ছে। মরশুমি ফুলগুলো বাতাসে দুলছিল। এখানকারই মাটির পিটুনিয়া ভাল হয়। বারান্দা-লাগোয়া পেয়ারাগাছের ডালে কাঠবেড়ালি উঠে গেল তর তর করে।

লালা বললেন, "বসুন, একটু চা খান। বলে আসি।"

চুনিমহারাজ মাথা নাড়লেন। "থাক না, আবার এখন—!"

"বসুন, ওরা তো রয়েছে।" ওরা মানে বাড়ির কাজের লোক।

"আপনি খাবেন?"

লালা চোখের ইশারায় পাশের গোল টেবিলে রাখা ফাঁকা কাচের গ্লাসটা দেখালেন। মজার মুখ করে বললেন, "একটু আগে কোকো খেয়েছি। মাঝে মাঝে আমার মাথায় ছেলেমানুষি চেগে ওঠে। হঠাৎ মনে হল, টিনটা পড়ে রয়েছে, খাই। মাস তিনেক আগে কিনে এনেছিলাম স্টেশনের জেনারেল স্টোর্স থেকে। এমনি। টিনের মধ্যে জমে যাচ্ছে। খাওয়া হয় না বড় একটা। বসুন।" লালা উঠে দাঁড়ালেন।

লালাসাহেবের পোশাকআশাকে কখনওই আলগা ভাব থাকে না। যা যা পরলে মানানসই হয়, পরে নেন। আপাতত তাঁর পরনে পাজামা আর গায়ে গরম ড্রেসিং গাউন। তিনি উঠে ভেতরে চলে গেলেন।

চুনিমহারাজ বসে থাকলেন। টেবিলের ওপরেই নজর। লালার চশমার খাপ, চশমা, ডায়েরি খাতা, কলম পড়ে আছে। ফাঁকা কাচের গ্লাসও।

হাওয়া এল হঠাৎ। বাগানের দিকে তাকালেন চুনিমহারাজ। রোদ আরও চাপা দেখাল। আকাশে মেঘ ভাসছে। বৃষ্টি হবেই। বিকেলে, সন্ধেবেলায়, রাতে— ঠিক কখন হবে বোঝা যাচ্ছে না।

লালা ফিরে এলেন।

"আপনি বোধহয় কাজ করছিলেন—" চুনিমহারাজ বললেন, চোখের ইশারায় ডায়েরি বই, কলম, চশমা দেখালেন।

লালা বললেন, "না, কাজ নয়। কতকগুলো হিসেব মেলাচ্ছিলাম। লাস্ট মাস্থে ফকির মিস্ত্রি দুটো লোক এনে বাড়ির কটা খুচরো কাজ করেছিল। টাকা পয়সা পুরো নিয়ে যায়নি। দেখাও পাচ্ছি না। দেখছিলাম কত পায়—! লোকটাকে দেখতে পান? আপনার ওখানেই তো ওদের আড্ডা।"

"ফকির দেশে গিয়েছে। ওর বাবার অসুখ।"

"ফিরবে কবে?"

"ফিরবে। ওরা দেশে গেলে চট করে ফেরে না।"

লালা অন্যমনস্কভাবে টেবিল থেকে চশমাটা তুলে খাপের মধ্যে পুরে রাখলেন। হঠাৎ বললেন, "মহারাজ, আপনি ওই মেয়েটিকে দেখেছেন না, উৎপলের সঙ্গে যে দুটি..."

"কোন মেয়েটি?"

"ফরসা, রোগা, চোখদুটি বড় বড়। কী নাম! হৈমন্তী...!"

"দেখেছি। ওটি তো উৎপলের মাসতুতো বোন।"

লালা বারান্দার সিঁড়ির দিকে তাকালেন। চুপ করে থাকলেন। কী যেন বলতে চান, ইতস্তত করলেন। শেষে বললেন, "ওই মেয়েটি আপনার দিদিকে মেন্টালি ডিস্টার্বড করে গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে।"

চুনিমহারাজ অবাক হয়ে বললেন, "কেন?"

গলার কাছে হাত বোলাতে বোলাতে লালা বললেন, "কেমন একটা মিল আছে। আমাদের মিলির সঙ্গে। বয়সটাও প্রায় এক। আপনি তো মিলিকে দেখেননি।"

চুনিমহারাজ এবার ধরতে পারলেন। মিলি— মানে মল্লিকা, লালাসাহেবদের মেয়ে। তিনি তাকে দেখেননি। তবে তার কথা শুনেছেন। লালাসাহেব বা দিদি— প্রায়ই যে নিজেদের মেয়ের কথা বলেছেন, হা-হুতাশ করেছেন— তা নয়। তবে দু-একবার কথায় কথায় বলে ফেলেছেন— মেয়ের কথা, ছেলের কথা। কোন মানুষ না বলে! লালাসাহেব অত্যন্ত সংযত, নিরাবেগ চরিত্রের মানুষ। তবু মানুষ তো! মধুসূদনবাবু এখানকার অনেক পুরনো লোক। তিনি মিলিকে দেখেছেন। মধুবাবুর মুখেও চুনিমহারাজ লালাদম্পতির ছেলেমেয়ের কথা শুনেছেন। মিলি এই বাড়িতে, এখানেই মারা গিয়েছিল। ক্যান্সার। ব্লাড ক্যান্সার। মারাত্মক ব্যাধি। লালাসাহেব বড় হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন। আর্মি হসপিটালে। কোনও লাভ হয়নি। ফেরত নিয়ে চলে এসেছিলেন বাড়িতে, এখানে। মাত্র মাস কয়েক তারপরও বেঁচে থাকা, ম্লান মৃদু প্রায় নিভে-আসা প্রদীপ শিখার মতন।

বুকের মধ্যে অদ্ভুত এক ভার অনুভব করলেন চুনিমহারাজ। বললেন, "এত বড় জগতে একজনের সঙ্গে আর একজনের চেহারার কিছু মিল থাকতেই পারে। মোটেই অসম্ভব নয়। আমাদেরও চোখে পড়ে। চট করে চিনতে ভুল হয়ে যায়। কিন্তু লোকদুটো তো এক নয়। আপনি দিদিকে বোঝাতে পারলেন না?"

"বোঝাব? আমায় তো স্পষ্ট করে কিছু বলেনি। আমি আভাসে বুঝেছি!" বলে হাতদুটো মাথার ওপর তুলে ছাদ দেখলেন কয়েক মুহূর্ত; হাত নামালেন। "আমরা এমনিতে সাবধানী। যা হয়ে গিয়েছে— তা নিয়ে কথাবার্তা বলি না। বলি না কারণ

ভেতরে নাড়া খেলে কত কী উঠে আসবে। তবে কখনও কখনও ভেতরটা দুলে ওঠে বই কি। আমি আজ ক'দিন ধরেই বুঝতে পারছি, ইন্দিরা পুরনো বাক্স হাতড়ানোর মতন তার অতীত হাতড়াচ্ছে।"

"অতীত তো আপনারও।"

"হ্যাঁ, আমারও। আমি সামলে আছি।"

"দিদিও সামলে নেবেন। এতকাল সামলেছেন—!"

"না চুনিমহারাজ, ওপর ওপর সামলালেও এখন আমাদের অনেক বয়স হয়ে গিয়েছে। শরীর যেমন বয়সে তার ভাঙন তাড়াতাড়ি শোধরাতে পারে, মানুষের মনও পারে। বেশি বয়সে আর তেমনটা হয় না। যে কোনও কষ্ট দুঃখই— তখন দিন মাস পার করেও মুছতে চায় না। এই বয়সে, সাফারিং অ্যান্ড সরো বিকামস্ এ লং সিজন্।"

চা এসেছিল।

চা রেখে চলে গেল পলুয়া।

"নিন, খান।"

"দিদির জ্বরজ্বালার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই নিশ্চয়।"

"হয়তো নয়। আবার একটু আধটু থাকতেই পারে।"

"আমার মনে হয় ঠান্ডা, হঠাৎ মেঘলা, আবহাওয়ার জন্যেই—।"

"তাই হবে। এই জ্বরও চলে যাবে দু-চার দিনের মধ্যে। আশা করছি সেরকম। কিন্তু—"

"কীসের কিন্তু?" চুনিমহারাজ চায়ের কাপ তুলে নিলেন টেবিল থেকে।

লালা টেনে টেনে নিচু গলায় বললেন, "ধোঁয়া যে সহজে মিলিয়ে যাবে না।... কী বলছি বুঝতে পারছেন? ধরুন ঘরের মধ্যে আপনি একটা আলো জ্বালালেন। কাজ ফুরোলে আলোটা নিয়ে কোথাও চলে গেলেন, কিংবা নিভিয়ে দিলেন। ঘর আবার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার হয়ে গেল। কিন্তু, ঘরে একটা কিছুতে আগুন লেগে পুড়তে শুরু করেছিল— আপনি সেটা সরিয়ে নিলেন চোখে পড়ামাত্র। দেখবেন পোড়ার গন্ধ আর ধোঁয়াটা চট করে ঘর থেকে যায় না।"

চুনিমহারাজ কথার জবাব দিলেন না। যুক্তিটা অস্বীকার করা মুশকিল।

লালা বললেন, "মনের একটা স্বভাব আছে। সে দুঃখ আঘাত সহ্য করে নেয়, সময় লাগে, তা বলে মুছে ফেলতে পারে না। ছোটখাটো দুঃখ-বেদনা তো নয় মহারাজ, আমরা যে বড় বেশি ঘা খেয়েছি। ...মিলি চলে যাবার পর ওকে দাঁড় করিয়ে রাখতে আমায় কম চেষ্টা করতে হয়নি। তখন তবু ছেলেটা ছিল...বড় সান্ত্বনা—।"

চুনিমহারাজ লালাসাহেবকে অনেকদিন দেখছেন। ঘনিষ্ঠতাও কম নয়। আজকের মতন এতটা মনমরা হতে আগে তেমন একটা দেখেননি। তাঁর নিজেরও কষ্ট হচ্ছিল। যে মানুষটিকে, এমনকী 'দিদি'-কেও তিনি সংযত, শান্ত, স্বাভাবিক থাকতেই দেখেছেন বেশির ভাগ সময়, আজ অন্যরকম দেখতে তাঁর অস্বস্তি হচ্ছিল। কথা ঘোরাবার জন্যে উনি বললেন, "আপনি ভাবছেন কেন! দিদি ঠিক হয়ে যাবেন।"

"দেখি।"

"লালাবাবু, আমি ভাগ্য মানি। ভাগ্য মানে ঠিকুজি কোষ্ঠীর ভাগ্য নয়, না-জানা একটা রহস্য, জীবনের।"

"মাঝে মাঝে মানতে হয় বোধহয়।"

"আমাকে একজন বলেছিলেন, আমরা যেন একটা নৌকোয় বসে আছি, যে-মাঝি হাল ধরে আছে দাঁড় বাইছে— তার ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। সে যদি পার করতে গিয়ে মাঝনদীতে নৌকো ডোবায় আমাদের কী করার আছে! জগতে কত ঘটনা নিত্য ঘটে যায় যার ওপর মানুষের হাত নেই।"

লালাসাহেব নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করছিলেন। তাঁর নিজেরই যেন সংকোচ হচ্ছিল। মুখের ম্লান ভাব, অথবা দুশ্চিন্তার ছায়াটা কাটিয়ে উঠলেন অনেকটাই। বললেন, "আপনার কথা মেনে নেওয়া গেল আপাতত," বলে হাসলেন, "কিন্তু তর্কটা থেকে গেল।" বলে নিজের কপালে আঙুল ঠেকালেন, "ইনি আছেন," তারপর ছাদের দিকে আঙুল তুললেন, "উনিও দিব্যি আছেন।"

"আপনি ঠাট্টা করছেন?"

"ঠাট্টা নয়। মাঝে মাঝে আমি ভাবি, বিশ্বাস ভাল, কিন্তু বিশ্বাস থাকলে অবিশ্বাসও থাকবে। তাই নয় কি?"

"আছে বলেই তো তফাতটা থেকে যায়। তর্কের খাতিরে একটা কথা এখানেও বলতে হয় লালাবাবু। সেই যে কথায় বলে সর্প ভ্রমে রজ্জু, মানে আলো-অন্ধকারে, ঝাপসায় অনেক সময় পায়ের সামনে দড়ি পড়ে থাকলে চমকে উঠে থমকে যাই, ভাবি সাপ। কিন্তু আসলে তা সাপ নয়, নেহাতই দড়ি। এটা আমাদের ভ্রম। তবে কথা হচ্ছে, ভ্রম অযথাই হয় না। দড়ি? একটা চেহারা আছে, না থাকলে সাপ বলে ভুল করব কেন? গোলমালটা এখানেই। যার অস্তিত্ব থাকে না তার অস্তিত্বহীনতাও নেই।"

লালা এবার হাসলেন। "আপনি মশাই ধর্মের বইটই খুব পড়েন বুঝি?"

"একটু-আধটু।"

"তা শুনুন, একটা কথা আপনাকে বলে রাখি। কিছু মনে করবেন না। ...আমি আর আপনার দিদি আপনাদের ভগবানের ইচ্ছেয় একসঙ্গে যাব বলে মনে হয় না। আগে পরে যেতে হবে। তা সে যাই হোক, আমরা চলে যাবার পর— এই ঘরবাড়ি আপনাকেই দিয়ে যাচ্ছি। এর মধ্যে আপনি কী করতে পারবেন আমি জানি না। আমাদের অবর্তমানে এখানে আপনি 'অরফেনেজ'টা গড়ে তুলতে পারেন। ঘাবড়াবেন না, আমাদের সাতকুলে কেউ নেই। দাবিদাওয়া করতে আসবে না কেউ।"

চুনিমহারাজ ভীষণ অপ্রতিভ। কথা বলতে পারছিলেন না। শেষে কোনও রকমে বললেন, "আরে রাম, এ আপনি কী বলছেন! আপনারা এমন কথা বলবেন না। আমি প্রায় ভিখিরি, কিন্তু শকুন নই।"

লালা ডান হাতটা বাড়িয়ে চুনিমহারাজের কাঁধের কাছটায় হাত রাখলেন। "আমি জানি।"

নয়

সুমতি ভাবতেই পারেনি কমলেশ স্টেশনে এসে হাজির হবে।

"এ কী, তুমি?"

কমলেশ হাসল। "তোমায় চমকে দেব বলে।"

"হুঁ! তা দিয়েছ! এলে কেমন করে? ট্রেকারে?"

"সাইকেলে!"

"সা-ই-কেলে?" সুমতির বিশ্বাস হল না। সন্দেহের চোখে কমলেশকে দেখতে দেখতে বলল, "সাইকেল তুমি পেলে কোথায়"

"লালাসাহেবের।"

"কী বলছ! মেসোমশাই এখনও সাইকেল চাপেন?"

"আগে চাপতেন, এখন আর চাপেন না। ওটা পড়ে থাকত। পলুয়া মাঝে মাঝে চেপে স্টেশনে আসত দরকারি কেনাকাটা করতে। কেন তুমি দেখনি?"

দেখেছে সুমতি। দু-একবার। অত খেয়াল ছিল না। লাল মোরাম পেটানো প্লাটফর্ম দিয়ে হাঁটতে শুরু করল সুমতি। হাতে একটা ভারী কিট্‌ব্যাগ; কাঁধে অফিসব্যাগ। "তুমি পলুয়ার পেছনে চেপে এসেছ?"

ছোট স্টেশন, অল্প যাত্রী, তার মধ্যেই চা-অলা হাঁকছে, একজন পানবিড়ি নিয়ে জানলায় জানলায় দৌড়োচ্ছে। বাসি কাগজের তাল। এঁটো শালপাতা উড়ে গেল। স্টেশনের করবীগাছটার পাতা দুলছে হাওয়ায়। একটা কুকুর খোঁড়াতে খোঁড়াতে রেলগাড়ির দরজার কাছে এসে মুখ তুলে তাকিয়ে আছে।

"পলুয়ার সাইকেলের পেছনে চেপে এতটা রাস্তা..." সুমতি বলছিল, কমলেশ কথা শেষ করতে দিল না।

"পেছনে চেপে নয়! আমি নিজেই এসেছি।"

সুমতি দাঁড়িয়ে পড়ল। তার চোখের মণি স্থির। ভুরু কুঁচকে গিয়েছে। ঠোঁট ফাঁক হয়ে সামনের দাঁত দেখা যাচ্ছিল।

"কী বলছ তুমি! এতটা রাস্তা সাইকেল চালিয়ে এসেছ? পাগল!"

কমলেশ হাত বাড়িয়ে সুমতির কাছ থেকে কিটব্যাগটা নিতে গেল, দিল না সুমতি। অসন্তুষ্ট। রাগ করেই বলল, "এই বাহাদুরির কী দরকার ছিল। তুমি কি ছেলেমানুষ! এতটা রাস্তা সাইকেল চালালে তোমার পেটে টান ধরবে না?" অত বড় অপারেশন।"

কমলেশ সুমতির হাতের ব্যাগটা ছাড়বে না। টানাটানি করছে। বলল, "রাস্তা বেশি নয়। পাহাড়তলি আর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে শর্টকাট পথ আছে। পায়ে চলা। মাইল দেড়েক মাত্র। ফার্স্ট ক্লাস রাস্তা। আর কত গাছ, সেগুন শিমুল নিম অর্জুন— বাকির নাম জানি না। বুনো গাছ, লতাপাতা, ফুল... বিউটিফুল!" মজার গলায় বলছিল কমলেশ।

"বিউটিফুল—!" সুমতি বিরক্ত।

"কেন আমাকে কি সিক্‌ দেখাচ্ছে! এক মাসেই কেমন রিকভার করে নিয়েছি

চেহারা দেখে বুঝছ না?"

জবাব দিল না সুমতি।

এখানে ওভারব্রিজ নেই। প্লাটফর্ম শেষ হয়ে গেলে, পুব দিকে ঢালু রাস্তা। রাস্তার ডান হাতি রেল লাইনের ওপর দিয়ে হাঁটা পথ। তারপরই লোহার দুটো খুটি, আর একটা লোহার লাইন দিয়ে আগলে রাখা বা 'ব্লক' করা। ওপারে স্টেশনের বাজার, দোকান, ট্রেকার স্ট্যান্ড, ছোট এক মুসাফিরখানা।

বাইরে আসতেই পলুয়াকে দেখতে পেল সুমতি। সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার কেরিয়ারের ওপর একটা পুঁটলি।

পলুয়া হাসল।

সুমতিও হাসিমুখে বলল, ভাল আছ?

পলুয়া হাত দিয়ে ট্রেকার দেখাল। সুমতিদের যাবার ব্যবস্থা করে রেখেছে।

কমলেশ বুঝতে পারল, তার তামাশা ধরা পড়ে গিয়েছে। হেসে সুমতিকে বলল, "আরে তুমি সত্যিই বিশ্বাস করলে আমি পাহাড়ি চড়াই-উতরাই ভেঙে দেড় মাইল সাইকেল চালিয়ে এসেছি! প্লেইন জায়গায় মাঝে মাঝে চড়েছি, উতরাইয়ে নেমে গিয়েছি হড়হড় করে, বাকি রাস্তা পলুয়ার সঙ্গে হেঁটেছি। গল্প করতে করতে। তোমার এই ট্রেন আজ অনেক লেট করল। নয়তো স্টেশনে পৌঁছে ভোঁভা দেখতাম।"

সুমতি স্বস্তি পেল। "মিথ্যে কথা ভালই বলতে শিখেছ!"

হেসে উঠল কমলেশ।

ট্রেকারে আজ লোক কম। পিছনে জনা চারেক। এক ভদ্রলোক, তাঁর স্ত্রী, দুটি ছেলে। অবাঙালি। মালপত্রও কম নয়।

সামনের সিটেই কমলেশদের বসার ব্যবস্থা করে রেখেছিল পলুয়া। ট্রেকারঅলারা তার চেনা। প্রায়ই দেখতে দেখতে ইয়ার-দোস্ত গোছের হয়ে গিয়েছে। কমলেশেরও মুখ চেনা হয়ে গিয়েছে ট্রেকারের ড্রাইভার। শান্তি নিবাসের কাছে মাঝে মাঝে এদের দেখে কমলেশ।

সামনেই বসল কমলেশরা।

ট্রেকার চলতে শুরু করলে সুমতি বলল, "তুমি তা হলে ভাল আছ?"

"দেখে বুঝতে পারছ না।"

"আর কী খবর এখানকার?"

"খবর অনেক। বাড়ি গিয়ে বলব।... একটা খবর, ইন্দিরা মাসিমার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না।"

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সুমতি। "কী হয়েছে?"

"বড় কিছু নয়। ক'দিন আগে জ্বর হয়েছিল। তিন-চার দিন ভুগলেন। তারপর থেকে কেমন দুর্বল লাগছে বলছিলেন। এক-আধ দিন ব্যথাও হয়েছে বুকে।"

"মেসোমশাই কী বলছেন?"

"মাঝে দিন দুই বৃষ্টি হল। সে আর থামে না। আবার শীত পড়ল। এবার কমে আসছে। লালাসাহেব বলছেন, সিজন চেঞ্জের সময় একটা ঠান্ডা লেগেছিল।"

"এখন ভাল তো?"

"জ্বর নেই।"

ট্রেকার বাঁক নিল। দূরে শালবন। তার পেছনে পাহাড়ি ঢল। আকাশ যেন রোদের বিরাট এক শামিয়ানা টাঙিয়ে রেখেছে। হাওয়া আসছিল। একঝাঁক বক উড়ে যাচ্ছে। উঁচুনিচু প্রান্তরের কোথাও কোথাও খেতির কাজ চলছে। দেহাতের মাটির বাড়ি। খাপরার চাল। শীত কিন্তু প্রখর নয়। বাতাসও আগের মতন কনকনে নয়। কুয়াশা কখন পরিষ্কার হয়ে এসেছে।

কমলেশ হঠাৎ বলল, "তোমার অফিসে উৎপল গিয়েছিল?"

সুমতি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। "উৎপল?"

"যায়নি তা হলে! যাবে। তোমার অফিসের, বাড়ির ঠিকানা নিয়ে গেছে।"

"আগে শুনি উৎপলটা কে?"

"আমার বন্ধু—; না, ঠিক বন্ধু নয়, ছোট ভাইয়ের মতন। আগে আমাদের পাড়ায় থাকত। এখন লেক গার্ডেন্সে। হঠাৎ এখানে দেখা। তার এক মাসি, মাসতুতো বোন আর বোনের বন্ধুকে নিয়ে এসেছিল। মাসির সঙ্গেই এসেছিল।" বলে কমলেশ উৎপলের সঙ্গে আচমকা দেখা হওয়া, আর তারপর দেখাসাক্ষাতের বৃত্তান্ত দিল।

সুমতি মন দিয়ে শুনল।

একটা কালভার্ট। ছোট। তলা দিয়ে একরত্তি নালা। একরাশ ছোটবড় কালো পাথর। বিশাল এক অশ্বত্থগাছ। পাতা ঝরছে।

হঠাৎ সুমতি বলল, "আমার কথা তবে শুনেছে!"

"বা! শুনবে না।"

অল্প চুপচাপ থেকে সুমতি বলল, অফিসে যায়নি। বাড়িতেও নয়। যদি অফিসে ফোন করে থাকে পায়নি। অফিসে ফোনে পাওয়া মুশকিল। আমাদের অফিসে ফোন পাওয়া ভাগ্য!"

"বাবা—" কমলেশ বলল কী ভেবে, "তুমি বাবার খোঁজ নিয়েছিলে?"

"একদিন গিয়েছিলাম। বাড়িতে ছিলেন না। তালতলায় কোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন।"

পেছনের সিটে কর্তা-গিন্নি কী নিয়ে বচসা জুড়ে দিয়েছেন। ছেলেদুটো হল্লা করছে।

ট্রেকার উঁচু-নিচু গর্তে পড়ে বার কয়েক লাফাল।

দুপুর, বিকেল। বেলা কাটছিল, চোখ দিয়ে ধরা যায় না যেন, আড়ালে আড়ালে সরে যায়। সুমতি আসার পর বাড়িতে একটা সাড়া উঠেছিল। ইন্দিরা হাসিখুশি মুখ করে সুমতির হাত টেনে মাথাটা নিজের কাঁধের কাছে টেনে নিলেন। "এমন শুকিয়ে গিয়েছ কেন! রাত জেগে এসেছ বুঝি!"... "আপনি তো আরও শুকিয়ে গিয়েছেন! নিজেরটা চোখে পড়ে না? অসুখ করেছিল শুনলাম। কেমন আছেন মাসিমা?' আরও দু-দশটা কথা। সুমতি কলকাতা থেকে ইন্দিরার জন্যে কাচের বাসন এনেছে ক'টা, যত্ন করে, আধ ডজন চায়ের কাপ প্লেট, দেখতে সুন্দর, একটা ছোট রুটি-রাখা গোল কৌটো। গরম থাকবে রুটি। ইন্দিরা লজ্জায় পড়লেন। "এসব কেন আবার!" ..."বা,

আমার ভাল লাগল আনতে। দেখবেন না, কাজে দেবে।" ...লালাসাহেবের জন্যে এক শিশি আফটার শেভ্‌ লোশান। লালাসাহেব হেসে মরেন, "আমার গোঁফদাড়ি পেকে সাদা হয়ে গিয়েছে লেডি, এখন আর গালে গন্ধ মেখে কী হবে!" ...খানিকটা হাসাহাসি হল।

বিকেলে বোঝা গেল, শীত কমের দিকে। রোদ আর আলো মরতে দেরি হল সামান্য। সন্ধেবেলা বসার ঘরে বসে গল্পগুজব চলল খানিকক্ষণ। লালা বললেন কথায় কথায়, মার্চ মাসের গোড়া পর্যন্ত শীতের রেশ থাকবে, তারপর উধাও। বসন্তকালটা থাকলে এখানে পলাশের বাহার দেখতে। শিমুলও কম যায় না। তা তোমরা তো আগেই চলে যাবে।

কমলেশ নিচু গলায় বলল, "আর কত দিন। অফিস এরপর মায়াদয়া করবে না।" বলে হাসল।

সন্ধের খানিকটা পরেই কমলেশরা উঠে নিজেদের ঘরে চলে এসেছিল।

কমলেশের ঘরে বসেই কথা হচ্ছিল। সুমতি কমলেশের বিছানায় বসে, হাত দুই-তিন তফাতে কমলেশ। চেয়ারে বসে।

অফিসের কথা শেষ করে কমলেশ বলল, "উৎপল একটা কথা বলছিল।"

"কী।"

"বলছিল, ও ওদের দিকে— মানে লেক গার্ডেনসের দিকে একটা দু ঘরের ফ্ল্যাট জোগাড় করতে পারে।"

সুমতি মুখের সামনে হাত তুলে কাশল বার দুই। কথার জবাব দিল না।

অপেক্ষা করে কমলেশ বলল, "তুমি কী বল?"

"আমি কী বলব!"

"এভাবে থাকার আর কোনও মানে হয় না।"

"আমার—" সুমতি কপালের চুল সরিয়ে দিল, "আমার আপত্তি কোথায়, এরকম দোটানা আমারও ভাল লাগে না।...অশান্তি হয়—!"

"আমায় নিয়ে তোমার—"

"তোমার কথা বলছি না। কাঁকুলিয়ার বাড়িতে আমি যেন চোর সেজে থাকি। বন্ধুর মাসি, থাকতে জায়গা দিয়েছে, বছর দেড়েক হয়ে গেল আছি; কিন্তু এখন আর ভাল লাগে না। মহিলার সব ব্যাপারে কৌতূহল, যখন তখন উঁকি মারা, দশ রকম প্রশ্ন। উনি এখন আমাকে ঘাড় থেকে নামাতে পারলে বাঁচেন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেনও তাই। আমার যে কী অশান্তি!"

"তা হলে উৎপলকে বলি?"

"বলো।"

"না, মানে এখান থেকেই একটা চিঠি লিখে দিই এখনই। ঠিকানা রেখে গিয়েছে। তা ছাড়া, ও তোমার সঙ্গে দেখা করবে ঠিকই। করত এত দিনে। হয়তো কোনও কাজে আটকে গিয়েছে। তোমার সঙ্গে দেখা হলে তুমিও বলো।

"সে পরের কথা। আমার তরফ থেকে কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু তুমি তোমার

বাবাকে—।"

"বাবা তো জানে আমাদের কথা...।"

"হ্যাঁ, জানেন। জানেন আমরা রেজিস্ট্রি করেছি। কিন্তু এখন যে একসঙ্গে ঘরসংসার পাতব ঠিক করেছি জানেন না। তুমি তো তোমার বাবাকে ফেলে রেখে চলে যেতে পারবে না।"

"না! সেটা কি সম্ভব!"

"তোমার বাবা যদি তাঁর পুরনো পৈতৃক ভিটে ছেড়ে যেতে না চান। তুমি আমার চেয়ে বেশি জান, তাঁর একটা রোখ আছে। অধিকারের। বাড়ির নিজের অধিকার তিনি যদি ছাড়তে না চান!"

কমলেশ সামান্য বিরক্ত হল। "ধ্যুত কীসের অধিকার! একটা ভাঙা ধসে পড়া বাড়ির একটা ঘর আর বারান্দার অধিকার। বারোয়ারি জল কলঘর, পঁচিশটা লোকের চিৎকার, চেঁচামেচি, খেয়োখেয়ি, নোংরামি— তার আবার অধিকার। বাজে, বোগাস! বাবার সেনসিবল হওয়া দরকার।"

বিছানায় পা তুলে নিল সুমতি। ঘরের বাতিটা টিমটিমে কেরোসিন তেলের ল্যাম্প। ছায়া বেশি, আলো অনেক কম। বলল, "বাবাকে বোঝাও।"

"ওটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।...তুমি বরং তোমার মাকে—।"

"মা আমার বড় সমস্যা নয়। শুধু কৃতজ্ঞতার জন্যে আর তার পাগলামির জন্যে বলতে পারিনি। বলে নেব। আমাকেও বাঁচতে হবে। পরের মুখ চেয়ে থাকলে চলে না।"

কমলেশ চুপ করে থাকল। সুমতির সমস্যাটা বাস্তবিকই বড় কিছু নয়। ও ইচ্ছে করলে যে কোনওদিনই সোজা ওর মাকে গিয়ে বলে আসতে পারে, সে বিবাহিত, মানে নিজেই বিয়ে করে নিয়েছে।

বিছানায় হাত ভর দিয়ে হেলে বসল সুমতি। গলার কাছে ভাঁজ পড়েছে। গালের একটা পাশে ছায়া পড়ল। "তোমার নিজের কী মনে হচ্ছে?"

"কীসের?"

"শরীর?"

"ভাল। আমি চমৎকার আছি। নো ট্রাবল। আমার মনে হয়, আরও একটা মাস এখানে পড়ে থাকার মানে হয় না। কলকাতায় ফিরে গিয়ে আমি অফিসে জয়েন করতে পারি।"

"তোমার ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি পর্যন্ত ছুটি। আর তো হপ্তা তিনেক। থেকেই যাও। ক্ষতি তো হচ্ছে না।"

"তোমার ওপর বড় চাপ পড়ছে। এই খরচ, টাকাপয়সা..."

"ও নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না। তোমার বন্ধুরা অফিসের কো-অপারেটিভ থেকে সেদিনও কিছু টাকা তুলে আমার হাতে দিয়ে গেছে।"

কমলেশ উঠে দাঁড়াল। ঘরের মধ্যে দু পা হাঁটল। "ওরা নিজেরাই কেউ ধারধোর করেছে। আমার ধারের পুঁজি ফুরিয়ে গেছে, ক্রেডিট সোসাইটি দেবে না।" বলতে বলতে খাটের পাশে এসে কমলেশ আচমকা বলল, "তুমি আমায় বাঁচিয়ে তুললে, পরে যদি কখনও আপশোস করতে হয়— তখন..."

সুমতি বিছানা থেকে নেমে পড়তে পড়তে বলল, "তখন দেখব।"

দশ

খাওয়াদাওয়া শেষ হতে এখানে বেশি রাত হয় না। লালাসাহেবদের দিনগুলো মোটামুটি সময় মেনে চলে। বরাবরের অভ্যেস। রাত সাড়ে ন'টার আগেই রাত্রের খাওয়া শেষ।

ঘরে ফিরে এসে কমলেশ বলল, "এখন কটা?"

সুমতির হাতে ঘড়ি নেই। নিজের ঘরে রেখে এসেছে। অনুমানে বলল, "সাড়ে নয়-পৌনে দশ হবে।"

"কলকাতায় আমাদের কাছে দশটা রাতই নয়।"

"এটা কলকাতা নয়," সুমতি হালকা গলায় বলল, "আর রাত দশটা কমই বা কী!"

"না, তা নয়; এত ফাঁকায় নির্জনে গাছপালার জঙ্গলে রাতটা অনেক তাড়াতাড়ি হাজির হয়ে যায়। তাই না?"

"তোমার তো অভ্যেস হয়ে গিয়েছে।"

"বসবে না?"

"না। তুমি শুয়ে পড়ো। আমি আমার ঘরে যাই। ঘুম পাচ্ছে আমারও। সারা রাত ট্রেনে, দুপুরেও শুইনি। ক্লান্তি লাগছে।"

কমলেশ হাসল। "এটা মন্দ নয়। আমরা এখন পর্যন্ত দুজনে দুটো আলাদা ঘর বিছানা নিয়ে থাকি।"

সুমতি যেন সামান্য ইতস্তত করল। পরে মজার গলায় বলল, "ভালই তো।...ওই যে কী একটা গান আছে— কাছে থেকে দূর, তবু সে মধুর ওইরকম! আর মনে পড়ছে না। যাকগে, কথাটা তুললে বলে বলি—" সুমতির গলার স্বর আর হালকা থাকল না। বলল, "দু-মাস চার মাস নানা অসুবিধের জন্যে আমি দূরে থাকলাম— তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি পারছি। কিন্তু একবার যখন ঘর বাঁধব, আমি কোনও অশান্তি, উদ্বেগ সহ্য করতে পারব না। তোমার জীবনটাই আজ যেমন আমার কাছে বড়, তখন শুধু তোমার জীবন নয়, শান্তি তৃপ্তিও আমার কাছে সমান বড় হয়ে থাকবে। তাই বলছিলুম, তোমার বন্ধু উৎপলের কথা মতন ঘর নিয়ে সংসার পাতার আগে সবরকম ভেবে নেবে। তোমার বাবার কথাও।"

কমলেশ খুশি হল না। বলল, "বাবাকে নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না।"

"আমিও তাই বলছি।" সুমতি হাই তুলল। সত্যিই তার ঘুম পাচ্ছিল। "তুমি শুয়ে পড়ো। আমি যাই।" নিজের ঘরে চলে গেল সুমতি।

কমলেশ দরজার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল অল্পক্ষণ।

শীত বাড়ছে। মাঝরাতে এখনও কম্বলের তলায় শীতের কনকনে ভাবটা ছড়িয়ে যায়, ভোরের আগে আরও কষ্টকর হয়ে ওঠে। কমলেশ বরাবরই দুটো কম্বল নেয়। প্রথম প্রথম দুটোই চাপিয়ে নিত। এখন, একটা গলা পর্যন্ত তুলে নিয়ে শুয়ে পড়ে,

অন্যটা থাকে পেটের মাঝামাঝি জায়গায়, মাঝরাতে ঘুমের মধ্যে সেটাও টেনে নেয় গলা পর্যন্ত।

ঘুমের বড়ি কমলেশ এখন আর খায় না। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পরও তাকে নিয়মিত খেতে হয়েছে। পরে ধীরে ধীরে কমিয়েছে, শেষে ছেড়ে দিয়েছে। আজকাল কদাচিৎ হয়তো খায়, শরীর খারাপ বুঝলে।

রাত যে অনেকটাই হয়ে এসেছে অনুমানে বুঝতে পারছিল কমলেশ। ঘুমিয়ে পড়েছিল। যেমন পড়ে রোজই প্রায়, অথচ আজ ঘুম গাঢ় হয়নি। ছেঁড়াছেঁড়া ঘুমের মধ্যে বাবাকে স্বপ্ন দেখল। তাতেও পুরোপুরি জেগে যায়নি। শেষে, ঠিক কী হল কমলেশ বুঝল না, বাবার ভাঙা চোয়ালওঠা মুখ, অপরিষ্কার করে কামানো গাল, মাথার এলোমেলো পাকা চুল আর রুক্ষ জেদি চোখ দেখে তার ঘুম কেটে আসছিল।

বাবার গায়ে মামুলি ফতুয়া। বোতাম খোলা। কণ্ঠা দেখা যাচ্ছে।

"কেন? আমি কেন ছেড়ে দেব? এটা আমার পৈতৃক ভিটে।...ওরা কে ছেড়েছে? বড়, ছোট— কেউ ছাড়েনি। তুমি কতটুকু জান? দে হ্যাভ ডিপ্রাইব মি। আইন আদালত করে টাকা খাইয়ে লোক এনে যখন পার্টিশান করল— তখন আমাকে বোকা বানিয়ে চোদ্দোআনা মেরে দিল। চোর, বজ্জাত, বেইমান..."

"বাবা!"

"বাবা নয়, তুমি আমাদের ফ্যামিলির কতটুকু জান? আমি হাবাগোবা বোকা ছিলাম, মুখবুজে থাকতাম বলে, ওরা আমাকে একটা হোসিয়ারির দোকান ধরিয়ে দিল। দাদা নিজে তখন ধর্মতলা স্ট্রিটে মদের দোকান চালায়, আলমারির র‍্যাকে ঠাসাঠাসি বোতল। বিলেতি, দেশি। নাম জেনারেল স্টোর্স, মদ আর বর্মি চুরুট। বাবুর হাতে তিনটে আংটি, হিরে চুনি...। হাতে ছড়ি। ধুতি পাঞ্জাবির বহর দেখলে মনে হবে কোথাকার কাপ্তেন। তখন বাবা নেই; মা অথর্ব, বড় বউ শাশুড়ির হাতে-গায়ে হাত বুলিয়ে সোনাদানা সরাচ্ছে।

"বাবা, আমি জানি, শুনেছি, পুরনো কথা ছেড়ে দিন...!"

"তুমি কিছুই জান না, শোনা কথা কানে গেছে। গল্প শুনেছ। শুকিয়ে যাওয়া ঘায়ের দাগ দেখে ক্ষতর যন্ত্রণাটা বোঝা যায় না।"

"এতকাল পরে সেই পুরনো কথা তুলে—"

"তুলব বই কি! আমি হাঁদা, মোটা বুদ্ধি, পড়াশোনায় রদ্দি। বেশ তো, আমি রদ্দি। আমার বেলা হোসিয়ারি। আর তোমার কাকা, সে কী? চোর চোট্টামি করে স্কুলের চৌকাঠ পেরোল। কলেজের খাতায় নাম লিখিয়ে সে উড়ে বেড়ায়। ধামাপুকুরের এক বড় বাড়ির মেয়ে...। লেনদেন হল ভালই, দাদা ঝোপ দেখে কোপ মারতে জানত ভালই। তোমার কাকা হয়ে গেল পালদের লোহালক্কড়ের ব্যবসার গদিবাবু— মানে ম্যানেজার। ভাল কামাই।"

"থাক, আমি আর শুনতে চাই না।"

"শুনবে কেন! তুমি তোমার বাবা-মায়ের মুখ বুজে মার খাওয়ার কথা শুনতে লজ্জা পাও। আমরা যে লাথিঝাঁটা খেয়েছি—।"

"বাবা! চুপ করুন। দয়া করে চুপ করুন...।"

বাবার মুখ অন্ধকারে আড়াল হয়ে গেল যেন।

ততক্ষণে কমলেশের ঘুম ভেঙে গিয়েছে।

চোখের পাতা পুরোপুরি খোলার আগে আচ্ছন্ন অবস্থায় থাকল কয়েক মুহূর্ত, পরে তার ঘোর কেটে গেল। তাকাল। বাবা নেই। ঘর অন্ধকার। এত ঘন অন্ধকার যে কিছুই আন্দাজ করা যায় না, দেওয়াল, জানলা, দরজা— কোনওটাই নয়। অনুমান করে নিতে সময় লাগে।

শীত করছিল কমলেশের। বাড়তি কম্বলটা পেটের কাছ থেকে টেনে বুক গলা পর্যন্ত ঢেকে নিল। বাবার মুখ তাকে অদ্ভুতভাবে পেছনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

কলকাতায় তাদের পৈতৃক বাড়িটার আদি চেহারা এখন অতটা স্পষ্ট করে মনে পড়ে না। বিবর্ণ ছবির মতন আবছা হয়ে গিয়েছে। গলির মধ্যে আড়াইতলা বাড়ি। ছাদে চিলেকোঠা। শ্যাওলা ধরা আলসে। ঘরগুলো গায়ে গায়ে, কোনওটাই বড় নয়, হয় মাঝারি, না হয় ছোট ; জানলায় লোহার শিক, খড়খড়ির জানলা, ঘর-লাগোয়া টানা সরু বারান্দা, ডানহাতি একটা বাঁক, পাশাপাশি দুটো ঘর, একটা কলঘর। নীচে খোলা উঠোন। একপাশে রান্না ভাঁড়ার। মাঝখানে খাবার ঘর, বাইরের দিকে বৈঠকখানা, উলটোদিকে বাচ্চাকাচ্চাদের পড়ার ব্যবস্থা।

জেঠামশাইকে মনে পড়ে। ঠাকুমাকে ভুলে গিয়েছে।

কমলেশের বেশ মনে পড়ে—তার বয়স যখন নয়-দশ, তখন পর্যন্ত জেঠামশাই বাড়ির কর্তা। একান্নবর্তী পরিবার। একই হাঁড়িতে রান্না। সাদামাটা রান্নাবান্না হলেও পাত পড়ত একই জায়গায়। শুধু জেঠামশাইয়ের খাবার যেত ওপরে। ভাত, ডাল, চচ্চড়ি, একটুকরো মাছ, প্যানপেনে ঝোল বা আধখানা ডিম—বনমালী ঠাকুর ঢেলে দিত পাতে। এই দুবেলা ডালভাতের জন্যে অন্য ভাইদের টাকাপয়সা দিতে হয় না সংসারে। জেঠামশাইয়ের দায় ছিল ওটা। বারোয়ারি সংসার খরচ থেকে চলত।

পরে জেঠাইমা, মা, কাকিমা—সবাই আলাদা আলাদা ব্যবস্থা করে নিল। এক রান্নাঘরে তিনটে উনুন, তিন জায়ের তিন ঝি, হাটবাজার যার যার মতন। বউদের নিজেদের ঘরে স্টোভ বা হিটার। যে যার কর্তা ছেলেমেয়ের জন্যে আলাদা করে চা টিফিন করে নিচ্ছে। দেখতে দেখতে ঘরের বাইরে বারান্দাও এক একজন দখল করল নিজেদের কাজে।

বাড়ির পার্টিশান তখনই সারা হল। জেঠামশাই বেঁচে থাকতে।

সংসার তখনই বেড়ে গিয়েছে, এর ছেলে ওর মেয়ে, কারও দুই, কারও তিন। তবু খুড়তুতো জেঠতুতো সম্পর্কটা ছিল আলগাভাবে। তবে সে আর কতদিন। বড় তো সবাই হয়, ছেলের বিয়ে হয়, মেয়ের জামাই আসে। স্থানাভাব, মনকষাকষি, ঝগড়া, কথাবার্তায় ঝাঁঝ। ইতর ভাষায় কেউ কম যেত না।

ছেলেদের কেউ কেউ বউ নিয়ে চলে গেল অন্যত্র। মেয়েদের মধ্যে একজন হল বিধবা, একজন চলে গেল কানপুর, আরেকজন নিজের মর্জিতে বিয়ে করে চা-বাগানে।

এই বিচ্ছিন্নতা স্বাভাবিক। সংসার কবে আর একইভাবে বাঁধা থাকে! ছিঁড়ে

যাবেই। কে যেন বলত, মাটির হাঁড়ি হাত থেকে না পড়লেও একদিন নিজের থেকে ফেটে খান খান হয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

কমলেশের ঠিক এইজন্যে কোনও আপশোস নেই। কিন্তু তার একটা জায়গায় যথেষ্ট লাগে। যাদের সঙ্গে সে বড় হয়েছিল, গায়ে গায়ে ছিল—তারা বড় হয়ে তফাতে সরে গেলেও তবু তো নিজের আত্মীয়। আশ্চর্য এই যে, কমলেশ যখন হাসপাতালে—মরবে কি বাঁচবে ঠিক নেই তখন তার খুড়তুতো জেঠতুতো ভাইবোনেরা কেউ একবার খোঁজ নিতে যায়নি, দেখতেও নয়। শুধু একজন বাদে। কাকার ছোট মেয়ে বেলা। বেলু। বেলা সিঁথিতে থাকে। তার স্বামী কারখানায় চাকরি করে, বেলু প্রাইমারি স্কুলে পড়ায়। সন্তানাদি এ-যাবৎ হয়নি।

বেলু বরাবরই সেজদা বা কমলেশকে ভালবাসত। বড় হবার পরও তার টান কমেনি। বেলুর ধারণা ছিল সেজদা চেষ্টা করলে বেশ ভাল ছেলে হতে পারে, ভাল কাজকর্মও পেয়ে যাবে।

কমলেশ সেভাবে ভাল ছেলে কখনওই ছিল না। মোটামুটি বা মাঝারি। পালের হাওয়ায় ভেসে যাবার মতন সে খানিকটা মা-বাবা মাস্টারমশাই বন্ধুদের তাড়নায় বিদ্যের নদীতে ভেসে গিয়েছিল। আঁকড়ে ধরার ক্ষমতা তার ছিল না। আর জ্বলজ্বল করে জ্বলে ওঠার মতন প্রতিভা।

এরই মধ্যে সে, কলেজে পড়ার সময়, সাধারণত যা হয়, হুজুকে মেতে কিছুদিন রাজনীতিও করতে গিয়েছিল। দু ধাপ টপকে যখন চেনা চেনা হয়ে যাচ্ছে, বাজে হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়ল। থানা পুলিশ তাকে দমিয়ে দিল খানিকটা, বাকিটা ধসিয়ে দিল এক বন্ধু রঞ্জন। তার মুখে চুনকালি মাখিয়ে দিয়ে রঞ্জন পালিয়ে গেল।

মা ততদিনে মারা গিয়েছে।

মায়ের শরীরস্বাস্থ্য মজবুত ছিল না। হাঁপানি আর রক্তস্বল্পতায় ভুগত। বাবার হোসিয়ারি দোকান টিকে আছে এইমাত্র। অর্থাভাব যথেষ্ট। কমলেশ নিজের খরচা চালাত টিউশানি করে।

একদিন অঝোর ধারায় বৃষ্টি হচ্ছে মাঝরাত থেকে। কলকাতা ডুবে রয়েছে জলে। মা ওই প্রবল বৃষ্টির মধ্যে শ্বাস টানতে টানতে চলে গেল।

সেদিন আর শ্মশানে যাওয়ারও উপায় ছিল না। পরের দিন সকালে একজনমাত্র জেঠতুতো দাদা, পাড়ার বন্ধু, উৎপলও ছিল সঙ্গে, মায়ের দাহকর্ম সেরে এল কমলেশ।

কাকা বেঁচে। তবু ঘর থেকে বেরোল না। তার নাকি ডেঙ্গু হয়েছে। অন্যরা মুখ বাড়াল একবার। মামুলি সান্ত্বনা ছাড়া বাড়ির কেউ পা বাড়াতে এল না। বেলুই শুধু কাছে কাছে ছিল।

বাবা এমনভাবে তাকিয়ে থাকল, যেন তাঁর বোধবুদ্ধি লোপ পেয়েছে। ফাঁকা চোখ, অসহায় মুখ, ভাঙা গলা, এলোমেলো দু-চারটে কথা।

কমলেশ জানে, তার বাবার না ছিল ব্যক্তিত্ব, না সরাসরি রুখে ওঠার ক্ষমতা। একটা মানুষ যদি বরাবর মাথা নিচু করে, কোমর নুইয়ে থাকে —তার ভেতর যতই ক্ষোভ থাক ওপরে সে মুখ বুজেই অশান্তি এড়িয়ে যায়।

মা মারা যাবার আগে থেকেই কমলেশ বাবার দীনতা অনুভব করতে পারত। মা মারা যাবার পর বাবা আরও দীন, নিস্পৃহ হয়ে উঠতে লাগল। কোনও গ্লানি যেন বাবাকে পীড়িত করত। তার অবশ্য কারণও ছিল।

বাবার হোসিয়ারি দোকান একদিন উঠে গেল। বাবাই উঠিয়ে দিল। একেবারেই চলছিল না। কর্মচারী রাখালদাকে বিদায় দিল। দোকান বিক্রি বাবদ বাবার হাতে নগদ টাকা এসেছিল হাজার বিশ-পঁচিশ। সেই টাকার খানিকটা গচ্ছিত রেখে বাকি টাকা নিয়ে বাবা মাস দেড়েক হরিদ্বার, মথুরা, বৃন্দাবন, পুরি ঘুরে বেড়িয়ে আবার ফিরে এল বাড়িতে।

কমলেশ সেইসময় বরাতজোরে একটা চাকরি পেয়ে গিয়েছিল। নয়তো দিন চলা মুশকিল ছিল।

বছরখানেক এইভাবে কাটল।

কমলেশ এক গাছের ডাল থেকে অন্য ডালে লাফ মারার মতন আগের চাকরি ছেড়ে অন্য চাকরি ধরল। বাড়িতে সে আর বাবা। একটা ঠিকে লোক রান্নাবান্না করে দিয়ে যায়। আর-একজন এসে ঘরদোর ঝাটপাট দিয়ে বাসন মেজে চলে যায়। বাবা হয় নিজের ঘরে, না হয় পার্কে, অথবা পুরনো এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে বসে থাকে।

একঘেয়ে, ক্লান্তিকর, পাংশু দিনগুলো কেটে যায়—অনেকেরই যেমন কাটে হয়তো—কমলেশ আবার একটা নতুন চাকরি পেয়ে গেল। আসলে দিলীপ বলে এক বন্ধু তাকে রাস্তা থেকে ধরে এনে ওদের অফিসে ঢুকিয়ে দিল। এখানে মাইনেটা আগের তুলনায় ভাল, ডেজিগনেশানটাও মন্দ নয়।

এইসময় একদিন সুমতির সঙ্গে আলাপ। আচমকা।

সুমতি কোনও দরকারে কমলেশদের অফিসে এসেছিল। সেখান থেকে কমলেশের কাজের টেবিলে দু-একটা দরকারি কাগজের খোঁজ নিতে।

সাধারণ পরিচয়।

মাসখানেকের পরে গণেশ অ্যাভিনিউয়ের একটা দোকানে আবার দেখা হয়ে গেল। সৌজন্যের হাসি। রাস্তায় তখন এক বিশাল মিছিল চলেছে। বাইরে এসে অপেক্ষা করতে করতে একথা সেকথা। আধঘণ্টা আর নড়া গেল না।

পরিচয় পাকা হল ক্রমশ।

পরে বন্ধুত্ব। শেষে মন খুলে কথা বলা। গোপনতা নেই, চালাকি নেই, এমনকী ছেলেমানুষের মতন আবেগ ভাবালুতাও নেই।

ভাল লাগা স্বাভাবিক। ভালবাসাও যুক্তিহীন নয়।

বাড়িতে কোনও পরিবর্তনই ঘটেনি। বরং আরও মলিন কুটিল হয়ে গিয়েছে জীর্ণ বাড়িটা। কাকা পঙ্গু। কাকিমা বড়ছেলেকে তাড়িয়ে দিয়েছে বউ সমেত, জেঠামশাইয়ের ছেলে নিজেই অন্য জায়গায় ফ্ল্যাট নিয়ে চলে গিয়েছে, পচা ডিম ভেঙে ছড়িয়ে গেলে যেমন উৎকট আঁশটে গন্ধ বেরোয় —সেইরকম এক গন্ধ বাড়ির ছাদ থেকে নীচের উঠোন পর্যন্ত।

বাবাকে হঠাৎ যেন ভূতে ভর করল। চুপচাপ নিচুমুখে থাকা মানুষটা কেমন একরোখা হয়ে উঠল। কমলেশ বুঝতে পারল না কেন?

"ওরা ভেবেছে কী? আমায় ঠেলতে ঠেলতে দরজা পর্যন্ত এনেছে। এরপর আমায় ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দেবে নাকি!"

"কে আপনাকে বার করে দিচ্ছে?"

"তোমার চোখ নেই, দেখতে পাও না!"

"কই, আমি..."

"শোনো, আমি-তুমি নয়। এই বাড়ি আমি ছাড়ব না। সদানন্দর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। সে বাঘা উকিল। বলেছে, আমার রাইট আর একচুলও সে ওদের অধিকার করতে দেবে না। উলটে ওরা খেতে পেলে শুতে চায় গোছের মতলব নিয়ে আমায় যেভাবে ঠেলে দিয়েছে একপাশে তার পালটা নেবে।"

কমলেশ বলল, "আপনি হঠাৎ পুরনো ব্যাপার নিয়ে..."

"তোমার কাছে পুরনো হতে পারে। কিন্তু এই বাড়ি আমার পৈতৃক। এখানে আমার ততটাই অধিকার আছে—যতটা ওদের।"

অকারণ কথা বাড়াল না কমলেশ।

ওইসময়েই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল। বুঝতেও পারেনি অসুখটা ক'দিনের মধ্যেই অমন জটিল হয়ে উঠবে।

তারপরই হাসপাতাল।

বিছানায় উঠে বসল কমলেশ।

একটু জল খেতে পারলে হত। ফ্লাস্কে জল আছে। রোজই শোওয়ার আগে রেখে দেয় মাথার পাশে একটা টুলে। কোনওদিন খায়, কোনওদিন দরকার হয় না।

কমলেশ অনুমানে হাত বাড়াল।

ফ্লাস্ক তুলে নিয়ে মুখের ঢাকনি খুলল, ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে জল। খেল। অনেকটাই। ফ্লাস্ক রেখে দিল।

তারপর নিজের মনেই জোরে জোরে বলল, "কী আছে একটা পুরনো ভাঙা বাড়িতে! কীসের পৈতৃক! অধিকার নিয়ে আপনি ধুয়ে খাবেন! মাথায় নিয়ে যাবেন অধিকার যাবার সময়! আপনি আমাদের সঙ্গে যাবেন। কে দেখবে আপনাকে আপনার ওই পৈতৃক বাড়িতে! আর যদি আপনি না যান, যেতে না চান—তবে পড়ে থাকবেন। আমি চাই না আপনি ওভাবে একা থাকুন। তবু যদি আপনি জেদ ধরেন, থাকবেন আপনি আপনার অধিকার বজায় রাখতে। আমি থাকব না। আমারও নিজের জীবন আছে! আমরা বাঁচতে চাই।" কমলেশ কেমন কঠিন হয়ে যাচ্ছিল।

এগারো

মধুসূদন তাঁর বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

কমলেশ আর সুমতি কাঠের পলকা ফটক খুলে কাছে এসে দাঁড়াল। সুমতি হাসিমুখে বলল, "কেমন আছেন আপনি? আমি কাল এসেছি।"

"ভাল। তুমি কাল এসেছ, জানি। কেমন আছ তুমি?" মধুসূদনও হাসিমুখে জবাব

দিলেন। তাঁর পরনে মোটা সুতির ধুতি। গায়ে গলাবন্ধ চিনে কোট, খদ্দরের ; কাঁধে গরম চাদর, খরখরে দেখতে।

সুমতি বলল, "আমি যেমন ছিলাম তেমনই আছি।"

মধুসূদন চোখের ইশারায় কমলেশকে দেখালেন, "কেমন দেখছ? উন্নতি হয়েছে?"

সুমতি লজ্জা পেল। মাথা হেলিয়ে দিল। হয়েছে।

"তোমায় বলেছিলাম না, এখানের জলহাওয়ায় টনিক আছে", মধুসূদন ঠাট্টার গলায় বললেন, "পয়সা খরচ করে শিশি শিশি খেতে হয় না, দশ-বিশ দিন থাকলেই গায়ে লাগে।" বলে সামান্য দূরে তাকিয়ে কাকে যেন দেখতে পেয়ে হাত তুলে কাছে ডাকলেন। আবার সুমতিদের দিকে তাকালেন। "এইসময়টা সবচেয়ে ভাল। বেস্ট সিজ্‌ন। শীত পড়ার আগে থেকে গরম পড়ার সময় পর্যন্ত। অত্যন্ত চমৎকার।"

কমলেশ হেসে বলল, "যে যত্নে আরামে আমি আছি। মাসিমারা এত ভাল, এমন নিজের মতন করে দেখেন।"

"আরে ভাই, বুঝেশুনেই না আপনাকে ওঁদের হাতে দিয়েছি। কাউকে পছন্দ হলে আপন করে নেন, অপছন্দ হলে মুখ ফিরিয়ে থাকেন।"

মধুসূদন যাকে ডেকেছিলেন সে ততক্ষণে কাছে চলে এসেছে। কমলেশ চেনে তাকে। কাজ করে এখানে। নাম বিন্দা, এই অঞ্চলের আদিবাসী বোধহয়। বসা মুখ, কোঁকড়ানো চুল, ছোট ছোট, বয়সে জোয়ান, তিরিশ-বত্রিশ হবে, গায়ের রং কালো—বা কালো-খয়েরি।

বিন্দাকে মধুসূদন যা বললেন তাতে মনে হল, তিনি বিশেষ একটা জায়গা সাফসুফ করতে বলছেন।

বিন্দা চলে গেল।

পা বাড়ালেন মধুসূদন। "এবার শীত পালাবে—" বলে সুমতিকে কী যেন দেখাবার চেষ্টা করলেন, "ওই গাছটা দেখেছ? কী নাম ওর জানি না। এরাও কেউ বলতে পারে না। বিন্দারা বলে চিকনি। ওই যে ছোট ছোট পাতা, তুলসী পাতার মতন, শীতের মুখে সবুজ লতাপাতাগুলো জাফরানি রং ধরতে থাকে, গাঢ় হয়, তারপর এইসময়টা থেকে দেখেছি শুকোতে থাকে, শেষে ঝরে পড়ে।"

সুমতিরা দেখল।

"আপনি খুব খুঁটিয়ে নজর করেন, না?" সুমতি হেসে বলল।

"দেখতে দেখতে অভ্যেস হয়ে গেছে।...ধরো, ওই আকাশের তলায় এখন যে রোদ দেখছ, তা কিন্তু আগের মতন নেই। পৌষে মাঘের গোড়ায় অনেক বেলা পর্যন্ত একটা হালকা ধোঁয়াটে কুয়াশা থাকে, এখন আর নেই। পরিষ্কার। তাত-ও বাড়ছে—বুঝতে পারছ না?"

সুমতি মাথা নাড়ল। কমলেশও।

বাড়ির ফটক খুলে বাইরে এলেন মধুসূদন। পাশে পাশে কমলেশরা। ফটক বন্ধ করলেন মধুসূদন।

"আমি একবার ওই কটেজটায় যাব। কাল সন্ধেবেলায় কারা চেঁচামেচি করছিল। কী হয়েছে জানি না।"

ডানদিকে সামান্য তফাতে ছাড়া ছাড়া তিনটে কটেজ। আগুপিছু। একটা কটেজের সামনে কাঠের চেয়ার পেতে এক বয়স্ক ভদ্রলোক বসে আছেন, বাচ্চা মতন একটি মেয়ে স্কিপিং করছে, পুতুল পুতুল চেহারা, মাথায় স্কার্ফ-বাঁধা।

"ওই কটেজে?"

"না পেছনেরটায়।"

"কারা আছে?"

"জনা চারেকের এক ফ্যামিলি। ভদ্রলোক রেলের অফিসার ছিলেন। রিটায়ার্ড। স্ত্রী অ্যাজমা রোগী, ছেলের বউ আর নাতি। কটক থেকে এসেছেন ভদ্রলোক।...তোমরা দাঁড়াবে, না এগোবে।"

"দাঁড়াই না!"

মধুসূদন এগিয়ে গেলেন।

কমলেশরা দাঁড়িয়ে।

এখান থেকেই দেখা যায়, শান্তি নিবাসে লোকজন আছে। এক মহিলা একটি বউয়ের সঙ্গে রোদে হাঁটতে হাঁটতে গল্প করছেন, এক বৃদ্ধ ছড়ি হাতে পায়চারি করছেন, একটি কমবয়সি মেয়ে ক্যামেরা হাতে ফোটো তোলার শখ মিটিয়ে নিচ্ছে। গাছগাছালির মাথায় রোদ মাখিয়ে মাঠে মাঠে ছড়ানো। ওরই মধ্যে পাখি উড়ে গেল। ঝাঁক বেঁধে চড়ুই শালিখ নামছে, উড়ে যাচ্ছে।

কমলেশের কালকের রাতের কথা মনে পড়ে গেল হঠাৎ। সুমতির দিকে তাকাল।

সুমতির গড়ন অন্য পাঁচটা বাঙালি মেয়ের মতন। মাথায় অবশ্য সামান্য লম্বা। গায়ের রং আধ-ফরসা। কিন্তু মুখের ছাঁদটি পরিষ্কার। মানানসই কপাল, টানা চোখ—তবে পাতা যেন পুরোপুরি খোলে না। নাক, থুতনি ভাল। কাঁধ বেশি ছড়ানো নয়, বুক ভারী, কোমর সামান্য স্ফীত। সুমতিকে সুন্দরী বলা যাবে না। তবে সব মিলিয়ে সুশ্রী অবশ্যই। তার চেয়েও বড় কথা ওর মধ্যে একটা গাম্ভীর্য, ব্যক্তিত্ব ও বয়স্কতা রয়েছে।

"শুনলে না?" সুমতি আবার বলল।

কমলেশ অন্যমনস্ক থাকায় সুমতি নিচুগলায় ছোট করে কী বলেছে খেয়াল করেনি। "কিছু বললে?"

"কান কোথায়?"

কমলেশ হেসে ফেলল। নিজের কান দেখিয়ে ঠাট্টা করে বলল, "কেন নেই নাকি?"

"কী ভাবছিলে?"

"ভাবছিলাম কোথায়, তোমায় দেখছিলাম।"

"বাজে কথা বোলো না।...বলছি, তুমি কাল যে সাইকেল চালিয়েছ অতটা..."

"ধুত অতটা নয়। বললাম তো কাল। অল্পই।"

"পেটে কোমরে ব্যথাটাথা হয়নি তো। রাত্তিরে কোনও কষ্ট—?"

"কষ্ট!" কমলেশ মনে মনে 'কষ্ট' কথাটাকে যেন অনেকটা ছড়িয়ে দিল। দিয়ে নিজেই আবার সামলে নিল। "না, কষ্ট হবে কেন!"

"আমি কাল মরার মতন ঘুমিয়েছি।"

"টায়ার্ড ছিলে। ভাল ঘুম হয়েছে।"

"তা খানিকটা ঠিক। আসলে এবার এসে তোমাকে দেখে আমি অনেক স্বস্তি পেয়েছি। চিঠিতে তুমি লিখতে ভাল আছ। মাসিমাদের কাছে তুমি যত্ন পাবে—তাও জানতাম। তবু, ভাল জায়গায় থাকলে, যত্নআত্তি পেলেই যে শরীর সেরে উঠবে—তা সবসময় হয় না। মন খুঁতখুঁত করত।"

"এখন তুমি নিশ্চিন্ত।"

"অ-নেক।"

মধুসূদন ফিরে আসছিলেন। দেখতে পাচ্ছিল কমলেশরা।

কমলেশ কথার জের টেনে বলল, "এখন যখন তুমি নিজের চোখেই দেখছ, আমি ফিট হয়ে গিয়েছি, অল রাইট, তখন ফেরার ব্যাপারটা ঠিক হয়ে যাক। আমি ফেব্রুয়ারিতেই ফিরছি। মাঝামাঝি।"

"হবে। আমি আসব।" গায়ের চাদর সরিয়ে এলোখোঁপাটা সামলে নিতে নিতে বলল সুমতি।

কমলেশ ঠাট্টা করে বলল, "তুমি না এলেও আমি পারব। আরে, আমার তো হাত-পা আছে। বয়সও কম হল না। জিনিসপত্র গুছিয়ে ঠিক চলে যাব।"

"সে আমি বুঝব।"

মধুসূদন কাছে এসে পড়লেন।

কমলেশ বলল, মধুসূদনকে, "ব্যাপার কী? কী হয়েছিল?"

মাথা নাড়তে নাড়তে মধুসূদন বললেন, "অত লাফালাফি হইচইয়ের মতন হয়নি কিছু। ভদ্রলোকের বিছানার কাছে একটা বিছে নজরে পড়েছিল। মেঝেতে। তাতেই ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন।"

"বিছে?"

"আমাদের এই কটেজগুলো বড় বড় হোটেল বোর্ডিং নয়, সিমেন্টের মেঝে, এক ইটের দেওয়াল, মাথায় টালির চাল, তলায় চটের সিলিং। দু-একটা বিছে বেরোতেই পারে। বর্ষাকালে ব্যাঙের উপদ্রব হয়। সাপও চোখে পড়েছে। আমরা সবসময় ঘরদোর পরিষ্কার রাখি, ওষুধ ছড়াই। তবু বেরোয়। শীতে অবশ্য সাপ দেখা যায় না। তা আপনি বলুন, কোন ফাটাফুটি থেকে একটা বিছে বেরিয়েছে—আমি কী করতে পারি! ভদ্রলোক আমায় দেখে যা চিৎকার জুড়লেন—!" মধুসূদন এখনও কমলেশকে 'আপনি' বলে কথা বলেন। "আমি মশাই বড়ই বিব্রত হয়ে পড়লাম!"

"বিছেটার কী হল?"

"ওঁর ছেলেই মেরে ফেলেছে।"

"বিষাক্ত?"

"দেখিনি। বিছে মেরে কাগজ পুড়িয়ে তাকে দাহ করা হয়েছে", মধুসূদন হাসলেন, যেন পরিহাসটা মন্দ হল না।

"না, মানে বিষাক্ত হলে কামড়ালে ভদ্রলোক..."

"জ্বলে মরতেন। আমাকেও জ্বালাতেন।...তবে হ্যাঁ, খারাপ বিছেও আছে।

বিষাক্তও। তাতে মানুষ মরে না। কমপক্ষে একটা দিন ভীষণ জ্বলতে হয়।"

মধুসূদন হাঁটতে শুরু করছিলেন। পাশাপাশি কমলেশরাও হাঁটছিল। "ভদ্রলোক আমায় চিটু, গলাকাটা ব্যবসাদার বললেন। কটেজের ভাড়া বেশি নিই, খাটাল টাইপের ঘরদোর, কোনও ভাল ব্যবস্থা নেই, খাওয়াদাওয়া অত্যন্ত খারাপ— ; আমরা শুধু টাকাটা চিনেছি।"

কমলেশ একবার সুমতির মুখের দিকে তাকাল। তারপর মুখ ফিরিয়ে মধুসূদনের দিকে। "আপনি কিছু বললেন না?"

"না। জোড়হাতে ক্ষমা চেয়ে নিলাম।...ওঁরা শহুরে লোক, বড় বড় চাকরিবাকরি করেছেন। ধমকধামকের ভাষা জানেন। ইংরিজি হাঁকাতে পারেন। আমরা জংলি লোক। এখানে পাঁচজন আসে। কত বিচিত্র লোকই দেখেছি। ঝগড়া করে কী করব বলুন।"

সুমতি বলল, "তা বলে আপনাকে চিটু বলবে!"

"বলুক।...এখন কিছু বলব না ; ভদ্রলোক যাবার সময় আমাদের পাওনা পয়সাকড়ি কড়ায়গণ্ডায় না মিটোলে, বাক্সবিছানা আটকে রাখব।"

মধুসূদন সাদাসিধেভাবে বললেন। কিন্তু বোঝা গেল, নিতান্ত কথার কথা ওটা নয়।

হাঁটতে হাঁটতে শান্তি নিবাসের অফিসঘরের কাছাকাছি এসে মধুসূদন একটা গাছ দেখালেন। "মহানিম। কত বড় দেখছেন। কোথায় মাথা!...বইয়ে বলে যে-গাছ যত বেশি ছায়ায় থাকে সেই গাছ তত লম্বা হয় মাথায়। বড়। এটা কিন্তু ছায়ায় নেই। রোদে বৃষ্টিতেই বড় হয়েছে।" বলে সামান্য থেমে মধুসূদন হাসিমুখেই বললেন, "ছায়ায় থেকে বেশি বড় হবার দরকার কী মশাই, এমনিতে যতটা মাথা তোলা যায় ততই ভাল আমাদের পক্ষে!"

মধুসূদন দাঁড়ালেন। বোঝা গেল, তিনি এবার তাঁর কাজকর্মের তদারকিতে যাবেন। কমলেশরা আপাতত বিদায় নিতে পারে।

কমলেশ সুমতির দিকে তাকাল।

মাথা হেলাল সুমতি।

ফেরার পথে সুমতি গায়ের শালটা আলগা করে নিল। উলের হাফ হাতা সোয়েটার নীচে। গরম লাগছিল। রোদের তাত যেন দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। কপালে পাতলা ঘাম।

মাঠের মধ্যে একটা কুলঝোপ। কয়েক পা এগোলেই হেলেপড়া এক হরীতকী। নীচে একটা পাথর। কাঁকর, নুড়ি, মরা ঘাস ছাওয়া এই প্রান্তর একেবারে সমতল বলা চলে।

সুমতি বলল, "একটু বসি।"

"বসো।"

পাথরের ওপর মাথা বাঁচিয়ে বসল দুজনে। ছায়া কিন্তু যথেষ্ট নয়। পাতা খসে পড়ছে হরীতকীর ডাল থেকে।

টি-টি টি-টি ডাক। একটা খয়েরি পাখি উড়ে গেল। কয়েকটা ফড়িং বোধহয়।

আকন্দ ঝোপের কাছে উড়ছে।

একেবারে চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে কমলেশ একবার হাত ছড়িয়ে পিঠ হেলিয়ে ক্লান্তি ভাঙল।

তারপর হঠাৎ বলল, "আমি কিন্তু উৎপলকে সত্যি সত্যি চিঠি লিখে দিচ্ছি। কাল পরশুই দেব।"

কথাটা শুনল সুমতি। ঘাড় ফেরাল না। বলল, সামান্য অপেক্ষা করেই, "এত তাড়ার কী আছে। তুমি তো ফিরেই যাচ্ছ! তখন—!"

"বাড়ি কি বললেই পাওয়া যায়। ওকে চেষ্টা করতে হবে। সময় লাগবে। এক মাস-দু' মাস... ; আগে থেকে না বললে!"

সুমতি এবার ঘাড় ফেরাল। দেখছিল কমলেশকে। আগে লক্ষ করেনি, এখন নজরে পড়ল, ওর চোখের মধ্যে কেমন যেন লালচে ভাব। ক্লান্তি, না, ঘুম ভাল না হবার অবসাদ!

"আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি। তা ছাড়া ও তোমার সঙ্গে দেখা করবেই। আমি সিয়োর। তুমিও বলবে।"

"তুমি এত তাড়া করছ—!"

"বা, তাড়া করব না। কলকাতায় বাড়ি পাওয়া সোজা কথা। তার ওপর পছন্দ সুবিধে অসুবিধে আছে। ভাড়াও একটা ফ্যাক্টর। আমরা তো বিশ-পঁচিশ হাজারের চাকরি করি না। কতটা সামর্থ্য আমাদের তাই বুঝে বাড়ি দেখতে হবে।"

সুমতি কপালের চুল সরাল। হাওয়ায় এখন শীত নেই। ঠান্ডাভাব রয়েছে ঈষৎ। দূরে কোথাও একটা ঘণ্টা বাজছে। বোঝা যাচ্ছে না কীসের ঘণ্টা।

সুমতি বলল, "কলকাতায় ফিরে তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলে যা করার করলে পারতে না!"

"বাবা!" কমলেশের মাথায় কাল রাত্রের স্বপ্ন ভেসে বেড়াচ্ছিল, ছেঁড়া ছেঁড়া ভাবে, বাবার মুখটাও যেন সে দেখতে পাচ্ছিল। কিছুটা বিরক্ত হল সে, অল্প উত্তেজিত। বলল, "বাবার কথা আমি ভেবেছি। বাবার আপত্তি করার কোনও কারণ নেই। তবু যদি করে সেটা মিনিংলেস হবে।"

"মানে?"

"মানে বাবা যদি ওই বস্তির মতন বাড়িটা ছাড়তে না চায়—আমি কী করব। বাবাকে আমি বলব, আপনার ওসব পৈতৃক-ফৈতৃক ছাড়ুন। ওই বাজে সেন্টিমেন্ট, রোখের মানে হয় না। বরং আপনি ওদের বলুন—আপনার যেটুকু অংশ এখনও আছে—সেটা আপনি বেচে দিতে চান।"

"বেচে দিতে বলবে—!"

"আরে বেচে দিলে ক'টা টাকা পাওয়া যাবে নগদ। ওদেরই কেউ অংশটা কিনে নেবে। নিতেই পারে। এ তো হরদম হয়।"

"তুমি—তুমি কেমন করে বুঝছ, তোমার বাবা এতে রাজি হবেন?"

কমলেশ এবার স্পষ্ট বিরক্ত, অসন্তুষ্ট। তার যেন রাগই হচ্ছিল। রুক্ষভাবে বলল, "রাজি না হলে বাবা যেভাবে আছে—সেইভাবে থাকতে হবে। আমার কিছু করার

নেই।"

সুমতি চুপ। কমলেশও বিরক্তভাবে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকল। প্রান্তরে দু পাক ঘূর্ণি উঠল, চোখে পড়ল একটা বয়েল গাড়ি মাঠের তেঁতুলগাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে পশ্চিম দিকে চলে যাচ্ছে। বয়েলের গলায় বাঁধা মোটা সুতলির তলায় ঘণ্টি বাঁধা। শব্দ ভাসছিল বাতাসে। চিল উড়ে যাচ্ছিল। মাথার ওপর থেকে পাতা খসে পড়ছে।

উঠে দাঁড়াল সুমতি। "চলো।"

কমলেশও উঠে পড়ল।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে কমলেশ নিজেই বলল, "আমি জানি না বাবা শেষ পর্যন্ত কী বলবে! যদি বাবার বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ না পেয়ে গিয়ে থাকে একান্তই, তা হলে আমি যা বলছি তার চেয়ে ভাল আর কী হতে পারে। আমি ছেলে হিসেবে বাবার ওপর আমার কর্তব্য করতে রাজি। আমি ছাড়া বাবার আর কে আছে! ...তা সত্ত্বেও বাবা যদি পৈতৃক বাড়ি, অধিকার, নিজের জেদ নিয়ে থাকতে চায়— থাকুক। আমি কী করব! ...তা ছাড়া এতকাল পরে, কীসের পৈতৃক, কী চুলোর অধিকার। পৈতৃক আর অধিকার নিয়ে ধুয়ে খাবে! কী আছে ওই বাড়িতে? ক'টা নোনা ধরা ইট, বালিখসা দেওয়াল, শ্যাওলা পড়া উঠোন আর বারোয়ারি কলতলার দুর্গন্ধ! আমি ওসবের কেয়ার করি না।" বলে কমলেশ থামল। ঝোঁকের মাথায় জোরে জোরেই বলেছে কথাগুলো। গলার স্বর জড়িয়ে আসছিল।

নীরবে খানিকটা হেঁটে আসার পর সুমতি শান্তভাবে বলল, "তুমি কলকাতায় না ফেরা পর্যন্ত কিছুই যখন হবে না, মাথা গরম করে লাভ! এখন থেকেই অশান্তি করছ কেন! মিছেমিছি শরীর মন খারাপ।"

এবার ছায়ায় এসে পড়েছে দুজনে। পাশাপাশি গাছ। নিম, কাঁঠাল, পাকুড়। পাখিটা হরিয়াল কি না বোঝা গেল না। মাঠে আর ঘাস নেই বললেই চলে, কাঁকর অজস্র। বুনো ঝোপ।

কমলেশ নিজেকে সামলে নিয়েছে।

রাগ বিরক্তি ততটা নয়, যতটা ক্ষোভ আর দুঃখ। বলল, "সুমি, আমার কথা তুমি সবই জান। তোমায় বলেছি। অবশ্য কোনও মানুষের জীবনের কথা শুনে তার সমস্ত কিছু জানা যায় না, বোঝাও যায় না। অনুভব করাও বা কতটুকু যায়। সামান্য মাত্র। কমলেশ পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছে নিল।

"আমি জানি," সুমতি বলল।

"আমার জ্ঞান হবার বয়স থেকে আমি আমাদের বাড়ি, আত্মীয়স্বজন দেখছি। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে বুঝতে শিখেছি। শুধু বুঝতে শিখিনি অনুভব করতে পারতাম। আমার বাবা আজ লাফালাফি করলে কী হবে— যখন বয়স ছিল সামর্থ্য ছিল খানিকটা তখন একেবারে অপদার্থ ছিল। অপদার্থ বললে হয়তো অপমান করা হয় বাবাকে। তবু বলছি। আমার মাকে এত কষ্ট আর দুঃখ সয়ে থাকতে হয়েছে তুমি ভাবতে পারবে না। দাসীর মতন দিন কেটেছে মায়ের। গায়ের একটা গয়নাও মা রাখতে পারেনি বাবার জন্যে। অভাব, অভাব, ব্যবসা চলছে না, দেনা...

কী বলব তোমায়। আমি যে কী গ্লানি সহ্য করে মানুষ হয়েছি তুমি ধারণা করতে পারবে না। বাবা আমার জীবনে কোনওরকম সাহায্যে আসেনি। হি হ্যাজ গিভন্ মি অল্ শেম অ্যান্ড হিউমিলিয়েশন্। ...একদিন আমার খুড়তুতো ভাই নবা বলেছিল তুই গেঞ্জিঅলার বাচ্চা, তোর আবার ভদ্দরলোক হবার কী আছে রে? ...দুজনে ঘুষোঘুষি হয়ে গেল। কাকিমা আমার মাকে বলল, যার কাপড়ের পেছনে সেলাই দেখা যায় তার আবার ইজ্জত। ...কী বাড়িতেই আমি মানুষ!”

সুমতি হাত বাড়িয়ে কমলেশের জামা ধরে টানল। “আঃ, রাখো তো! যত পুরনো কথা...! তুমি কি ভাব আমি তোমার চেয়ে কম সয়েছি! কার গায়ে কত কাঁটা ফুটেছে, তার হিসেব কষে লাভ নেই।”

কমলেশ চুপ করে গেল।

বারো

সুমতি ফিরে গিয়েছে সপ্তাহখানেকের বেশিই হল। চিঠিও লিখেছে। সে ফিরে যাবার পর পরই উৎপল একদিন তার বাড়ি— কাঁকুলিয়ায় হাজির হয়েছিল। কথাবার্তা কী হয়েছে— তা অবশ্য সুমতি লেখেনি।

কমলেশ এখন শারীরিকভাবে বেশ সুস্থ। একদিন শেষ রাতে পেটে ব্যথা উঠে ঘুম ভেঙে যাওয়ায় সে প্রথমটায় ভয় পেয়ে গিয়েছিল, খানিকটা বেলায় অবশ্য ব্যথাটা নিজের থেকেই মিলিয়ে গেল। মামুলি ওষুধ, তিল পরিমাণ, একটা ট্যাবলেট খেয়েছিল কমলেশ যদিও, তবু ওটা হয়তো না খেলেও চলত। আগের থেকে সে এখন খানিকটা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে, মানে গোড়ায় গোড়ায় যেভাবে নিয়মিত এবেলা ওবেলা বাঁধা ওষুধগুলো খেত, খেতে বাধ্য হত, কিছুটা ডাক্তারের হুকুম মতন, সুমতির তাগাদায় ইদানীং ভাল থাকার জন্যে, কখনও বা বিরক্তিবশত, বাদ পড়ে যায়, বা আর ইচ্ছে করে না খেতে। কত আর ওষুধ খেতে পারে মানুষ। অনেক হয়েছে!

নিজের এই ভাল থাকার জন্যে কমলেশ অবশ্যই এখানকার জল হাওয়া প্রকৃতিকে কৃতজ্ঞতা জানাতে পারে, আর পারে লালাসাহেবদের। বিশেষ করে ইন্দিরা মাসিমার যত্ন ও মমতা ছাড়া সে এতটা ভাল থাকত কি না কে জানে!

সে ভাল আছে, কলকাতায় ফেরার জন্যে ব্যস্তও হয়ে পড়েছে খুব, এখানের এই আলস্য তাকে একঘেয়েমির জড়তায় বিরক্ত করেছে রীতিমতো। অফিস, চাকরি, কাজকর্ম, কলকাতার বন্ধুরা তাকে টানবে— সেটা স্বাভাবিক। তার চেয়েও তার দুর্ভাবনার অনেক কারণ আছে। বাবাকে নিয়ে ভাবনা হয় বই কি। অন্য দুশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছে, অর্থ। সুমতি অনেক করেছে। তার ঘাড়ে অর্থের সব দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে কমলেশ কতদিন আর বসে বসে নিষ্কর্মার মতন দিন কাটাতে পারে! সংকোচ তার হবেই।

কমলেশ এখন চায়, বাকি দিনগুলো যেন তাড়াতাড়ি পেরিয়ে যায়। ক্যালেন্ডারের পাতা দেখার দরকার হয় না তার, হিসেবটা মনে মনেই হয়ে যায়, ফেব্রুয়ারির পাতা

খুলে গিয়েছে, আর মাত্র দশ-বারোটা দিন।

শীত যেন দিন দিন নরম হয়ে আসছিল। আজকাল আর একই রকম হাওয়া বয় না, উত্তরের সেই ছুটে আসা কনকনে বাতাস আটকা পড়ছে কোথাও, বরং একটা এলোমেলো, চঞ্চল হাওয়া আসে হঠাৎ হঠাৎ। মাঘ শেষ হয়ে এল। সামনে ফাল্গুন। শিমুলের মাথায় ফুল ফুটছে।

সেদিন কমলেশ বিকেলের দিকে বেরোবার জন্যে তৈরি। খানিকটা ঘোরাঘুরি করে আসবে, নিজের ঘর থেকে বাগানের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, চোখে পড়ল— ইন্দিরা মাসিমা ফটকের সামনে কাঠের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মনে হল, তিনি যেন পিঠ ভর দিয়ে ফটকের একটা কাঠ ধরে সামলে নিচ্ছেন নিজেকে।

কমলেশ তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল। ইন্দিরা মাসিমার শরীর যে ভাল যাচ্ছে না— সে জানে। তিনি দুর্বল হয়ে পড়ছেন। মাঝে মাঝেই মাথা ঘুরে যায়। পায়ের ব্যথা তাঁকে ততটা ভোগাচ্ছে না— যতটা শ্বাসকষ্ট ওঁকে ক্রমশই অসুস্থ করে তুলছে। এই উপসর্গ তাঁর অতটা ছিল না। সম্প্রতি বেড়েছে। বেশিরকম কষ্ট হলে মাসিমা শুয়ে থাকেন, নয়তো বরাবরের মতন বাড়ির মধ্যে ঘুরছেন, খুটখাট নাড়াচাড়া করছেন এটা ওটা, সাথিয়া বা পলুয়াকে বলছেন কিছু।

“মাসিমা?”

ইন্দিরা তখনও গেট ধরে দাঁড়িয়ে।

“আপনার কষ্ট হচ্ছে?”

“মাথাটা কেমন টলে গেল।”

“আপনি হাঁপাচ্ছেন!”

“ও-ই! ...ঠিক হয়ে যাবে।”

“আপনি আসুন”, কমলেশ হাত ধরল ইন্দিরার। “আসুন। বাগানে এসেছিলেন কেন?”

ইন্দিরা পা বাড়ালেন। “ভাবলাম একটু পায়চারি করি। করছিলাম। হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গেল। ফটকটা ধরে ফেললাম।”

“ঠিক আছে। আসুন।”

ইন্দিরাকে ধরে ধীরে ধীরে হাঁটিয়ে এনে বাংলোর বারান্দায় তুলল কমলেশ। চেয়ার এগিয়ে দিল বসবার জন্যে। সাথিয়াকে ডাকল। জল আনতে বলল খাবার।

ইন্দিরা চেয়ারে বসে পিঠ এলিয়ে দিলেন। তাঁর মুখে কেমন এক ক্লান্তি, ঈষৎ পাণ্ডুর ভাব। চোখ ম্লান। মুখে হাসি আনার চেষ্টা করছেন, পারছেন না। বরং এই যে আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তার জন্যে বিব্রত বোধ করছেন। কমলেশ চুপ করে তাঁকে দেখছিল।

সাথিয়া জল আনল। জল খেলেন ইন্দিরা।

সামান্য সুস্থ বোধ করার পর বড় করে নিশ্বাস ফেললেন ইন্দিরা।

কমলেশ একটা চেয়ার টেনে বসল। “ওবেলা তো ভাল ছিলেন।”

“ছিলাম”, ইন্দিরা মাথা হেলালেন। “দুপুরেও বই পড়ছিলাম। এখন বই পড়া মানে চোখে পড়া, মাথা অন্যদিকে চলে যায়।” বলে একটু হাসলেন, “মন দিতে পারি না।”

"ও কিছু নয়। হয় অমন। মেসোমশাই কোথায়?"
"এই তো বেরোলেন। আমি বাগানে হাঁটছি দেখে বলে গেলেন, বেশি ঘুরবে না।"
"ভাল লাগছে এখন?"
"হ্যাঁ। ...তুমি এবার যাও। ঘুরে এসো।"
"থাক। রোজই তো ঘুরছি। আপনার কাছে বসি বরং...।"
"আমি ঠিক আছি। বয়স হলে মাঝে মাঝে শরীর খারাপ হয়, আবার ঠিক হয়ে যায়। তুমি ভেবো না। যাও, বেড়িয়ে এসো।"
কমলেশ উঠল না। ইন্দিরাকেই দেখছিল। মায়ের মুখ মনে পড়ল। কোনও মিল নেই। মা একেবারে সাদামাটা সাধারণ দেখতে ছিল। গায়ের রংও ময়লা। শুধু মায়ের মাথার চুল ছিল ঘন এবং লম্বা, পিঠ ছাপিয়ে যেত আর মোটা মোটা চোখের ভুরু। চেহারায়, চলনে বসনে ভূষণে মায়ের কোনও আভিজাত্য ছিল না। ইন্দিরা মাসিমা যে সুন্দরী ছিলেন অনুমান করতে কষ্ট হয় না। গায়ের রং, গড়ন, মুখ— সবই মুগ্ধ করার মতন। উনি অভিজাত ছিলেন। এখনও তাই। কমলেশ শুধু বলতে পারে, ইন্দিরা মাসিমার শারীরিক খুঁতের মধ্যে ওঁর থুতনি আর গলা; থুতনি বসা, ভাঙা ভাঙা দেখায়। গলা সামান্য খাটো, মানে কণ্ঠা আর থুতনির মধ্যে তফাত কম। তবে তাতে কী! মাসিমার স্নেহ যত্নের তুলনা সে কোথায় পাবে!
"দেখছ— ওই দেখো—" ইন্দিরা বললেন, বলে চোখ দিয়ে বাইরের দিকটা দেখালেন।
কমলেশ তাকাল। প্রথমটায় বুঝতে পারেনি, পরে চোখে পড়ল। ফটকের বাইরে ইউক্যালিপটাস গাছের মাথার পাতা ছুঁয়ে গোধূলির আলো শূন্যে ছড়িয়ে গিয়েছে। সামান্য পরে আর চোখে পড়বে না। ধূসরতা নেমে আসবে। কিছুদিন আগেও এইসময়ে আঁধার নেমে আসত। এখন বেলা বেড়েছে। প্রায় মুছে-যাওয়া রোদ ফিকে আলো রেখে যায় আকাশতলায়। তারপর গোধূলি যেন পশ্চিমে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে রক্তিম হয়ে, মাত্র অল্পসময়, শেষে ছায়া জমে যায়, চারপাশ থেকে মেঘের মতন সন্ধ্যার ছায়া ভেসে আসে।
"গোধূলি—?"
"হ্যাঁ। ফটকের কাছ থেকে দেখতে ভাল লাগে। পুরো আকাশটা দেখা যায় ওপাশের।"
"বেশ তো! কাল দেখবেন।"
ইন্দিরা কী ভাবলেন। উদাস গলায় বললেন, "দেখি বই কি! ...এবার তুমি যাও, ঘুরে এসো অন্ধকার হয়ে যাবে এরপর।"
"একদিন না ঘুরলে কী হয়! বরং আপনার সঙ্গে গল্প করি।"
"আমার সঙ্গে আর কী গল্প করবে! এতদিন দেখলে। সবই তো জান।"
কমলেশ আবার একবার বাইরে তাকাল। ইউক্যালিপটাসের মাথার ডালগুলো এবার বাতাসে দুলছে। আলো উঠে গিয়েছে মাথা ছাড়িয়ে।
ইন্দিরা বললেন, "এক এক সময় আমার কী মনে হয় জান? ...আমরা যদি গাছের পাতা, পাখি, ফুল ফল হয়ে জন্মাতে পারতাম ভাল হত। মানুষ হয়ে জন্মালে বড়

বেশি বোঝার ভার বইতে হয়। তুমি কতদিন তা পার! একসময় আর শক্তি থাকে না। তখন মনে হয়, এবার যেন শেষ হয়ে যায়...।"
কমলেশ বুঝতে পারছিল সবই। তা ছাড়া আজকাল যে মাসিমার শরীর মন ভাল যাচ্ছে না তা সকলেই বুঝতে পারে, কথাও হয়, মাসিমার সরাসরি সঙ্গে নয়, অন্যদের সঙ্গে। সুমতিকেও এবার বলেছে কমলেশ। সুমতিও ধরতে পেরেছে। কিন্তু তার পক্ষে মাসিমার সঙ্গে ওসব নিয়ে কথা বলা সম্ভব হয়নি। শোভাও পেত না ব্যক্তিগত কথা আলোচনা করা।
কথা ঘোরাবার জন্যে কমলেশ বলল, "আপনি অত ভাবেন কেন! মেসোমশাই আছেন, এখানে যারা আছেন, চুনিমহারাজ, মধুসূদনবাবু, যারা এখানে আসে— সবাই আপনাকে কত শ্রদ্ধা করে। নিজের আত্মীয়ের মতন ভাবে। আর আপনি যদি আমাদের কথা ধরেন, আপনাকে আমি সত্যি বলছি মাসিমা, আপনার এই স্নেহ যত্ন না পেলে আমি এভাবে সুস্থ হতে পারতাম না।"
ইন্দিরা প্রথমে কথার জবাব দিলেন না। পরে টেনে টেনে বললেন, "তোমাদের মতন কেউ কেউ এসে পড়লে, ভাল লাগার মানুষ হলে, আমারও ভাল লাগে। দিনগুলো কেটে যায়। ...না, এবার আমি উঠি, সন্ধে হয়ে আসছে।" বলে অপেক্ষা করলেন অল্পক্ষণ, উঠে পড়লেন। তারপর হঠাৎ ভাঙাভাঙা সুর করে বললেন, "মোরি বাত সব বিধিহি বনাই প্রজা পাঁচ কত করহু সহাই..., বিধিই আমার সব করেছেন বাবা, অন্য পাঁচ জনে আর কী করবেন। তুলসীমহারাজই যে বলে গিয়েছেন, আর কী বলব।"
উনি ধীরে ধীরে বারান্দা দিয়ে ঘরে চলে গেলেন।
কমলেশের মন খারাপ হয়ে গেল। ভাল লাগছিল না আর উঠে পড়তে। অন্ধকারও হয়ে এল।

সন্ধেবেলায় প্রায় রোজকার মতন লালাসাহেব আর চুনিমহারাজ বসে কথাবার্তা বলছেন। মধুসূদনও হাজির হলেন। তিনি নিয়মিত আসতে পারেন না। এলে কিছুক্ষণ বসে গল্পগুজব করে যান।
কমলেশ নিজের ঘরেই ছিল। সাড়া পেয়ে এল, সামান্য দেরি করেই। সে ভেবে রেখেছিল, আজ লালাসাহেবকে বিকেলের কথাটা বলবে। উনি হয়তো জানবেন পরে, যদি ইন্দিরা মাসিমা বলেন, নয়তো জানবেন না।
ঘরে এসে কমলেশ দেখল চুনিমহারাজের কোনও কথা নিয়ে হালকা হাসি-তামাশা হচ্ছে।
কমলেশ এসে একপাশে বসল।
চুনিমহারাজ নিজেও হাসতে হাসতে বললেন, "আমার আর দোষ কোথায় বলুন! ভিক্ষের পাত্র পাঁচ টুকরো না হলে— নতুন পাত্র হাতে তুলবে না— এ তো স্বয়ং গৌতমবুদ্ধ তাঁর ভিক্ষুদের বলে গিয়েছেন। আমার কাঁসার থালাটা মাত্র দু টুকরো হয়েছে। ওতেই চালিয়ে যাচ্ছিলাম। কানাটা ভেঙেছে এক জায়গায়। লছমি সেটা হাত থেকে ফেলে তিন টুকরো করে ফেলল। বাসনমাজার সময়, কাকের সঙ্গে

ঝগড়া করলে ওইরকমই হয়। তা ওকে বললাম, বেটি ভাঙলি ভাঙলি, পাঁচ টুকরো করতে পারলি না!"

মধুসূদন হাসতে হাসতে বললেন, "চুনি, তুমি কি আজকাল বৌদ্ধ হয়ে গিয়েছ?" উনি চুনিমহারাজকে 'তুমি' বলেন। বয়সে সামান্য বড় হলেও সম্পর্কটা বন্ধুর মতন।

চুনিমহারাজ বললেন, "বৌদ্ধ হব কেন! যা পড়েছি বইয়ে তাই বলছি।"

" তুমি ভিক্ষুও নও।"

"আমি! আমার চেয়ে বড় ভিখিরি কে আছে? বলবে, আমি তো আর ভিক্ষে চেয়ে ঘুরে বেড়াই না। তা ঠিক। তবে অবস্থাটা ভিখিরির মতন।"

লালা বললেন, "আমার কাছে একজন কাজ করত। বুদ্ধিস্ট্। কই সে তো তোফা থাকত। তার কোনও কোড্ অফ্ কনডাক্ট ছিল না। অবশ্য সে বৌদ্ধ ভিক্ষুও ছিল না। ছোকরা কাজেকর্মে এফিশিয়েন্ট ছিল খুব। আবার তার কোয়ার্টারে রাজসিক আহারবিহার চলত।"

"ভোগ থেকেই ত্যাগ আসে", মধুসূদন বললেন, "কী বলো, চুনি?"

কমলেশ ওঁদের কথায় কান দিল না। লালার দিকে তাকাল। হঠাৎ বলল, "আজ আপনি বেরিয়ে যাবার পর মাসিমার শরীর খুব খারাপ হয়েছিল!"

তিন জনেই চুপ। কমলেশের দিকে তাকালেন।

"কী হয়েছিল?" লালাসাহেব বললেন।

কমলেশ বলল ঘটনাটা।

লালা প্রথমে কমলেশকে দেখলেন, যেন পুরো ঘটনাটা অনুমান করে কল্পনা করে নিলেন। তারপর একবার চুনিমহারাজের দিকে তাকালেন। বোধহয় তিনি চুনিমহারাজকে বোঝাতে চাইলেন, তাঁর সেদিনের কথায় যে আশঙ্কা প্রকাশ পাচ্ছিল— তা একেবারে বৃথা নয়।

"আমি দেখলাম, উনি শুয়ে আছেন", লালা বললেন, "জিগ্যেস করলাম কী হয়েছে? উনি বললেন, মাথা ভার হয়ে আছে। অন্য কথা বলেননি। তবে হ্যাঁ, ওর শরীর ভাল যাচ্ছে না, আমি তো দেখছি।"

মধুসূদন বললেন, "স্টেশনের শর্মাকে একবার।"

স্টেশনের কাছে শর্মা ডাক্তার বলে এক ভদ্রলোক আছেন। বৃদ্ধই প্রায়। একসময় সরকারি ডাক্তার ছিলেন। সেকালের মেডিক্যাল স্কুলে পড়া। রিটায়ার করেছেন অনেককাল। স্টেশনের কাছে তাঁর বাড়ি, বাড়ির সঙ্গে লাগোয়া এক খুপরি ডিসপেনসারি। নিজেই ডাক্তার, নিজেই কম্পাউন্ডার। দেহাতের গরিবগুর্বো মানুষ দায়ে পড়লে তাঁর কাছে যায়। ভদ্রলোক কানে শোনেন না, চোখেও যে ভাল দেখতে পান— তা শুধু নয়। ডাক্তারিতেও মন নেই, নেহাত জোর করে বসা। ওষুধপত্রও দু-পাঁচটার বেশি থাকে না; বাকি যা তা আয়ুর্বেদ-ওষুধের কয়েকটা শিশি— কম্পানির লোক দিয়ে গিয়েছে। শর্মা এমনিতে ভাল মানুষ, তবে ডাক্তারি ভুলে গিয়েছেন।

লালা মাথা নাড়লেন।

"একবার দেখানো দরকার," চুনিমহারাজ বললেন, "দিদিকে দেখলেই বোঝা যায়, খানিকটা ঝিমিয়ে পড়েছেন।"

লালা বললেন, "ভাল হয়ে যাবে। ওর এক একটা সময় আসে, ডিপ্রেসড্ হয়ে পড়ে; আবার ধীরে ধীরে কাটিয়ে ওঠে।"

"আজ বেশ শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল", কমলেশ বলল।

"অ্যাজমাটিক হয়ে পড়ছে আমি দেখেছি। তবে সেটা ঠিক কেন বলতে পারব না। মে-বি হার্ট কন্ডিশান গোলমাল করছে, বা মেন্টাল কন্ডিশান, অ্যাংজাইটি..."

"একবার কলকাতায় নিয়ে গিয়ে—" কমলেশ বলল, কথাটা শেষও করেনি।

"কলকাতা! কলকাতা কেন? না না, কলকাতা নয়। আমি ভেবে রেখেছি, আসছে মাসে আমাদের আর্মি হসপিটালে নিয়ে গিয়ে একবার দেখাব। ওটা আমাদের পক্ষে কাছে হবে, তা ছাড়া ওখানে আমাদের প্রিভিলেজ অনেক।"

কমলেশ আর্মি হসপিটাল সম্পর্কে কিছুই জানে না। তবে কথায় কথায় একদিন শুনেছিল, এখান থেকে রাঁচি যাবার পথে।

মধুসূদন বললেন, "সেটা ভালই হবে। আপনি একবার ঘুরেই আসুন। হাজার হোক আমাদের বয়স হচ্ছে। শরীরের কলকবজা কখন বিগড়োয়...

লালাসাহেব হেসে বললেন, "আপনার কি মনে হয়, এতদিনে বিগড়োয়নি? খেয়াল করলে বুঝতে পারতেন ভেতরে ভেতরে বিগড়ে যাচ্ছে।"

চুনিমহারাজ বললেন, "সেটা বোঝা যায় এক একদিন। তবে কী জানেন লালাবাবু, আমরা এখানে ফাঁকায় ভাল জায়গায়, দেদার আলো-বাতাসের মধ্যে পড়ে আছি, জলটাও ভাল, তাই কচু, ঢেঁড়স, পেঁপে আর ডাল-রুটি খেয়ে চালিয়ে গেলাম। ভেতরের ড্যামেজটা বুঝতে পারি না। শহরটহর হলে এত দিনে কাবু হয়ে পড়তাম।"

কমলেশ ঠাট্টা করে বলল, "শহরে প্রবীণ বয়স্ক মানুষরা বেঁচে থাকেন না?"

"ওরে বাব্বা! বল কী! অনেক থাকেন! আমার বন্ধু পাইনই আছে। তার মাসে ডাক্তার আর ওষুধ খরচ কত জান? নিজেই রসিকতা করে বলে, শরীর পুষছি, না, হাতি পুষছি।"

হেসে উঠলেন ওঁরা সকলেই।

কমলেশ তার বাবার কথা বলতে যাচ্ছিল, বলল না। বাবার বয়স কম হয়নি, চুনি মহারাজদের চেয়ে বড় বই ছোট হবেন না। তাঁরও আধিব্যাধি আছে। তবে নিয়মিত ওষুধ খাবার পয়সা নেই। বাবার কথা না তুলে কমলেশ শহরের কথাই তুলল। খানিকটা ক্ষুণ্ণ হয়েই। "শহর— মানে আমি কলকাতার কথাই বলছি। কলকাতা আপনাদের ভাল লাগে না? পছন্দ করেন না যেন!"

জবাবটা মধুসূদনই দিলেন, "আরে ভাই, আমরাও তো কলকাতার বাসিন্দে ছিলাম এককালে। তখন যেরকম ছিল এখন হয়তো তেমন নেই। তাই তো শুনি। পড়ি কাগজে। তা যার যেমন অভ্যেস, আমাদের এই বুনো জায়গাটা পছন্দ হয়ে গিয়েছে। অভ্যেস হয়ে গিয়েছে থাকতে থাকতে। কলকাতা আর ভাল লাগবে কেন? কোনও শহরেই লাগবে না। তুমিও কি এখানে পড়ে থাকতে পারবে আমাদের মতন! পারবে না। আজ আছ, কাল পালাবে।"

অস্বীকার করতে পারল না কমলেশ। তবু বলল, "এখানে অসুবিধেও তো অনেক। এই যে মাসিমার শরীর খারাপ— চট করে আপনারা কিছু করতে পারবেন?"

লালা কমলেশকে দেখলেন। মাথা নাড়লেন। "না, পারব না। তা তোমরাও কি সব সময় পার? কাগজে প্রায়ই পড়ি, অ্যাম্বুলেন্স ডেকে পেতে পেতে রোগী মরে যায়; হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে পেশেন্টকে মাটিতে ফেললে— ডাক্তার খুঁজতে খুঁজতে রোগী মেঝেতে পড়েই চক্ষু বুজল। ধর, ধরে কয়ে এর ওর হাতে টাকা গুঁজে একটু জায়গা হল বেড়ে। তারপর..."

"হাসপাতালে আমিও ছিলাম।"

"তুমি ভাগ্যবান। ...শোনো একটা চালু গল্প ছিল আমাদের আর্মিতে। ঝোপে গুলি চালালে সব পাখি মরে না, কয়েকটা মরে, বাকিরা উড়ে যায়, দু-একটা মর মর হয়ে পালায়। লাক্ ফেভারস্ দোজ হু ক্যান এস্কেপ...।"

"আপনারা কি তবে পালিয়ে এসেছেন?"

"এটা অন্য কথা হল! আমি এসেছিলাম চাকরি নিয়ে, ঘুরতে ঘুরতে এখানে, মধুসূদনবাবু এসেছিলেন অন্য কাজ নিয়ে, আর চুনিমহারাজ এসেছেন একটা সাধস্বপ্ন নিয়ে...। এর মধ্যে পালাবার কী আছে?"

মধুসূদন বললেন, "আপনারা ভাই নিজেদের ভাল লাগা জায়গায় থাকুন— কেউ বাধা দিচ্ছে না। আমাদেরও থাকতে দিন না এই বুনো জায়গায়, আপনার আটকাচ্ছে কোথায়?"

কমলেশ লজ্জা পেল। কোন কথা থেকে কোন কথায় চলে গেল সে। নিজেকে সামলে নিল সে। গলার স্বর নামিয়ে বলল, "না না, আমি তা বলিনি। ভুল হয়েছে বোঝার। আমি মাসিমার কথা বলছিলাম। আজ ওঁকে দেখে আমার খারাপ লাগছিল।"

লালাসাহেব মাথা নাড়লেন। "লাগবে বই কি।...তুমি ভেবো না। তোমার মাসিমাকে নিয়ে আজ চল্লিশ বছরেরও বেশি আছি। আমি জানি ওঁর শরীর মন কখন কেমন থাকে! গাছের ডাল ভাঙলে, ভাঙা দিকটা শুকিয়ে যায়, তুমি যদি তাকাও বুঝতে পারবে— জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গিয়েছে, কী যেন ছিল, আর নেই। ...তোমার মাসিমার এই ফাঁকা জায়গাটা আর তো ভরবে না। ...তবু আমাকে আর বুড়িকে বেঁচে থাকতে হবে। উই হ্যাভ আওয়ার লোন্‌লিনেস, সরো অ্যান্ড সাফারেন্স। কিন্তু তা নিয়ে রোজ কি কেঁদে ককিয়ে লোক জড়ো করব! না, কখনওই নয়। তুমি বাইবেল পড়েছ? পড়নি। সময় পেলে পড়ো।"

কেউ আর কথা বলল না। স্তব্ধভাব। ঘরের আলো কেমন ম্লান হয়ে আসছিল। শেষে মধুসূদন বললেন, "কমলেশবাবু, আমরা আছি। যা করার ভাববার আমরা নিশ্চয় ভাবব। আপনি চিন্তা করবেন না।"

কমলেশ কিছু বলল না আর।

চুনিমহারাজ মধুসূদনকে বললেন, "উঠবে নাকি?"

"উঠব! তা উঠলেই হয়। রাত হচ্ছে।"

মধুসূদনরা উঠে পড়লেন। লালাসাহেবও। দরজা খুলবেন, বারান্দা পর্যন্ত এগিয়ে দেবেন মধুসূদনদের। এটাই তাঁর সৌজন্য। আজও তার ব্যতিক্রম হল না।

তেরো

পাইন বাড়ির সামনেই চুনিমহারাজ কমলেশকে ধরলেন।

"এদিকে কোথায়? দোকানে?"

কমলেশ হাসল। "দুটো জিনিস দরকার ছিল। আপনি— ? যাচ্ছেন কোথাও?"

চুনিমহারাজকে উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। এমন হাসিখুশি চঞ্চল তাঁকে বড় একটা দেখা যায় না। এমনতেই যদিও তিনি গম্ভীর স্বল্পবাক মানুষ নন, বরং খুশি মনেই থাকেন সাধারণত— তবু আজ তাঁকে যেন তৃপ্ত দেখাচ্ছিল।

"বাড়ি ফিরবে তো?"

"হ্যাঁ।"

"চলো।"

চুনিমহারাজ পা বাড়ালেন।

কমলেশ ঠিক ধরতে পারল না ব্যাপারটা। সকালের দিকে চুনিমহারাজকে ওবাড়িতে কদাচিৎ দেখেছে সে। খুবই কম। বিকেলে অবশ্য তিনি প্রায় নিয়মিতই যান। আজ হঠাৎ কী হল!

হাঁটতে হাঁটতে চুনিমহারাজ বললেন, "কমলেশ, ধৈর্য আর অপেক্ষা একেবারে বৃথা যায় না, ভাই!"

কিছুই বুঝল না কমলেশ। চুনিমহারাজকে দেখল কয়েক পলক, তারপর সামনে এপাশ ওপাশে তাকাল। গাছগাছালির তলায় শুকনো পাতা এখন আর ততটা স্তূপ হয়ে নেই, হাওয়ায় হাওয়ায় উড়ে গিয়েছে; গাছের শীর্ণ ডালে নতুন পাতা, সবুজ, কচি, রোদ পড়েছে। রোদ উজ্জ্বল। কোথাও কুয়াশা নেই। বুনো ঝোপে অজানা অচেনা ছোট ছোট ফুল, লালচে-হলুদ রং। দু-পাঁচ হাত অন্তর পলাশের ছোট ছোট ঝোপ, চারার মতন, পাতাগুলো কোথাও শুকনো কোথাও কচি। এগুলো যে সদ্য জায়গা জুড়েছে মাটিতে, আসল জঙ্গল তো খানিকটা দূরে। তবু ছোট গাছেও কোথাও কোথাও ফুল আসে।

ফাল্গুন পড়ে গিয়েছে। সুমতির চিঠি পেয়েছে কমলেশ পরশু, তাতেই জানতে পারল, ফাল্গুনমাস পড়ে গেল।

চুনিমহারাজ নিজেই বললেন, "একটা খবর দেব লালাবাবুকে। আমার তর সইছে না।"

"ভাল খবর নিশ্চয়।"

"ভাল বলেই তো ছুটছি। ...ইয়ে দিদি ঠিক আছেন তো?"

"হ্যাঁ, মাসিমা ভালই রয়েছেন।"

"তা হলেই হল। ক'দিন খানিকটা দুশ্চিন্তায় ফেলেছিলেন। সামলে নিয়েছেন বলো!"

কমলেশ মাথা হেলিয়ে বলল, "নিয়েছেন অনেকটা। আপনি নিজেই তো

দেখছেন।"

কথাটা মোটামুটি ঠিক। ইন্দিরা যেভাবে ভেঙে যাচ্ছিলেন তা যেন রোধ হয়েছে। এখন তিনি অনেকটাই সামলে নিয়েছেন। আগের মতন সজীব তৎপর হয়ে উঠতে না পারলেও মাসিমা আবার নিজের কাজেকর্মে হাত দিতে পারছেন।

"আপনার ভাল খবরটা কী?" কমলেশ বলল।

"চলো, বলব।"

লালাসাহেব বারান্দাতেই বসে ছিলেন।

কাগজ দেখছিলেন। দিন দুয়েকের বাসি কাগজ। গেট খোলার শব্দে তাকালেন। কমলেশ আর চুনিমহারাজ।

কমলেশরা কাছে এল।

"আরে চুনিমহারাজ! দুজনে একসঙ্গে। আবার কী হল?"

চুনিমহারাজ বসবার আগেই জামার পকেটে হাত দিলেন; তারপর খামসমেত একটা চিঠি বার করে লালাসাহেবের দিকে এগিয়ে দিলেন। "পড়ুন।"

লালা চিঠি নিলেন।

চুনিমহারাজ নিজে বসলেন, কমলেশকেও বসতে ইশারা করলেন।

চিঠি পড়া হয়ে গেল লালার। একবার পড়ার পর, আবার একবার আলগা চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর তাকালেন চুনিমহারাজের দিকে। খুশি হয়ে বললেন, "এ তো বিরাট সুখবর, মহারাজ। কুড়ি হাজার টাকা এখনই হাতে পাচ্ছেন, কাজ এগোলে আরও তিন হাজার।"

চুনিমহারাজ বললেন, "কাল বাড়ি ফিরে গিয়ে দেখি— হরিবাবুর দোকানে কে চিঠিটা পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল। ও আবার বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে। ডাকের চিঠি।"

কমলেশ বলল, "কীসের কুড়ি হাজার?" সে কিছুই বুঝতে পারছিল না।

চুনিমহারাজ বললেন, "দোরে দোরে হাত পাতার মতন কত জায়গায় চিঠি লিখেছি। চিঠির পর চিঠি। রিমাইন্ডার। কেউ জবাব দেয়, কেউ দেয় না। শাস্ত্রী— মানে ওই বিরজানন্দ ভরসা দিয়েও চুপ করে গেলেন। এরাই শুধু তিন-চারটে চিঠির জবাবে তাদের যা জানা দরকার—জেনে খোঁজখবর নিয়ে শেষে কুড়ি হাজার টাকা আপাতত দিতে রাজি হয়েছে।"

"এরা কারা?"

"ওয়েল ফেয়ার সোসাইটি ফর অরফান চিলড্রেন। এম. পি-তে ওদের সদর দফতর। বেসরকারি। ইউনিসেফ—মানে ইউনাইটেড নেশনস ইন্টারন্যাশনাল চিলড্রেনস ফান্ড থেকে কন্ট্রিবিউশান পায় কিছু, বাকিটা আসে অন্য পাঁচ তহবিল থেকে।"

কমলেশ বুঝতে পারল। চুনিমহারাজের সাধ-আকাঙ্ক্ষা মিটবে তবে!

লালা চিঠিটা ফেরত দিতে দিতে বললেন, "এই টাকায় আপনার কতটা কাজ হবে?"

"ক-তটা! আপনিই বলুন।"

"আমি?"

"আপনি এঞ্জিনিয়ার মানুষ...! আমার হিসেব যদি ধরেন, আমি গোড়াতে একটা একচালা ব্যারাক মতন করতে চাই। মাথার ছাদ খাপরার। ইটের দেওয়াল। সিমেন্টের মেঝে। পঁচিশ-তিরিশটা ছেলে থাকবে। হবে না?"

লালা হাসলেন, "আমার কি আর হিসেব আছে, মহারাজ! খাতা পেনসিল নিয়ে বসতে হবে। এখানে কাঠের খরচ কম। ইট আপনাকে ভাটি বসিয়ে তৈরি করে নিতে হবে। লেবার কত পড়বে..।! থাক গে, সে পরে হিসেব করা যাবে বসে বসে। আপনি খুশি হয়েছেন আমি আপনাকে কনগ্রাচুলেট করছি।"

"আপনাকে আমি বলতাম না, ভাল কাজে ঈশ্বর সহায় হন।"

"আপনার ঈশ্বর শুধু ভাল কাজে সহায় হলে জগৎটা পালটে যেত।" লালা বললেন, "তিনি আবার যে মন্দ কাজেও সহায় হন।"

চুনিমহারাজ থতমত খেয়ে গেলেন। "মানে?"

লালাসাহেব হাতের কাগজটা দেখালেন। "ঈশ্বর সহায় হলে সতেরোটা লোক বেঁচে যেত।"

"কেন কী হয়েছে?"

হাতের কাগজটা ভাঁজ করে এগিয়ে একটা জায়গা দেখালেন, কাগজটা দিলেন লালা। "পড়ুন।"

চুনিমহারাজ পড়লেন খবরটা। কপাল কুঁচকে গেল। বিস্মিত ও আহত হলেন। বললেন, "ট্রেনের কামরার মধ্যে এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে এতগুলো লোককে মেরে ফেলল। কামরাই বা অন্ধকার হল কেমন করে! ডাকাত...!"

লালা বললেন, "সতেরোটাই হয়তো মরবে না, দু-পাঁচজন হাত-কাটা পা-কাটা হয়ে বেঁচে যাবে। কথা হল, আপনার ঈশ্বর সহায় হলে ট্রেনটা আর মিনিট তিনেক পরে স্টেশনে পৌঁছে যেত। তখন ওভাবে গুলি চালানো যেত না। আর কামরা অন্ধকারের কথা বলছেন, ওটা তো ওরাই করেছে।"

চুনিমহারাজের হাত থেকে কাগজটা চেয়ে নিল কমলেশ। খবরটা পড়তে লাগল।

"মানুষ আজকাল যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে, তাই না লালাবাবু? দয়ামায়া, মনুষ্যত্ব, বোধবুদ্ধি হারিয়ে ফেলছে। আমরা এমন হিংস্র হয়ে যাচ্ছি কেন? আপনি নিশ্চয় দেখেছেন, আজকাল মন্দ খবর এত চোখে পড়ে, কানে শুনতে হয় যে—মনটাই বিগড়ে যায়।"

লালা ঠাট্টা করে বললেন, "মহারাজ, মন বস্তুটাকে এখন সাবধানে সরিয়ে রাখুন। পারলে ভাল, না-পারলে ভুগতে হবে।"

কমলেশের খবর পড়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। বলল, "ট্রেনে গোটা চারেক গুন্ডা বদমাশ ডাকাত টাইপের লোক উঠেছিল, লুঠপাট ডাকাতির মতলব নিয়ে। ওরা পাকা ক্রিমিন্যাল, যা করেছে প্ল্যান মতনই করেছে। তবে খবর পড়ে মনে হল, ওরা লুঠপাট শুরু করার পর দু চারজন রুখে উঠতেই, লোকগুলো খেপে গিয়ে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে। আলো নিভিয়ে দেয়। ওরাও বোধহয় ভয় পেয়ে গিয়েছিল।"

"তুমি কী মনে কর?" লালাসাহেব বললেন, "দুটো লোক হাতে পিস্তল, আর অন্য

দুটো লোক ভোজালি হাতে উঠে দাঁড়িয়ে ট্রেনের কামরায় একটা হরিনামের ঝোলা দেখিয়ে বলবে, যা আছে দিয়ে দাও, নয়তো খুন হয়ে যাবে। আর ওটা বলার পর প্যাসেঞ্জারদের উচিত ছিল—ঝটপট সব দিয়ে দেওয়া।"

"আমি তা বলিনি। আমি বলছিলাম, প্যাসেঞ্জাররা নিরস্ত্র অসহায় ছিল।"

"তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু মানুষের স্বভাব হল, জুলুম দেখলে প্রতিবাদ করে। অতশত ভেবে দেখে না, তার কী আছে আর নেই। কেউ কেউ মুখ বুজে থাকতে পারে ভয়ে ; কেউ বা রুখে ওঠে।"

কাগজটা ফেরত দিয়ে দিল কমলেশ। আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আজকাল এইসব ক্রিমিন্যাল কাণ্ডকারখানা এত বেশি হয়। আমরা প্রায়ই দেখি..."

"তোমরাই শুধু দেখবে কেন! কলকাতায় হয়, অন্য জায়গায় হয় না? সারা দেশেই হয়। দিল্লিতে হয় না, লখনউয়ে হয় না, পটনায় হয় না? না তুমি ভাবছ হায়দরাবাদে বাঙ্গালোরে হয় না! উনিশ-বিশ তফাত বড়জোর।"

চুনিমহারাজ বললেন, "দেশটা একেবারে তলিয়ে যাচ্ছে।"

"অত বড় কথা বলতে পারব না।" লালা বললেন, "আমরা হলাম আদার ব্যাপারী জাহাজের খোঁজ রাখি না। তবে এই সিস্টেম বড় অদ্ভুত। যারা চালায় তারা এই জাতের, অন্তত শতকরা পঁচানব্বই জন ; আর আমরা যারা চলি তারা ভেড়ার পালের মতন চলি।"

কমলেশ হঠাৎ বলল, "আপনি আমাদের এই সিস্টেম পছন্দ করেন না?"

লালা হাসলেন। "আমার কথা বাদ দাও! আমি ওল্ড ফুল...! দিন পার করে দিলাম। কী বলেন চুনিমহারাজ?"

কমলেশ তবু বলল, "দিনের কথা বাদ দিন। আপনি একটা কিছু তো নিশ্চয় ভাবেন। কোনও বিশ্বাস—!"

"কী মুশকিল! বিশ্বাস কি একটাতেই আটকে থাকে। অনেক রকম বিশ্বাস আছে। ধর্মবিশ্বাস, ঈশ্বর বিশ্বাস, মানুষে বিশ্বাস, স্বার্থহীনতায় বিশ্বাস, ভালবাসায় বিশ্বাস... আরও কত। তুমি শুধু পলিটিক্যাল বিশ্বাসের কথা তুলছ কেন?"

চুনিমহারাজ কমলেশকে বললেন, "লালাবাবু পলিটিক্স নিয়ে মাথা ঘামান না, ভাই। আমরা এখানে নিজের নিজের মতন আছি। বৃহৎ ব্যাপারে নাক গলাই না।"

লালাসাহেব মজা করে বললেন, "কমলেশ, আমি রাজনীতির লোক নই। মনেও করি না, তাতে আমার ক্ষতি হয়েছে। আই ডোন্ট বিলিভ ইন পলিটিক্যাল পার্টিজ। পার্টিলেস ডেমোক্রেসি বলে কিছু থাকলে আমাকে তার—কী বলে—পতাকাতলে ডাকতে পার।"

লালাসাহেব হোহো করে হেসে উঠলেন। চুনিমহারাজও।

কমলেশও হালকা গলায় হাসল।

চুনিমহারাজ নিজের কথায় ফিরে এলেন। লালাবাবুকে বললেন, "আমার কথাটা বলুন।"

"কী বলব?"

"কুড়ি হাজার টাকায় কাজ শুরু করা যেতে পারে, কি বলুন? কাজ খানিকটা

এগোলে ওদের ওখান থেকে লোক আসবে দেখতে। সন্তুষ্ট হলে আরও তিন হাজার টাকা পাব। তারপর মাসে মাসে এক হাজার। ওদের ডোনেশান।"

"ভাল। আপনার একটা ভরসা হল।"

"আমি আরও চেষ্টা করছি। তবে মনে হয়, একবার খাড়া করতে পারলে তখন লোককে বলবার দেখাবার মতন কিছু থাকবে। এতদিন কিছুই ছিল না।"

"শুরু করে দিন। আমরা তো রয়েছি।"

"লালাবাবু, আমার মাথায় যা আছে—আপনাকে বলেছি। ট্রাইবাল অনাথ ছেলে আমি পেয়ে যাব। বিশ-পঁচিশটা ছেলে হলেও তাদের থাকা, দু বেলা পেট ভরার ব্যবস্থা হয়তো হয়ে যাবে কষ্টেসৃষ্টে। কিন্তু হাঁসমুরগির মতন তাদের রেখে দিলেই তো হবে না। খানিকটা মানুষ করতে হবে। একটু-আধটু পড়াশোনা, হাতের কাজ শেখানো, মানে একটা কনফিডেন্স এনে দিলে ওরা পারে, কিছু একটা পারবে। এখন ঝামেলা হবে—আমি লোক পাব কোথায়! একা তো পারব না। দু-একজন লোক পাব কোথায়?"

লালা বললেন, "আগে গোড়াটা হোক—পরের চিন্তা পরে।"

"পাইনকে এখনই জানাতে চাই না। পরে জানাব।"

"এখন জানাবার দরকার কী! আপনি আগে টাকা পান, কাজ শুরু করুন, তখন জানাবেন।"

কমলেশ উঠে পড়ল।

চুনিমহারাজ কমলেশকে বললেন, "বুঝলে ভাই, ভবিষ্যতে কী হবে আমি জানি না। কিন্তু আজ আমি সত্যিই বড় সুখী মানুষ।"

কমলেশ হাসিমুখে মাথা নাড়ল। সে বুঝতে পারছে।

চোদ্দো

অল্পক্ষণ কোনও কিছুই বুঝতে পারল না কমলেশ।

চেতনা থাকলেও তা এত ঘোলাটে, বোধ ও অনুভূতি এমন অস্পষ্ট যে কী হয়েছে, সে কোথায় তা অনুমান করতেও পারছিল না। নিঃসাড়।

ক্রমশ তার চেতনা ফিরে আসছিল। যেন আচমকা অপ্রত্যাশিত ঘটনার আঘাত সে অনুভব করতে শুরু করল।

আর তখনই কমলেশ প্রথম অনুভব করল, তার ঘাড়ে অসহ্য ব্যথা করছে। ঘাড়ের পর সে ডান হাতের তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করল। দেখার চেষ্টা করার আগেই বুঝল, পায়েও ভীষণ লেগেছে, জোর জখম, পা নাড়াতে পারছে না। চোখে চশমা নেই।

যন্ত্রণা অনুভব করার পর কমলেশের হুঁশ হল, তার হাত কেটে রক্ত পড়ছে, কপালে জখম, হাত নড়ানো যাচ্ছে না, পা শুকনো কুলকাঁটা আর ভাঙা ডালে আটকে গিয়েছে, হাঁটুর কাছেও রক্ত, মানে ভিজে উঠেছে, প্যান্ট ভেজা ভেজা!

কী হল?

কমলেশ ওপরে তাকাল। রোদ, আলো চোখে পড়ছিল।

হঠাৎ তার পেটের কথা মনে পড়ল। পড়তেই ভয় পেয়ে গেল। প্রথমে বিন্দুমাত্র নড়াচড়া করল না। ব্যথা করছে নাকি? চোট পেয়েছে? পরে সন্তর্পণে পেটের মাংসপেশি একবার শক্ত অন্যবার শিথিল করল। মনে হল, পেটে সেরকম ব্যথা অনুভব করছে না। সামান্য নিশ্চিন্ত বোধ করল, নিশ্বাস ফেলল বড় করে।

আবার ওপরে তাকাল কমলেশ। চশমা না থাকায় সামান্য অস্পষ্ট।

এবার তার মাথা আর ঘোলাটে লাগছিল না। সে বুঝতে পারছিল কী ঘটে গিয়েছে। তাকাল এপাশ ওপাশ। সাইকেলটা দেখতে পেল। ঢালুর একপাশে একটা ঝোপের পাশে এঁকেবেঁকে পড়ে আছে। হ্যান্ডেল আর সামনের চাকা পুরোপুরি মুখ ঘুরিয়ে অদ্ভুতভাবে ঝোপের ডালপালার সঙ্গে জড়ানো।

কমলেশ এতক্ষণে অনুমান করে ফেলেছে কী হয়েছিল।

আজ সকালে তার ঘুম ভেঙেছিল আগেই। সুস্থ, স্বাভাবিক। বরং চমৎকার লাগছিল। একেবারে ঝরঝরে। মুখ ধুতে বাইরে এসে দেখল, সূর্য উঠে গিয়েছে। রোদ নরম, গা ভাসিয়ে নেমে পড়েছে মাঠে। কুয়াশা নেই। ফাল্গুনের কেমন-এক বাতাস দোল দিচ্ছে কলাগাছের পাতায়। ইঁদারায় জল তোলা হচ্ছিল। জল উঠছে, কিছুটা জল ছড়ছড় করে পড়ে যাচ্ছে লোহার বালতির দোলানে। ইঁদারার সামনেই কলাগাছ আর পেঁপে গাছ। কচি পাতায় রোদ চকচক করছে।

বাঃ! বিউটিফুল। আজ এখন ঠিক কটা বাজল—কমলেশ জানে না। ঘড়ি দেখেনি। তবে অনুমান করে নিচ্ছে, আগামীকাল এইসময় সুমতির ট্রেন স্টেশনে পৌঁছে যাবার কথা। যদি অবশ্য গাড়ি ঠিকঠাক আসে, 'পথে হল দেরি' না করে।

আগামীকাল সুমতি আসবে। পরশুদিন তারা এখানে আছে। পরের দিন আর নেই। চলে যাবে। সুমতি তাকে নিয়ে যেতে আসছে। কমলেশ বলেছিল, সে একলাই ফিরে যেতে পারবে। সুমতি রাজি হয়নি। সে আসবে, কমলেশকে নিয়ে যাওয়া ছাড়াও তার একটা কর্তব্য ও কৃতজ্ঞতাবোধ আছে মাসিমাদের জন্যে। মধুবাবুর কাছে। জানিয়ে যাবে।

ভাল কথা। আসুক সুমতি। হাত ধরে রেখে যেতে এসেছিল, হাত ধরেই নিয়ে যাবে সে। ব্যাপারটা বেশ। ফাইন।

মনের আনন্দে কমলেশ বার কয়েক শিস দিয়ে উঠল। সে এই জিনিসটা ভাল পারে না। শব্দটা কেমন জড়িয়ে যায়, স্পষ্ট ও জোর হয় না।

জামা প্যান্ট পরে, হাফহাতা সোয়েটার গায়ে চাপিয়ে চা খেল কমলেশ।

বাগানে এসে দেখল পলুয়া ফটক খুলে ঢুকছে। সঙ্গে সাইকেল। কোথাও হয়তো গিয়েছিল সাতসকালে। কাছেই, ফিরে আসছে।

কমলেশের কী যে হল, সাইকেলটা চেয়ে নিল।

কাঁহা যাবি বাবু?

কোথাও নয়, একটু ঘুরব।

বারান্দায় তখন কেউ নেই। লালাসাহেব তাঁর নিত্যকার মতন সকালের হাঁটাচলা সারতে বেরিয়েছেন। মাসিমা বাড়ির ভেতরে।

সাইকেল নিয়ে কমলেশ বেরিয়ে পড়ল।

কমলেশের বিশেষ কোনও লোভ নেই সাইকেলে। ছেলেবেলায় রথীনদার সাইকেল নিয়ে মাঝে মাঝে চাপত। শখ করে। বড় হয়ে কখনও সখনও হয়তো চেপেছে। তবে সেটা জরুরি দরকারে হয়তো। সাইকেল নিয়ে পাগলামি করার ইচ্ছে তার কখনও হয়নি। চিত্ত যেমন পাগলামি করত। হাওয়ায় উড়ত, ট্রাম বাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটত।

ফটকের বাইরে এসে কমলেশ চাপল।

কোথায় যাবে!

আ, কোথায় আবার কী! এনি হোয়ার! আমি কতটা ফিট্, কতটা শক্তি সঞ্চয় করেছি, শরীর কেমন তরতাজা ঝরঝরে হয়েছে—একবার তুমি দেখে যাও। সুমি! আরে বাব্বা, আমি জানি তুমি নেই, দেখতেও আসছ না, তবু মনে মনে ধরে নিচ্ছি তুমি আছ! আরে, ছেলেমানুষ আমি নই। এ একরকম মজা, নিজের কন্‌ফিডেন্স গেইন করা। তোমায় কাল গল্পটা শুনিয়ে দেব!

কমলেশ বিশেষ করে ভাবল না কিছুই, স্টেশনের রাস্তাটাই ধরল। না সে স্টেশনে যাবে না। মাইলটাক যাবে। রাস্তাটা বড় ভাল। পায়ে চলা পথ। দুপাশে বড় বড় গাছ, শিরীষ, নিম, অর্জুন, কাঁঠাল। এক-আধটি শিমুলও আছে। আরও কতরকম জঙ্গল গাছ। ছায়া, গাছের ডালপাতার ফাঁকে ফাঁকে রোদ এসে পথে ঝিলিমিলি কেটে দিচ্ছে।

গান গায় না কমলেশ। তবে দু-পাঁচটি গানের পাঁচ-সাত লাইন গাইতে অসুবিধে কোথায়? সবাই পারে।

চনমনে, খুশি মন-মেজাজ নিয়ে কমলেশ সাইকেল নিয়ে এগিয়ে চলল। পাইন লজ, বুনো বাবলা ঝোপের পাশ কাটিয়ে একটা চড়াই উঠে স্টেশনের রাস্তা ধরল। ফুরফুরে হাওয়া, সবে না ফাল্গুন এল। কমলেশ হঠাৎ গান গেয়ে উঠল : এই উদাসী হাওয়ার... ; কয়েক চরণ গেয়েই থেমে গেল। হচ্ছে না। সুর একেবারে বেসুরো হয়ে যাচ্ছে। থেমে গিয়ে অন্য গান ভাবতে লাগল।

জোরে নয়, মাঝারি গতিতেই এগিয়ে যাচ্ছিল কমলেশ। পাহাড়তলি এসে গিয়েছে। সরু পথের কোথাও কোথাও ডাইনে খাদ। নীচে জঙ্গল। বাঁয়ে বালিয়াড়ি ধরনের ছোট টিলা পাহাড় গাছগাছালি। গাছের পাতা কাঁপিয়ে বকের একটা ঝাঁক উড়ে গেল। ছায়া, পথে পাতা ঝরেছে কত। হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে খসখস করে, কমলেশ আবার গান গেয়ে উঠল, 'কেন যামিনী না যেতে জাগালে না...', আবার চুপ। ধুর শালা, এই ঝরঝরে আলোয় আবার যামিনী কেন! কমলেশ নিজের মনেই হেসে উঠল, শব্দ করেই। আর তারপর, চক্ষুর পলকে কী হয়ে গেল। কিছু বোঝবার আগেই সাইকেলের সামনের চাকা একেবারে পাক মেরে গিয়ে রাস্তার ঢালের দিকে গড়িয়ে চলল। একটা ঝাঁকুনি খেয়েছিল কমলেশ। তাতেই বুঝতে পারল, সাইকেলের সামনের চাকার তলায় পাথরের টুকরো পড়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে চাকা ঘুরে গিয়েছে, বা স্কিড্ করছে, পিছলে গিয়ে বেসামাল হয়ে গিয়েছে হ্যান্ডেল। কমলেশ ব্রেক দিয়েছিল, কিন্তু তার আগেই সাইকেল রাস্তার পাশে ঢালুতে বা খাদে গিয়ে পড়েছে, আর আশ্চর্য ব্রেকও কাজ করল না। গ্রিপ খুলে গিয়েছিল অথবা ভেঙে

গিয়েছিল। একেবারে আলগাও হয়ে যেতে পারে। সাইকেল সমেত গড়াতে গড়াতে খাদের মুখে খানিকটা নেমে আসার পর কমলেশ টাল খেতে খেতে সাইকেলের হ্যান্ডেল ছেড়ে দিল। সে নিজেই দিক কিংবা তার হাতছাড়া হয়ে যাক। সাইকেল গড়িয়ে গেল একপাশে আর কমলেশ গড়াতে গড়াতে অন্য পাশে। খাদটা রীতিমতো ঢালু, ঘাসে পাথরে ঝোপের লতাপাতা কাঁটায় ভরা। রগড়াতে রগড়াতে শেষে কমলেশ আটকে গেল কুলকাঁটার স্তূপে। মানে ভাঙা ডাল আর কাঁটার ঝোপে। হাত চার-পাঁচ তফাতে পড়লে আরও খানিকটা নীচে, একেবারে পাথরের ওপরে গিয়ে পড়তে হত।

চেতনা ও বোধ ফেরার পর কমলেশ প্রথমে হাত ও পরে পায়ের কথা ভাবল। হাত কি ভেঙে গিয়েছে? যন্ত্রণা ভীষণ। ডান হাতের তালু কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে। ওই অবস্থায় হাত নাড়ল সে। নাড়াতে পারল। তা হলে ভাঙেনি। যদিও কবজির কাছে টনটন করছে, যন্ত্রণাও ভীষণ। পা টানল, সামনের দিকে। টানতে কষ্ট হল, তবে পারল। গোড়ালি ভেঙে গেল নাকি, অথবা পায়ের তলার হাড়! কমলেশ বুঝতে পারছিল না। তার পক্ষে বসা অসম্ভব। কোমর যেন টুকরো হয়ে গিয়েছে।

কাতর চোখে, অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে সে ওপরে তাকাল। অনেকটা গড়িয়ে নীচে নেমে এসে পড়েছে কমলেশ। খাদের ঢালটা নয় নয় করেও পঞ্চাশ-ষাট ফিট হবে। মানে তিন-চার তলা বাড়ির সমান। এতটা খাড়াই উঠতে পারলে তবে সেই পায়ে চলা সরু পথ। কমলেশ কেমন করে উঠবে? অসম্ভব। সে দাঁড়াতেই পারছে না। হামাগুড়ি দিয়েও অতটা উঁচুতে ওঠা যায় না। অন্তত এই অবস্থায়।

উদ্‌বেগ আশঙ্কায় ত্রস্ত হয়ে, খানিকটা হতাশ হয়েও সে মাথার ওপর তাকাল। এত জংলা গাছপালা। তার ওপর বিশাল অশ্বত্থ, পিপুল। পাতার ফাঁক দিয়ে রোদ আসছিল ছেঁড়াখোঁড়াভাবে। কোথাও কোথাও আলো-মাখানো আবছায়া। বুনো গন্ধ উঠছে। আর আচমকা নজরে পড়ল একটা মস্ত চিল প্রায় তার মাথার ওপর পাক খেয়ে খেয়ে উড়তে শুরু করেছে। কোথা থেকে এল চিলটা! ও কি ভাবছে, কমলেশ মরে গিয়ে পড়ে আছে? চিল কি মরা মানুষের কাছে আসে? শকুনি হলে হয়তো...।

কমলেশ আশপাশে তাকাল। সাপখোপ দেখতে পেল না। তবে বড় বড় পিঁপড়ে, পোকা দেখতে পেল।

চিলটা উড়ছে।

রাস্তার দিকে তাকাল কমলেশ। এ-পথে লোকজন সবসময় যায় না। হাঁক দিলেই কাউকে পাওয়াও সহজ নয়। অথচ কতক্ষণ সে পড়ে থাকবে এখানে। বেলা বেশি হলে হয়তো লালাসাহেবই পলুয়াকে খোঁজ করতে পাঠাবেন। কী হল ছেলেটার?

যন্ত্রণার সঙ্গে সংকোচ কমলেশকে আরও বিব্রত করে তুলছিল। কী দরকার ছিল তার পলুয়ার কাছ থেকে সাইকেল চেয়ে নিয়ে বাহাদুরি করার! ছি ছি! কালই আবার সুমতি আসছে! এসে যদি দেখে...।

কমলেশ কান খাড়া করে পায়ের শব্দ শোনার চেষ্টা করছিল। যদি কেউ এই পথ ধরে যায়, ডাকবে। ডাকবে তাকে সাহায্য করার জন্যে। কেউ যদি এগিয়ে এসে তার হাত ধরে টেনে তোলে হয়তো সে উঠে দাঁড়াতে পারবে।

পা নাড়াচাড়া করার পর একসময় কমলেশ বুঝল, না—তার পা অন্তত ভেঙে টুকরো হয়নি। গোড়ালি মচকে যেতে পারে, পায়ের আঙুল ভাঙতে বা হাড়ে চিড় ধরতে পারে— তবে না, ভাঙেনি। মনে তো তাই হচ্ছে।

কোমরের যন্ত্রণা সহ্য করে কমলেশ এবার পিঠ সোজা করে বসল।

ওটা কী? আঁতকে উঠল সে! সাপ নয়, এখন সাপ আসবে কেমন করে? শীত ফুরিয়ে গেলেও তার রেশ আছে। নেউল হতে পারে। পাতার আড়ালে পালিয়ে গেল।

কান খাড়া হয়ে গেল হঠাৎ। ওপরে শব্দ শোনা যাচ্ছে। কে যেন যাচ্ছে। কাশির শব্দ।

কমলেশ হাঁক দিয়ে ডাকল, এ ভাই! এ ভাই, থোড়া ইধার...।

ডাক শুনে একটা লোক সত্যিই খাদের কাছে নীচে তাকাল।

"এ ভাই—!"

লোকটা অবাক। এক বাবুলোক পড়ে আছে নীচে। অন্যপাশে এক সাইকেল, চাকা উলটে গিয়েছে।

আবার ডাকল কমলেশ।

লোকটা সাবধানে পা ফেলে, নিজেকে সামলে নীচে নেমে এল।

দেখল কমলেশ। আধবুড়ো মানুষ। খাটো ময়লা ধুতি পরনে, গায়ে রং-ওঠা জামা, কাঁধে বুকে মামুলি সুতির চাদর, মোটা, চৌকো ছাপ-ধরানো। লোকটার মাথার চুল কাঁচাপাকা, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চোখদুটি গর্তে ঢোকা। তার হাতে একটা কাঠের ছোট বাক্স। পায়ে রবারের চটি।

"কা হুয়া বাবুজি?"

কমলেশ বলল, সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে তার এই অবস্থা।

"হায় রাম," বলে লোকটা মাটিতে উবু হয়ে বসল। হাত পা মুখ দেখল কমলেশের। রক্ত জমে শুকিয়ে এসেছে। হাত ফুলে যাচ্ছে। "গোড় টুট গেইল কি।"

কমলেশ বলল, না, সে দাঁড়াতে পারবে মনে হচ্ছে। তাকে ধরতে হবে।

"তো খাড়া হো যা..." বলে লোকটা নিজে উঠে দাঁড়িয়ে কমলেশের হাত ধরল। টানল তার সাধ্যমতো শক্তি দিয়ে।

কমলেশ কোনওরকমে উঠে দাঁড়াল। পায়ে ঠিকমতন ভর দিতে পারছিল না, যন্ত্রণা হচ্ছিল।

"এবার, কাঁধ পাকাড় লে, হেল যাবি না।" কমলেশকে তার কাঁধ ধরতে বলে সে ধীরে ধীরে উঠতে লাগল।

কমলেশ বুড়োর কাঁধে ভর দিয়ে কোনওরকমে পা টানতে টানতে উঠতে লাগল। সাইকেলের দিকে তাকাল একবার। হ্যান্ডেল বেঁকে গিয়েছে, সামনের চাকাও একপাশে তুবড়ে রয়েছে। চশমাটাও কাছাকাছি ছিটকে পড়ে আছে। কমলেশের কথায় চশমা কুড়িয়ে এনে দিল বুড়ো। ভাঙেনি।

লোকটার কষ্টই হচ্ছিল। জোয়ান একটা লোকের দেহের ভার সামলে খাড়াই ওঠা সোজা কথা নয়। তার দম নিতে কষ্ট হচ্ছিল। তবু সে প্রাণপণ চেষ্টায় কমলেশকে

ওপরে তুলে আনল।

রাস্তায় উঠে দম নিল দুজনে। ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ।

কমলেশ তার হাত দেখছিল। কবজির কাছে ফুলে গিয়েছে। জামার হাতার তলার দিকটা রক্তে মাখামাখি। পা মাটিতে নামিয়ে রাখতে যন্ত্রণা হলেও সে পায়ে ভর দিতে পারছে।

"কোন কোঠি?" মানে কোন বাড়িতে যাবে কমলেশ।

"লালাসাহেব...!"

লোকটা তার নাম বলল, লছমন। লোকে লোছুয়া বলে ডাকে। স্টেশনের দিকে দিহারি গাঁয়ে সে থাকে। তার পেশা নাপিতগিরি। স্টেশনের কাছে বাজারের বটতলায় সে বসে। আর হপ্তায় একদিন এদিকে আসে খেউরির কাম করতে। লোছুয়া কমলেশকে দেখেছে একদিন—কিন্তু সে জানে না বাবু কোন কোঠিতে থাকে!

পথ কম নয়। লোছুয়ারও কষ্ট হচ্ছিল। কমলেশ পা টেনে টেনে, লোছুয়ার কাঁধে ভর দিয়ে কোনওরকমে হেঁটে যাচ্ছিল।

শেষ পর্যন্ত লালাসাহেবের বাড়ি।

কমলেশকে পৌঁছে দিয়ে চলে গেল লোছুয়া।

লালাসাহেব বাড়িতেই ছিলেন। ইন্দিরা আঁতকে উঠলেন। এ কী? তুমি আজ কাল বাদে পরশু ফিরে যাবে, আর এইসময় সাইকেল চড়তে গিয়ে হাত-পা ভেঙে বসলে! এখন কী হবে!

লালাসাহেব আপদ-বিপদের জন্যে সবসময় কিছু ওষুধপত্র মজুত রাখেন, না রেখে উপায় নেই। কাটাছেঁড়া পরিষ্কার করা হল, আয়োডিনের হালকা ছোঁওয়া, সালফার পাউডার, তুলো, ব্যান্ডেজ, অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট গোটা দুই। আপাতত এই। তারপর দেখা যাক বিকেলে কী অবস্থা দাঁড়ায়।

হাতের কাজ শেষ করে লালা বললেন, "ওয়েল সাইকেলিস্ট, তোমার পা ভাঙেনি। হাত বলতে পারছি না। যাও শুয়ে থাকো। মাথাটা বেঁচে গিয়েছে, তোমার ভাগ্য ভাল। সুমতি এসে যদি তোমার কান মুলে দেয় আমরা কিছু বলব না।" বলে হাসতে হাসতে চলে গেলেন।

পনেরো

ব্যথা এবং ঘুমের ওষুধ খাওয়া সত্ত্বেও রাত্রে জ্বর এল কমলেশের। প্রথম রাতে কাঁপুনি আর শীত শীত ভাব ছিল। ব্যথা বাড়ছিল। কখনও যদি বা মনে হয় যন্ত্রণা বুঝি কমছে, খানিকটা পরে আবার তীব্র হয়ে ওঠে ব্যথা।

ঘুম আসে না। আচ্ছন্নতা। তারই মধ্যে উদ্‌বেগ, সংকোচ, আশঙ্কা। সুমতি এসে কাল কী বলবে! রেগে যাওয়া স্বাভাবিক। দুশ্চিন্তায় হয়তো তার চোখে জল এসে যাবে! আচমকা এই বিপদে যদি সে দিশেহারা হয়—বলার কী বা থাকবে! কমলেশের নিজেরই খারাপ লাগছিল, লালাসাহেব আর ইন্দিরা মাসিমাকে সে বড়

বিব্রত করল। চুনিমহারাজও এসেছিলেন। বিছানার পাশেই বসে ছিলেন কিছুক্ষণ। মধুসূদন খবর পেয়ে দুটো ওষুধ পাঠিয়ে দিয়েছেন। আজ পারেননি। কাল আসবেন।

রাত বাড়তে লাগল।

কমলেশ ঘুমোতে পারছিল না। ঘর অন্ধকার। ইন্দিরা মাসিমার হুকুমে পলুয়া বাইরের বারান্দায় শুয়ে আছে আজ। খাটিয়া পেতে, কাঁথা কম্বল মুড়ি দিয়ে।

আরও রাত বাড়ল। পুরোপুরি স্তব্ধভাব। বাইরে কোথাও গাছের পাতা হাওয়ায় জোরে নড়ে উঠলেও শব্দ শোনা যায়।

যা সচরাচর করে না কমলেশ সামান্য আগে আরও একটা ঘুমের বড়ি খেয়ে নিয়েছে। যন্ত্রণা ভুলে একটু ঘুমোতে পারলে, বা যদি খানিকটা সময় নিদ্রাচ্ছন্ন থাকতে পারলেও ভোর হয়ে আসবে। প্রত্যুষের আবছায়া কুয়াশামাখা আলোটুকু ফুটলেই সে যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়। এই অন্ধকার, ফোঁটা করে রাত্রের সময় চুঁইয়ে পড়া—তার ভাল লাগছে না। ভয় করছে।

কমলেশ কখন যেন আচ্ছন্ন হয়ে এল। চেতনা ছিল হালকা, থাকতে থাকতে একসময় ডুবে গেল অবচেতনার তলায়।

আর, ওই অবস্থায়, কমলেশ দেখতে পেল সে আবার গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে। কোথায় পড়ছে বুঝতে পারছে না। তবে অনুভব করছিল, যেন কোনও আকারহীন এক রুক্ষ কর্কশ গহ্বরের তলায় সে ক্রমাগত নেমেই যাচ্ছে, গড়িয়ে গড়িয়ে। নিজেকে বাঁচাবার জন্যে কমলেশ একটা অবলম্বন খুঁজছিল আঁকড়ে ধরবে।

বাতাসে হাত বাড়ানোর মতন তার এই চেষ্টা বৃথা হয়ে যাওয়ার পর সে রাগে ক্ষোভে হতাশায় আর হাতড়াবার কথা ভাবল না। যাক, সে পড়েই যাক। কোথায় কত নীচে পড়তে পারে! কোনও-না-কোনও জায়গায় তাকে থামতেই হবে। সীমাহীন অতল বলে কিছু থাকতে পারে না।

এই তো অবশেষে সে থামল। তার পতন রোধ হল।

না তার লাগল না। অজস্র ঘাসের শয্যা বুঝি এখানে। দীর্ঘ ঘাস, লতা ; সে প্রায় ডুবে যাবার মতন ঘাসের কোমলতার মধ্যে আশ্রয় পেয়েছে।

এখানে আলোও এসে পড়েছে। কেমন করে বোঝা যায় না।

বাবাকে এমন জায়গায় দেখবে কল্পনাও করেনি কমলেশ। মলিন বেশ, মলিনতর মুখ। একেবারে গায়ের পাশে।

'আপনি?'

'খুব লেগেছে?'

'না। কিন্তু আপনি এখানে?'

'দেখে গেলাম।... তোমার মা ভাবছিল আসবে, এল না। সে এগিয়ে গিয়েছে। আমি যাই।'

'কোথায়?'

'মানুষের যাবার জায়গা দুটো। হয় ওপরে, নয় নীচে। দুইই সমান। ওপর থেকে যারা নিতে আসে—তারা শকুনির মতন ছিঁড়ে ছিঁড়ে তোমায় নিয়ে যায় ; আর নীচে যারা নিতে চায় তারা মাটির কীট। আমরা তাদের খাদ্য।... আমি যাই।'

কমলেশ কিছু বলতে যাচ্ছিল। বলতে যাচ্ছিল, দাঁড়ান—একটা কথা থাকল।
সে বলতে যাবে, যাচ্ছিল, এমন সময় সুমতির গলা শুনল।
'তুমি?'
'বা! আমি থাকব না?'
কমলেশ সুমতির মুখ দেখছিল। শান্ত, কোমল, স্নিগ্ধ, তৃপ্ত যেন।
মাথা নাড়ছিল কমলেশ। 'তুমি থাকবে। এই তো রয়েছ।'
ঘুম ভাঙার আগেই রাত্রের অন্ধকার হালকা হয়ে প্রত্যুষের ফিকে আলো ফুটছিল।

ষোলো

দুটো দিন দেরি হয়ে গেল।
কমলেশের পা ভাঙেনি। বাঁ পায়ের গোড়ালি মচকে ফুলে আছে অনেকটা। লিগামেন্ট জখম হয়েছে কিনা কে জানে। আপাতত মোটা করে ব্যান্ডেজ জড়ানো। সাধারণ ব্যান্ডেজ, ক্রেপ ব্যান্ডেজ কোথায় পাবে! হাঁটুতেও ব্যথা। তবে ডান হাতের অবস্থা ভাল নয়। নাড়াতে পারছে না। কবজির ওপরের হাড় ভাঙলেও ভাঙতে পারে। হাতেও ব্যান্ডেজ। পুরু করে বাঁধা। গায়ে সামান্য জ্বর।
লালাসাহেব আপত্তি করেননি। যেতে তো হবেই। কলকাতায় না গেলে হাতের এক্সরে করানো যাবে না। ডাক্তারও দেখানো দরকার।
ট্রেকারের ব্যবস্থা মধুসূদন করেছেন। নিজেই নিয়ে এসেছেন ট্রেকার। লালাসাহেবের কুঠি থেকে কমলেশদের মালপত্র তুলে ওদের নিয়ে একেবারে স্টেশনে পৌঁছে দেবে। সঙ্গে থাকবেন চুনিমহারাজ। স্টেশনে পৌঁছে টিকিট কাটা, মালপত্র ওঠানো থেকে ট্রেনে তুলে দেওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব তাঁর। তিনি কলকাতা পর্যন্তও যেতে রাজি ছিলেন। সুমতি আপত্তি করল। সে সামলে নিতে পারবে।

মালপত্র তোলা হয়ে গিয়েছে। কমলেশকেও উঠিয়ে দেওয়া হল।
সুমতি তখনও ওঠেনি। লালাসাহেবদের দেখছিল। বিষণ্ণ মুখ। কেমন একটা আবেগ চেপে রাখার চেষ্টা করছেন। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল সকলকেই। বিদায় নিল।
"আসি মাসিমা! মেসোমশাই পৌঁছেই আমরা খবর দেব।"
লালা হাসলেন। সুমতি গাড়িতে উঠল।
"মাসিমাকে আপনি কিন্তু তাড়াতাড়ি দেখিয়ে আনবেন।"
"আনব। ভেবো না। ওই বুড়ি না থাকলে আমিও যে থাকব না।"
"যাবার সময় ওসব কথা বলবেন না।"
"বেশ।...তা শোনো, অন্য একটা কথা বলি। এখানে তোমাদের জন্যে সবসময় একটা জায়গা খালি থাকবে। যখন খুশি চলে এসো।"
চুনিমহারাজ সামনের সিটে উঠে বসলেন। নীচে লালা, ইন্দিরা, মধুসূদন। পলুয়াও হাত কয়েক দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

ফটক খোলা। বাইরে ইউক্যালিপটাস গাছদুটো বাতাসে মাথা হেলিয়ে দিয়েছে।
ট্রেকারে এবার স্টার্ট দিল ড্রাইভার।
লালাসাহেব কী মনে করে কমলেশের কাছাকাছি এসে দাঁড়ালেন। হাসি মুখেই বললেন, "ওহে সাইকেলিস্ট, আমরা ভেবেছিলাম, তোমাকে ভদ্র চেহারাতেই গুড বাই জানাতে পারব, ভেরি সরি জেন্টেলম্যান, তোমায় তুলো ব্যান্ডেজের পট্টি বেঁধে বিদায় জানাতে হচ্ছে!... ওয়েল, দুঃখ করো না ; জীবনটা এই রকমই।"
কমলেশ তাকিয়ে থাকল।
গাড়ি চলতে শুরু করে দিল।

ট্রেকার এগিয়ে এসেছিল খানিকটা।
বাঁয়ে ঘোড়া নিমের পাশ কাটিয়ে পাহাড়তলির পথ ধরল।
ফাল্গুনের রোদ, চঞ্চল হাওয়া, মাঠময় সবুজ রং ধরেছে, গাছের পাতায় দোলা লাগছে মাঝে মাঝে। শাল জঙ্গলের দিকটায় আকাশ যেন পাহাড় ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে।
"কমলেশ, অসুবিধে হচ্ছে? ঝাঁকুনি লাগছে?" চুনিমহারাজ ঘাড় ফিরিয়ে বললেন।
"না, ঠিক আছে।"
অনেকক্ষণ আর কথা নেই।
ট্রেকার একটা চড়াই উঠছিল। পাশেই শিমুল গাছ। ফুল ফুটেছে মাথার ডালে। এক ঝাঁক বক উড়ে যাচ্ছিল।
সুমতি হঠাৎ মৃদু গলায় বলল, "কথা বলছ না যে।"
কমলেশ সুমতিকে দেখল কয়েক পলক। আবার মুখ ফিরিয়ে বাইরে তাকাল। শেষে বড় করে নিশ্বাস ফেলে বলল, "কী বলব! লালাসাহেবের কথাটাই ভাবছি। আমার যে কত ক্ষত, তুলো ব্যান্ডেজ..।!"
সুমতি নরম করে কমলেশের কাঁধে হাত রাখল। "ভেবো না। আমরা এইরকমই।"
আরও একটা শিমুল গাছ। শিমুল ফুল। তখনও ফুলগুলো দুলছে হাওয়ায়।